উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি

প্রবন্ধ-সংগ্রহ

অমিতাভ মুখোপাধ্যায় এম. এ., পি. এইচ্. ডি
ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

উৎসর্গ

বাংলার নবজাগরণের মহান নেতাদের স্মৃতিতে

ভূমিকা

উনিশ শতকের ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত আমার কয়েকটি প্রবন্ধকে এখানে পুস্তকাকারে গ্রথিত হ'ল। কোন্ প্রবন্ধ কোথায় এবং কবে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল অন্যত্র তা দেখানো হয়েছে। শেষের রচনাটি একটি ইংরেজী প্রবন্ধের অনুবাদ, যেটি ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত **All India Oriental Conference**-এর বঙ্গ-সংস্কৃতি শাখার অধিবেশনে পঠিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদের কাজে আমার প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমান সহকর্মী শ্রীবিমলকান্তি ঘোষ আমাকে বিশেষ সাহায্য করেছেন, তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সংকলিত প্রবন্ধগুলি প্রথম যে আকারে ও নামে প্রকাশ করা হয়েছিল সেই আকার ও নাম, স্থানে স্থানে শব্দগত পরিবর্তন বাদে, বর্তমান গ্রন্থেও অটুট রাখা হয়েছে। শুধু একটি ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম করা হয়েছে। 'বিধবাবিবাহ আন্দোলন ও বিদ্যাসাগর' প্রবন্ধটি পূর্ব-প্রকাশিত দুটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের মিলিত রূপ। প্রবন্ধ দুটির কিছু কিছু ভাষাগত পরিমার্জনও করা হয়েছে যদিও বক্তব্যের কোনো পরিবর্তন হয় নি। সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জীগুলিতে শুধু সেই সব পুস্তকেরই উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলির সাহায্য প্রবন্ধ-রচনার সময় আমি গ্রহণ করেছিলাম। পরবর্তী-কালে প্রকাশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নামও এর ফলে নিশ্চয় বাদ গিয়েছে। সুধী পাঠক মাত্রেই বুঝতে পারবেন যে পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলি তথ্য ও তত্ত্বগত উপকরণের বিচারে সব তুল্যমূল্য নয়। কিন্তু লেখকের পক্ষে তার দুর্বলতম রচনার উপরও দুর্বলতা থাকা স্বাভাবিক। তাই এগুলি সবই বর্তমান সংকলনভুক্ত করা হ'ল। গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে অনেকেই আমাকে অল্প-বিস্তর উৎসাহ দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক

শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীচিত্তপ্রিয় (শঙ্খ) ঘোষের কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। বাংলার প্রবীণ খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আমার বই-এর মুখবন্ধ লিখে দিয়ে আমাকে বিশেষ বাধিত করেছেন। তাঁকেও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। বইটি প্রকাশের ব্যাপারে জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স-এর শ্রীসুরজিৎ চন্দ্র দাস যে আগ্রহ ও উত্তম দেখিয়েছেন তার প্রশংসা না করেও পারা যায় না।

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

মুখবন্ধ

একথা বললে খুব অত্যুক্তি হবে না যে তেরো শতকের গোড়া থেকে আঠারো শতকের প্রায় শেষ অবধি বাংলার তথা ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে পরিবর্তন ঘটেছিল—কেবলমাত্র উনিশ শতকের পরিবর্তন তার চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ, জাতীয়তার ভাব ও নবজাগ্রত সংস্কারমুক্ত স্বাধীন চিন্তা প্রভৃতি নূতন নূতন আদর্শ মোহাচ্ছন্ন হিন্দু জাতিকে যে অগ্রগতির পথে অগ্রসর হবার প্রথম প্রেরণা দিয়েছিল—তারই ফলে প্রথমে বাংলাদেশে পরে সমস্ত ভারতে এক নূতন জাতীয় জীবনের সৃষ্টি হয়। আজ পর্যন্তও ভারত সেই অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রেখেছে। অথচ উনিশ শতকের এই যুগান্তকারী পরিবর্তন সম্বন্ধে আমাদের দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের মনেও খুব স্পষ্ট কোন ধারণা নাই। তার প্রধান কারণ, বিশ শতকের প্রথম ভাগেও আমাদের দেশের স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষা-সূচীতেও এই জ্ঞান লাভের কোন ব্যবস্থা ছিল না। আমাদের ছাত্র জীবনে আমরা ভারতবর্ষের প্রাচীন ও মধ্য যুগের রাজনীতিক অর্থ-নৈতিক সামাজিক ও ধর্মনৈতিক ইতিহাস পড়েছি—কিন্তু আঠারো শতকের পরে ইংরেজের সাম্রাজ্য বিস্তার ও এ দেশে ইংরেজের শাসন সম্বন্ধেই জ্ঞান লাভ করেছি। তার ফলে আমাদের ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য ও জাতীয় জীবনের অন্য বিভাগে কি পরিবর্তন ঘটেছে সে সম্বন্ধে জানবার ও ভাববার অবকাশ পাইনি।

গত ২৫।৩০ বছরে এ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে এবং আমাদের শিক্ষায়তনে এ পর্যন্ত এ বিষয়ে খুব গভীর জ্ঞান লাভের সুযোগ না থাকলেও এ সম্বন্ধে গবেষণার ফলে কয়েকখানি গ্রন্থ ও অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। যে কয়জন অল্প সংখ্যক পণ্ডিত ব্যক্তি এ সম্বন্ধে আমাদের এই জ্ঞান বৃদ্ধির সাহায্য করেছেন তাদের মধ্যে শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায় একজন। তিনি এ সম্বন্ধে ইংরেজীতে একখানি বই লিখে

প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে তিনি কয়েকটি প্রবন্ধে উনিশ শতকের বাংলার সংস্কৃতি, সমাজ ও সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশন করেছেন। উনিশ শতকের বাঙ্গালীর সমাজ—বিশেষভাবে জাতি ভেদ, বর্ণ ও বৃত্তি, কৌলীন্য প্রথা, বিধবা বিবাহ এবং চড়ক পূজা ও নরবলির ন্যায় নিষ্ঠুর প্রথা প্রভৃতির সঙ্গে বাংলায় হিন্দুর নব জাগরণ এবং প্রত্যক্ষভাবে যে দুইজন মহাপুরুষ রামমোহন ও বিবেকানন্দ এই নব জাগরণের অগ্রদূত এবং পরোক্ষভাবে যাঁরা এর সাহায্য করেছেন—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও বাল গঙ্গাধর তিলক তাঁদের সম্বন্ধে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনায় সমৃদ্ধ এই গ্রন্থখানি বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুতর অভাব মোচন করেছে। গ্রন্থখানিতে পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম সমালোচনা শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় এবং গ্রন্থের ভাষাও খুব সহজ ও সরস। গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধ—'বাংলার নব জাগরণের প্রকৃত সীমারেখা' সম্বন্ধে মতভেদের অবসর আছে—কিন্তু গ্রন্থকার যে কয়টি নূতন মত প্রকাশ করেছেন তার সম্বন্ধে নিরপেক্ষ যুক্তিতর্কের প্রয়োজনীয়তা আছে।

আমি এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই বই-এর প্রবন্ধগুলি প্রথম কবে ও কোথায় প্রকাশিত হয়েছিল নীচে তার উল্লেখ করা হ'ল। প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করে পত্রিকা-সম্পাদকগণ আমাকে যে উৎসাহ দিয়েছিলেন তার জন্য তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ ও জাতিভেদ প্রথা—শতরূপা, কার্তিক-পৌষ ১৩৭৭।

বাঙালী হিন্দু সমাজে বর্ণ ও বৃত্তি—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বর্ষ ৭৫, সংখ্যা ২৪, ১৩৭৮।

বাংলাদেশে কৌলীন্য প্রথার অত্যাচার—ইতিহাস, ভাদ্র-কার্তিক ও অগ্রহায়ণ-মাঘ ১৩৬৩।

বিধবা-বিবাহ আন্দোলন ও বিদ্যাসাগর—ইতিহাস, অগ্রহায়ণ-মাঘ, ১৩৬২ ও প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৬৮।

উনিশ শতকের বাংলায় চড়ক পূজা—নতুন সাহিত্য, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৬৯।

শতবর্ষ পূর্বে বাংলাদেশে নরবলি—বঙ্গবাসী কলেজ পত্রিকা, ১৩৬২-৬৩।

ধর্মসংস্কারক রামমোহন—উদ্বোধন, আষাঢ় ও শ্রাবণ, ১৩৬৬।

ঊনবিংশ শতকে বাংলায় হিন্দু নবজাগরণ আন্দোলন—ইতিহাস, ভাদ্র-কার্তিক, ১৩৬১।

আর্য সমাজ ও স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী—উদ্বোধন, আশ্বিন ১৩৬৯।

ভারতের নবজাগরণে স্বামী বিবেকানন্দ—উদ্বোধন, মাঘ, ১৩৭০।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের স্থান—পরিচয়, কার্তিক, ১৩৭০।

বাল গঙ্গাধর টিলক ও উনিশ শতকের রাজনীতিতে সন্ত্রাসবাদের সূচনা—অতএব, আষাঢ়, ১৩৭১।

বিষয়সূচী

সমাজ — পৃষ্ঠা

উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ ও জাতিভেদ প্রথা ... ১
বাঙালী হিন্দু সমাজে বর্ণ ও বৃত্তি ১৫
বাংলা দেশে কৌলীন্য প্রথার অত্যাচার ২৭
বিধবাবিবাহ আন্দোলন ও বিদ্যাসাগর ৫৫
উনিশ শতকের বাংলায় চড়কপূজা ৭৩
শতবর্ষ পূর্বে বাংলাদেশে নরবলি ৮৫

ধর্ম

ধর্মসংস্কারক রামমোহন ৯৩
উনবিংশ শতকে বাংলায় হিন্দু নবজাগরণ আন্দোলন ... ১১৬
আর্য সমাজ ও স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ১৩০
ভারতের নবজাগরণে স্বামী বিবেকানন্দ ... ১৩৯

সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের স্থান ... ১৪৮

রাজনীতি

বালগঙ্গাধর টিলক ও উনিশ শতকের রাজনীতিতে সন্ত্রাসবাদের সূচনা ... ১৬২

সাধারণ আলোচনা

উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের প্রকৃত সীমারেখা ... ১৭০

উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ ও জাতিভেদ প্রথা

বর্ণাশ্রমী হিন্দু সমাজে প্রাচীন কাল হতেই উচ্চবর্ণের লোকেরা নিম্নবর্ণের লোকদের কাছে সম্মান ও শ্রদ্ধার আসন দাবী করে এসেছেন এবং বহুলাংশে তা লাভও করেছেন। এই দাবীর সমর্থনে প্রধান যুক্তি ছিল বোধ হয় এই যে সমাজে সব বৃত্তি প্রয়োজনীয় হলেও তুল্যমূল্য নয়, কতকগুলি বৃত্তি অন্যের তুলনায় অধিকতর শ্রদ্ধেয় বা পবিত্র, এবং যে সব গোষ্ঠী বা পরিবারের লোকেরা বংশানুক্রমিক ভাবে ঐ বিশিষ্ট বৃত্তিগুলি অনুসরণ করে আসছেন তাঁরাও অন্যের তুলনায় অধিকতর সম্মান ও মর্যাদা লাভের যোগ্য। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, যে-সব বৃত্তি সত্ত্বগুণপ্রধান তাদের স্থান উচ্চে, যেগুলি রজোগুণপ্রধান তাদের স্থান মধ্যে এবং অবশিষ্ট বৃত্তিগুলি নিম্ন মর্যাদার অধিকারী ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই প্রধান চার বর্ণের সামাজিক মর্যাদা বা সম্মান মূলতঃ তাঁদের অনুসৃত বৃত্তির আপেক্ষিক উৎকর্ষ বা অপকর্ষের দ্বারাই নিরূপিত হয়েছিল।

বাংলা দেশের হিন্দু সমাজ কিন্তু প্রাচীন কাল, অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় ১২শ-১৩শ শতাব্দী হতেই সুবিদিত চতুর্বর্ণের পরিবর্তে মাত্র দুই বর্ণ, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, নিয়ে গঠিত হয়েছিল। বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ (১২শ হতে ১৪শ শতাব্দীর মধ্যে রচিত), এই দুই প্রামাণ্য গ্রন্থের সাক্ষ্যই এ বিষয়ে এক। ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র ভিন্ন ম্লেচ্ছ ও অন্ত্যজ জাতিরাও এই সমাজের এক প্রান্তে, সর্বনিম্ন স্তরে স্থান পেয়েছিল ; কিন্তু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দুটি বর্ণ কোনোদিনই বাঙালী হিন্দু সমাজে সুনির্দিষ্ট ভাবে গড়ে ওঠে নি। বৈদ্য ও কায়স্থ, এই দুই প্রসিদ্ধ উপবর্ণের লোকেরাও ছিলেন প্রকৃত পক্ষে শূদ্র পর্যায়ের। বৈদ্যজাতির একাংশের ব্রাহ্মণত্বের দাবী এবং কায়স্থদের অনুরূপ ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং অনৈতিহাসিক সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ষোড়শ শতাব্দীর বিখ্যাত বাঙালী স্মৃতিশাস্ত্রকার রঘুনন্দনও উপরোক্ত দুই পুরাণের অনুসরণ করে কলিতে

বৈশ্যদের শূদ্রতুল্য বলে ঘোষণা করে গেছেন ("কলৌ বৈশ্যঃ শূদ্রবৎ")। তাঁর রচিত শাস্ত্র পড়ে ধারণা হয় সে যুগে বাংলা দেশে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র মাত্র এই দুটি প্রধান বর্ণেরই অস্তিত্ব ছিল। বৈশ্য জাতির সম্বন্ধে উপরে যা বলা হ'ল কায়স্থদের সম্বন্ধেও সে কথা সমভাবে প্রযোজ্য। সুপণ্ডিত Hutton সাহেব তাঁর Caste In India বই-এ দেখিয়েছেন যে অষ্টাদশ শতকেও বাঙালী কায়স্থেরা সৎশূদ্র বলে বিবেচিত হতেন, তার চেয়ে উচ্চে তাঁদের স্থান সমাজ স্বীকার করে নি। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে শূদ্রের পর্যায়ভুক্ত হলেও বৈশ্য ও কায়স্থদের স্থান বাঙালী হিন্দু সমাজে বহুদিন ধরে ব্রাহ্মণদের পরেই নির্দিষ্ট ছিল। বৈশ্য ও কায়স্থদের পরে ছিলেন অন্যান্য 'সৎশূদ্র' নামধারী গোষ্ঠী, যথা নাপিত, মোদক (ময়রা), বারুজীবী (পান-চাষী), তাম্বুলী (পান-বিক্রেতা), মালাকার, কর্মকার, শঙ্খকার, তন্তুবায়, কুম্ভকার, কাংস্যকার, গন্ধবণিক, দাস (কৃষক) ইত্যাদি। বৃহদ্ধর্মপুরাণ এঁদের "উত্তম-সংকর" পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করেছেন। এঁদের নিম্নে স্থান পেয়েছিলেন "অসৎ শূদ্র" বা "মধ্যম সংকর" পর্যায়ের উপবর্ণগুলি, যথা সূত্রধর, চিত্রকর, স্বর্ণকার, আভীর (গোয়ালা), তৈলকার (তেলি), কৈবর্ত , ধীবর (মৎস্যজীবী), রজক, শৌণ্ডিক (শুঁড়ি) ইত্যাদি। সর্বনিম্ন স্তরে ছিলেন "অধম সংকর" বা অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য পর্যায়ের লোকেরা, যথা, ব্যাধ, কোল, হাড়ি, ডোম, দুলে, মালো, বাগদী, চামার, চণ্ডাল ইত্যাদি এবং পুলিন্দ, কম্বোজ, যবন, শবর প্রভৃতি ম্লেচ্ছজাতি। উত্তম, মধ্যম ও অধম সংকর এই তিন পর্যায়ে প্রথমে মোট ছত্রিশটি উপবর্ণের (চলিত কথায় "ছত্রিশ জাত") স্থান হয়েছিল, পরে আরো কয়েকটি উপবর্ণ এই তালিকাভুক্ত হয়। বাংলা দেশে বর্ণাশ্রমী হিন্দু সমাজে বিভিন্ন বর্ণ-উপবর্ণের আপেক্ষিক স্থান বা মর্যাদা এই তালিকা দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায়।

মধ্যযুগের শেষে এবং আধুনিক যুগের সূচনায় বাঙালী হিন্দু সমাজে এই স্তর-বিন্যাসের সামান্য পরিবর্তন দেখা যায়। ব্রাহ্মণেতর বর্ণ-উপবর্ণগুলির মধ্যে বৈশ্য ও কায়স্থদের পরেই গণ্য হত "নবশাখ" সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের নয়টি শাখা ছিল, যথাক্রমে—তিলী, মালী, তাম্বুলী ও

বারুজীবী, গোপ, নাপিত, কর্মকার, কুম্ভকার, তন্তুবায় ও মোদক। "নবশাখ"দের জল-আচরণীয় জাতিও বলা হয়ে থাকে,—অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের কাছে এঁরাও অস্পৃশ্য বা বিশেষ হেয় ছিলেন না। "নবশাখ"দের পরে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন শাখার বণিক এবং নমঃশূদ্র, যুগী, পীরালি ইত্যাদি নিম্ন-জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের কাছে এঁরা প্রায় অস্পৃশ্য ছিলেন। অবশ্য মধ্যযুগের বাঙালী সমাজে শুধু জন্মের আভিজাত্য ছিল এ কথা মনে করা সমীচীন হবে না, অর্থের বা ক্ষমতার আভিজাত্যও সে যুগে যথেষ্ট ছিল। স্বর্ণবণিক, গন্ধবণিক প্রভৃতি ব্যবসায়ীরা বাণিজ্যের দ্বারা প্রচুর অর্থ ও তৎসহ সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জন করতেন। বাংলা মঙ্গলকাব্যে এই শ্রেণীর প্রভাব-প্রতিপত্তির বর্ণনা পাওয়া যায়। উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ হতেও এঁরা সে যুগে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিলেন না। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতার হিন্দু সমাজেও কায়স্থ ও স্বর্ণবণিক জাতির প্রভাব-প্রতিপত্তি ব্রাহ্মণদের চেয়ে কিছু বেশি ছিল বলেই মনে হয়। কিন্তু এই সব প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী লোকেরাও বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের প্রাপ্য সামাজিক মর্যাদা দিতে সে যুগে কুণ্ঠিত হতেন না। চৈতন্যদেব নিজে প্রেমভক্তির অধিকারে জাতি ও সম্প্রদায় ভেদ অগ্রাহ্য করেন, কিন্তু আহার ও সামাজিক ব্যাপারে জাতিভেদকে অস্বীকার করতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পরেই তাঁর প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় আবার জাতিভেদ ও ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত বহু নতুন ধর্মসম্প্রদায় (কর্তাভজা, স্পষ্টদায়ক, বলরামী ইত্যাদি) জাতিভেদ প্রথাকে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করেন, কিন্তু এঁদের প্রভাব বিরাট হিন্দু সমাজের অতি সামান্য অংশকেই স্পর্শ করে। সমাজের বৃহত্তর অংশ জাতিভেদ প্রথা ও ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য নির্বিচারে স্বীকার করে নিয়েছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মূলতঃ জাতি-মর্যাদা বৃত্তি-মর্যাদার সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেও বৃত্তির সঙ্গে বর্ণের ঘনিষ্ঠ সংযোগ প্রাচীন কালেই কিছুটা শিথিল হয়েছিল। ব্যক্তিগত রুচি, প্রভাব-প্রতিপত্তি কামনা, অর্থনৈতিক প্রেরণা প্রভৃতি বিভিন্ন

কারণে প্রত্যেক বর্ণেরই কিছু কিছু লোক কৌলিক বৃত্তি পরিত্যাগ করে অন্য বৃত্তি গ্রহণ করতেন। ব্রাহ্মণ রাজ্যশাসন, সৈন্য-পরিচালনা অথবা কৃষিকার্য জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছেন, বৈশ্যরা রাজার মন্ত্রণাদাতা হয়েছেন, দাস বা কৃষিজীবীরা রাজকর্মচারী, এমন কি সভাকবি, হয়েছেন এবং কায়স্থেরা লেখনী-চালনা পরিত্যাগ করে সৈনিকবৃত্তি ও চিকিৎসাবৃত্তিতে নিযুক্ত রয়েছেন, এমন দৃষ্টান্ত খ্রীষ্টীয় অষ্টম হতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। মধ্যযুগের সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করলেও এই ধারার অনুবর্তন আমরা লক্ষ্য করি। বাংলা দেশে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার মাত্র চল্লিশ বৎসর পরে কোলব্রুক সাহেব লিখেছেন যে অল্প কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে সমাজে যে কোনো বৃত্তি তখন যে কোনো বর্ণের লোকের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হ'ত, তবে অন্য বৃত্তির তুলনায় কৌলিক বৃত্তি গ্রহণ অধিকতর বাঞ্ছনীয় ছিল। ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডন হতে প্রকাশিত The East India Gazetteer-এ এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে। উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ ধনতন্ত্রের আঘাতে আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থা যতই বিপর্যস্ত হতে থাকে বর্ণের সঙ্গে বৃত্তির সংযোগ ততই ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে পড়ে। কিন্তু বৃত্তির সঙ্গে বর্ণের সংযোগ লুপ্তপ্রায় হওয়ার পরেও হিন্দু সমাজে বিভিন্ন বর্ণের সামাজিক স্থান বা মর্যাদা চিরাচরিত প্রথার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। জীবিকার পরিবর্তে বৈবাহিক আদান-প্রদান ও আহারাদির বিষয়ে বহুকাল আচরিত বিধি-নিষেধ তখন জাতি-মর্যাদার মূল নিয়ামক হয়ে ওঠে। সংক্ষেপে বলা চলে, বর্ণ বা জাতির বিচার প্রধানতঃ "রোটি-বেটি"র বিচারে সীমাবদ্ধ হয়। এর উপর অষ্টাদশ শতাব্দী ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কৌলীন্য প্রথার প্রাদুর্ভাবের ফলে সমবর্ণের লোকেদের মধ্যেও কুলীন, শ্রোত্রিয়, বংশজ ইত্যাদি উচ্চ-নীচ ভেদের সৃষ্টি হয় এবং বৈবাহিক আদান-প্রদান আরো দুরূহ হয়ে পড়ে। এই প্রথার সুযোগে কুলীন পাত্রেরা অসংখ্য স্ত্রী লাভ করলেও কুলীন কন্যা ও বংশজ পাত্রদের বিবাহ দুর্ঘট হয়ে পড়ে এবং তার অনিবার্য ফল স্বরূপ সমাজে নানা দুর্নীতি ও ব্যভিচার

প্রবেশ করে। জাতিগত শুদ্ধতা রক্ষা করা এর ফলে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

উনিশ শতকে বাংলা দেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের সংগে সংগে সমাজ-সংস্কারকগণ জাতিভেদ প্রথার কুফল সম্বন্ধে সচেতন হন। রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) এই প্রথাকে আমাদের ঐহিক সুখের পরিপন্থী ও জাতীয় ঐক্য বিনাশকারী বলে বর্ণনা করেন। মৃত্যুঞ্জয়াচার্য-রচিত, জাতিভেদ প্রথা-বিরোধী "বজ্রসূচী উপনিষৎ"-এর বঙ্গানুবাদ রামমোহন প্রকাশ করেছিলেন (১৮২৭)। রামমোহনের সমুদ্র যাত্রাও সে যুগের প্রচলিত সনাতন ঐতিহ্যের বিরোধী ছিল সন্দেহ নেই। রামমোহনের পরবর্তী যুগে ডিরোজিও'র (১৮০৯-৩১) অনুগামী ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায় জাতিভেদ ব্যবস্থাকে ঘৃণা করতেন। এঁদের প্রভাবে পড়ে অনেক ব্রাহ্মণ সন্তান সে যুগে উপবীত ত্যাগ করেন। হিন্দু কলেজের অগ্রসর ছাত্রদের অনেকের মধ্যেই সমাজ-নিষিদ্ধ সুরাপান ও গোমাংস-ভোজনে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দও, বিশেষতঃ কেশব সেনের (১৮৩৮-৮৪) যুগ হতে, তাঁদের সমাজ-সংস্কারের কর্মসূচীর মধ্যে জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদকে একটি প্রধান স্থান দিয়েছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের বেদী হতে ব্রাহ্মণ আচার্যকে অপসারণ, উপবীত ত্যাগ ও অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন, এই তিনটি বিষয়ে নবীন ব্রাহ্ম নেতারা (কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি) বিশেষ সচেষ্ট হ'ন। আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম না হয়েও রামতনু লাহিড়ীর (১৮১৩-৯৮) মতো আদর্শবাদী শিক্ষক ও সংস্কারক জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য প্রকাশ্যে তাঁর পিতৃদত্ত উপবীত ত্যাগ করেন (১৮৫৬) এবং এর জন্য বহু সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করেন। এই শতাব্দীর সত্তরের দশকে বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১) কৌলীন্য ও বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন পরিচালনা করেন জাতিভেদ প্রথার একটি চরম ও বিকৃত দিককে তা লোকচক্ষুর সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করে। বাংলা দেশে কর্মরত খ্রীষ্টান মিশনারি সম্প্রদায়গুলিও জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে চিরকাল সোচ্চার ছিলেন এবং ধর্মান্তরিত

হিন্দুদের মধ্যে তাঁরা কোনো জাতিভেদ স্বীকার করতেন না, যদিও শ্রীরামপুরের পাদরি কেরী ও ওয়ার্ড সাহেব তাঁদের প্রথম ধর্মান্তরিত ব্রাহ্মণ কৃষ্ণপ্রসাদকে উপবীত ত্যাগে বাধ্য করেন নি। ব্রাহ্মণের উপবীতকে তাঁরা সামাজিক আভিজাত্যের চিহ্ন বলেই গ্রহণ করেছিলেন, এর কোন আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় মূল্য দেন নি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে নব্য হিন্দুবাদের প্রধান উদ্গাতা স্বামী বিবেকানন্দও (১৮৬৩-১৯০২) জাতিভেদ প্রথার অর্থহীন বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। বহু অব্রাহ্মণ, এমন কি অহিন্দু শিষ্যকে তিনি প্রণব-যুক্ত মন্ত্রে বা গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষা দেন, ব্রাহ্মণত্ব যে জন্মগত অধিকার নয় এবং কর্মের দ্বারা জাত্যন্তর সংঘটন সম্ভব এ কথা ঘোষণায় তাঁর দ্বিধা ছিল না, এমন কি হিন্দুদের বিভিন্ন জাতির মধ্যে অন্তর্বিবাহ প্রচলনের সময় যে আগতপ্রায় এ কথাও তিনি বলে গিয়েছেন। স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠে হিন্দু আচার নিষ্ঠা সম্যক পালিত হয় না এবং ভক্ষ্যভোজ্যাদির ব্যাপারে বিশেষ বাছবিচার নেই,—এ রকম সমালোচনা সে যুগের বহু রক্ষণশীল হিন্দুই করতেন, কিন্তু স্বামীজী তাতে কর্ণপাত করেন নি।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা বিস্তার, সমাজ-সংস্কারকদের আন্দোলন এবং নতুন উৎপাদন ব্যবস্থার চাপের ফলে ধীরে ধীরে জাতিগত আচার-বিচারের বন্ধন দেশের সাধারণ লোকেদের মধ্যে, বিশেষতঃ শহরাঞ্চলে, শিথিল হয়ে পড়ে। কলকাতার ধনী হিন্দুদের স্বেচ্ছাচারিতায় জাতির বন্ধন যে ডিরোজিও-যুগের পূর্ব হতেই শিথিল হতে আরম্ভ করেছিল, রাজনারায়ণ বসু তাঁর "সেকাল আর একাল" পুস্তিকায় (১৮৭৫) 'কালীপ্রসাদী হেঙ্গামে'র বর্ণনা প্রসঙ্গে তা সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। হাটখোলার বিখ্যাত কায়স্থবংশীয় যুবক কালীপ্রসাদ দত্ত মুসলমান উপপত্নী গ্রহণ করেও অর্থবলে নিজের সামাজিক প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন। বিখ্যাত ধনী রামদুলাল সরকার এ ব্যাপারে তাঁর সহায়ক হয়ে অকাতরে অর্থব্যয় করেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কলিকাতা কমলালয়" (১৮২৩) পাঠেও স্পষ্ট বোঝা যায় যে উনবিংশ শতাব্দীর সূচনাতেই কলকাতার হিন্দুদের মধ্যে জাতিগত আচার

ত্যাগের প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। অন্ততঃ কিছু লোকে পিতামাতার মৃত্যুর পর শাস্ত্রীয় নিয়মে অশৌচ পালন ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকর্ম করতেন না। বিদেশী পোষাক-পরিচ্ছদের প্রতি কোনো কোনো লোকের বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখা যেত। উচ্চবর্ণের লোকেদের মধ্যেও শাস্ত্রীয় কর্মকাণ্ড এবং সন্ধ্যা-বন্দনাদি ত্যাগের প্রবৃত্তি ক্রমশঃ প্রবল হয়। বলাবাহুল্য নগর-জীবনের স্বাধীনতাই এই ব্যাপারে তাঁদের সাহস ও মনোবল যুগিয়েছিল। ব্যক্তিগত জীবনে রাজা রামমোহন রায়ও মুসলমানী পোষাক ও পানাহারের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। ডিরোজিওর শিষ্যেরা জাতিগত আচার লঙ্ঘনের ব্যাপারে চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। প্রত্যক্ষদর্শী রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-৯৯) লিখেছেন যে সুরাপান ও সাহেবী খানা গ্রহণকে ডিরোজিওর যুবক শিষ্যেরা "সুসংস্কৃত ও জ্ঞানালোকসম্পন্ন মনের কার্য্য" বলে বিবেচনা করতেন। মুসলমানের দোকানের বিস্কুট ভক্ষণ এই সব হিন্দু যুবকদের কাছে "বিরাট সাহসিকতার কার্য্য" বলে গণ্য হ'ত। হিন্দু কলেজের জনৈক ছাত্রের মুসলমানের দোকানে বিস্কুট ভক্ষণের ঘটনা নিয়ে রক্ষণশীল দলের মুখপত্র "সমাচার চন্দ্রিকা" ও প্রগতিশীল দলের পত্রিকা "সম্বাদ কৌমুদী"র মধ্যে যে লেখনী-যুদ্ধ চলেছিল ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "সংবাদ-পত্রে সেকালের কথা"য় তার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আহারাদির ব্যাপারে জাতিগত বিধি-নিষেধের বন্ধন কিভাবে কলকাতার বাইরে সুদূর মফঃস্বল অঞ্চলেও ধীরে ধীরে শিথিল হতে থাকে বিপিনচন্দ্র পালের আত্মজীবনী পাঠে তা বেশ বোঝা যায়। উচ্চবর্ণের রক্ষণশীল পরিবারের যুবকেরা নিষিদ্ধ মাংসাদি গোপনে আহার করে পরম তৃপ্তি লাভ করতেন, যদিও প্রকাশ্যে সমাজ-বিধি লঙ্ঘনের সাহস এঁদের অনেকেরই ছিল না। পানাহার ভিন্ন অন্য বিষয়েও জাতিগত বিধি-নিষেধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলা ক্রমশঃ অসম্ভব হয়ে পড়ে। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার পর উচ্চবর্ণের হিন্দু ছাত্রদেরও পাশ্চাত্য রীতিতে চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার জন্য শব ব্যবচ্ছেদ করা আবশ্যক হয়। ট্রেনে ও স্টীমারে যাতায়াতের

সময় জাতিগত ব্যবধান রক্ষা করা অনেক সময়েই সম্ভব হ'ত না। কলকাতার সংস্কৃত কলেজে শূদ্ররা ক্রমশঃ শাস্ত্রাধ্যয়নের সুযোগ লাভ করেন, বিদেশে ম্লেচ্ছদের বেদাধ্যয়নের সংবাদও রক্ষণশীল হিন্দুদের অজানা থাকে না। কলকাতার উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও গঙ্গাজলের পরিবর্তে কলের জল পানে ক্রমশঃ অভ্যস্ত হন, ইউরোপীয়দের দ্বারা প্রস্তুত ঔষধ গ্রহণেও তাঁদের আপত্তি ধীরে ধীরে দূর হয়। দেশী গুড়ের পরিবর্তে কলে পালিশ করা চিনির ব্যবহার প্রচলিত হয়। সমুদ্র যাত্রা করলেই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে এই বিধানও উনিশ শতকের শেষ দিকে ক্রমশঃ অচল হয়ে পড়ে। এক কথায় বলা যায় যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্ত্য উৎপাদন ব্যবস্থা এদেশে যে নতুন জীবন যাপন প্রণালীর সৃষ্টি করে জাতিভেদ প্রথা তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়। উনিশ শতকের সমাজ জীবনে এইভাবে এক নীরব বিপ্লব ধীরে ধীরে সংঘটিত হয়।

কিন্তু এই সব পরিবর্তন সত্ত্বেও, আশ্চর্যের বিষয়, জাতিগত সংস্কার ও জাত্যভিমান উনিশ শতকের বাঙালী মানস হতে বিশেষ দূর হয়নি। নানা বিষয়ে জাতিগত বিধি-নিষেধ কালক্রমে লঙ্ঘিত হলেও বৈবাহিক আদান প্রদানের ব্যাপারে এবং কিছুটা বিভিন্ন বর্ণের প্রকাশ্যে একত্র আহারাদির বিষয়ে জাতিগত সংস্কার উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত নিজের প্রভাব প্রায় অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। শুধু সাধারণ লোকেদের মধ্যে নয়, সমাজের নেতৃস্থানীয় বহু লোকের, এমনকি খ্যাতনামা সমাজ-সংস্কারকদের মধ্যেও অনেক সময় এই সংস্কার বলবৎ ছিল দেখা যায়। শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) তাঁর "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ" বইয়ে লিখেছেন যে, সে যুগে "স্বপাক হবিষ্যভোজন অপেক্ষা আর অধিক পবিত্রকর কর্ম্ম কিছুই ছিল না। কলিকাতার বিষয়ী ব্রাহ্মণেরা ইংরাজদিগের অধীনে বিষয়কর্ম্ম করিয়াও স্বদেশীয়দিগের নিকটে ব্রাহ্মণজাতির গৌরব ও আধিপত্য রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। তাঁহারা কার্য্যালয় হইতে অপরাহ্ণে ফিরিয়া আসিয়া অবগাহন স্নান করিয়া ম্লেচ্ছ-সংস্পর্শজনিত দোষ হইতে মুক্ত হইতেন

এবং সন্ধ্যা পূজাদি শেষ করিয়া দিবসের অষ্টম ভাগে আহার করিতেন।" শ্রাদ্ধ ও দুর্গোৎসবে কোন লোক কত অর্থব্যয় ও পুণ্যসঞ্চয় করলেন তার উপরেই সমাজে তাঁর খ্যাতি-অখ্যাতি নির্ভর করত। শূদ্র ধনীদের উপর মূর্খ ব্রাহ্মণ ভট্টাচার্যদেরও আধিপত্যের সীমা ছিল না। বিপিনবিহারী গুপ্ত সংকলিত "পুরাতন প্রসঙ্গ" বইটিতেও আমরা সমাজের একই চিত্র পাই। বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সে যুগে বাড়ীতে নিত্যপূজা করতেন। বৈশ্য সন্তানরাও অনেকে ত্রিসন্ধ্যা না করে জলস্পর্শ করতেন না। মফঃস্বল অঞ্চলে প্রধানতঃ কবিরাজী চিকিৎসা প্রচলিত ছিল। কৃষ্ণনগরের কোনো কোনো লোক প্রত্যহ নবদ্বীপে গঙ্গা স্নান করে এসে বাড়ীতে পূজা করতেন। রামকমল সেনের মত শিক্ষিত, ধনী ও কর্মব্যস্ত লোকও (১৭৮৩-১৮৪৪) নিয়মিত প্রতিদিন আহ্নিক, জপ, পুরাণ পাঠ ইত্যাদি ক্রিয়াকর্ম করতেন ও স্বপাক হবিষ্যভোজন করতেন। রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন যে রাজা রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৮৬৭) দুর্গাপূজার সময় বাড়ীতে সাহেবদের আহারের নিমন্ত্রণ করতেন বলে অন্যান্য রক্ষণশীল হিন্দুরা তাঁর উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন। জাতিগত আচার-বিচারের প্রাবল্য বলাবাহুল্য কলকাতার তুলনায় গ্রামাঞ্চলে অনেক বেশি প্রবল ছিল। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংলণ্ড হতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁর সমুদ্রযাত্রার অপরাধে তাঁর পরিবারকে সমাজচ্যুত করা হয়। ঐ সত্তরের দশকেই ঢাকা জেলার কয়েকজন উচ্চ বর্ণের হিন্দু যুবককে যবনান্ন গ্রহণের অপরাধে সমাজচ্যুত করার চেষ্টা নিয়ে স্থানীয় হিন্দু সমাজে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। তবে গ্রামীন সমাজের প্রভাব, অন্ততঃ উনিশ শতকের প্রথমার্ধে, কলকাতার সমাজের উপর যথেষ্টই ছিল। কলকাতা তখন বহুলোকের কর্মস্থান হলেও স্থায়ী নিবাস ("দেশ") বলে গণ্য হ'ত না। এই সব লোকেরা তাঁদের গ্রামীন সমাজের রীতি-নীতি শহরেও অনুসরণ করার চেষ্টা করতেন।

শুধু সাধারণ লোকে নয়, সে যুগের অনেক সমাজ-সংস্কারক এবং তথাকথিত উদার মতাবলম্বী নেতারাও জাতিগত আচার-বিচার সম্বন্ধে

সচেতন ছিলেন। অন্ততঃ প্রকাশ্যে এঁরা চিরাচরিত সামাজিক প্রথা লঙ্ঘন করার পক্ষপাতী ছিলেন না। আবার এঁদের মধ্যে কারো কারো আচার-নিষ্ঠা বিশেষ না থাকলেও জাত্যাভিমান বা জাতিগর্ব যথেষ্ট ছিল এবং অসতর্ক মুহূর্তে তার প্রকাশ ঘটত। রাজা রামমোহন রায় যে অন্তরে জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু স্কন্ধের উপবীত তিনি আমৃত্যু ধারণ করেছিলেন এবং বিলাত যাত্রার সময় একজন ব্রাহ্মণ পাচককে (রামরত্ন মুখোপাধ্যায়) সঙ্গে নিতে ভুলেন নি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজে বেদ-উপনিষৎ পাঠ ও শাস্ত্রব্যাখ্যানের দায়িত্ব ব্রাহ্মণদের উপরেই ন্যস্ত ছিল এবং সমাজের প্রথম সম্পাদক তারাচাঁদ চক্রবর্তীও জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। সমাজের ভিতরে না থেকে সমাজ সংস্কার করা অসম্ভব—এই চিন্তাই হয়ত রামমোহনকে সামাজিক আচারের প্রতি বাহ্য আনুগত্য প্রদর্শনে প্ররোচিত করেছিল। রামমোহনের সহযোগী দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) প্রথম জীবনে নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। পরে যখন তিনি ইউরোপীয়দের সঙ্গে সামাজিক মেলামেশা ও আহারাদি আরম্ভ করেন তখন পূজা-পার্বণে নিজ গৃহের ঠাকুরদালানেও প্রবেশ করতেন না, অন্যান্য সাধারণ দর্শকের মতো উঠানে দাঁড়িয়ে দেবদেবী দর্শন ও প্রণাম করতেন। দ্বারকানাথের ম্লেচ্ছাচারের জন্য এ সময় তাঁর স্ত্রীও তাঁর স্পর্শ এড়িয়ে চলতেন বলে শোনা যায়। দ্বারকানাথের পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ (১৮১৭-১৯০৫) প্রথম জীবনে জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন। ৭ই আষাঢ় ১৭৮৩ শকাব্দে (১৮৬১ খ্রীঃ) রাজনারায়ণ বসুকে একটি চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন যে আইনের সাহায্যে সমাজে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করা উচিত। পরের বৎসর আর একটি চিঠিতে (তারিখ, ১৩ই মাঘ, ১৭৮২ শকাব্দ) তিনি জানান, "ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে জাতিভেদ নাই, ব্রাহ্মণ শূদ্রের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান হইতে পারে।" ব্রাহ্মণদের উপনয়ন প্রথার অবসান ঘটিয়ে জাতিভেদ প্রথা উচ্ছেদের চিন্তাও তিনি এক সময় (১৮৫৩ খ্রীঃ) করেছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথও অন্য অনেকের মতো

রক্ষণশীল হয়ে পড়েন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে (২৩শে আষাঢ়, ১৭৮৭ শকাব্দ) কেশব সেনকে লেখা একটি চিঠিতে মহর্ষি ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য ও উপচার্যের উপবীত ত্যাগের প্রস্তাবে তাঁর অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সংশোধিত ব্রাহ্ম উপনয়ন পদ্ধতিতে যখন তিনি দুই পুত্র সোমেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের উপনয়নের আয়োজন করেন তখন অপৌত্তলিক উপনয়ন সভাতেও ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের পৃথক স্থানে উপবেশনের ব্যবস্থা করা হয়। রাজনারায়ণ বসু এই সভায় ভুলক্রমে ব্রাহ্মণদের জন্য সংরক্ষিত আসনে গিয়ে বসেন। ৫ই বৈশাখ, ১৭৯৮ শকাব্দে রাজনারায়ণ বসুকে লেখা আর একটি চিঠিতে মহর্ষি এই আশা প্রকাশ করেন যে ব্রাহ্মধর্মের প্রভাবে জাতিভেদ প্রথা আগামী দুইশত বৎসরের মধ্যে অনেক শিথিল হবে। সরলা দেবী তাঁর "জীবনের ঝরা পাতা" বইতে লিখেছেন যে মহর্ষি তাঁর দৌহিত্র, স্বর্ণকুমারী দেবীর পুত্র, জ্যোৎস্নানাথ ঘোষালের কুচবিহার রাজপরিবারে অসবর্ণ বিবাহে মর্মাহত হয়েছিলেন। শেষ বয়সে ভারতে আন্তঃপ্রাদেশিক সবর্ণ বিবাহে সম্মতি জ্ঞাপন করলেও মহর্ষি অসবর্ণ বিবাহের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। মহর্ষির সহচর, হিন্দু কলেজের যশস্বী ছাত্র রাজনারায়ণ বসু একভাবে জাতিভেদ প্রথার সমর্থকই ছিলেন বলা চলে। রামতনু লাহিড়ীকে তর্কচ্ছলে রাজনারায়ণ বলেছিলেন, "যখন সকল দেশে সকল সমাজে জাতিবিভেদ কোন না কোন প্রকারে আছে ও থাকিবে তখন আমাদের দেশের জাতিবিভেদ এতই কি দোষ করিল?" রাজনারায়ণ স্বজাতীয় কায়স্থদের ক্ষত্রিয় বর্ণ বলে বিশ্বাস করতেন,—এটি তাঁর জাত্যভিমানেরই পরিচায়ক। ব্রাহ্ম সমাজের অপর এক চিন্তাশীল নেতা অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬) জাতিভেদ প্রথার অবসানের ক্ষণ তখনো আসেনি বলে মনে করতেন। তা ছাড়া তাঁর মত ছিল এই যে "মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্রকে দুঃখ দিয়া স্বজাতি হইতে পৃথক হওয়া কর্ত্তব্য নহে।"

ইয়ংবেঙ্গল দলের মধ্যেও এ ব্যাপারে বাক্যে ও আচরণে অনেক অসঙ্গতি দেখা যায়। ডিরোজিওর অন্যতম প্রসিদ্ধ শিষ্য দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮২২-৮৭) প্রথম জীবনে বর্ধমানের বিধবা রানী বসন্ত-

কুমারীকে অসবর্ণ বিবাহ করেও শেষ বয়সে অযোধ্যা প্রবাসের সময় শিখা ধারণ করে নিষ্ঠাবান হিন্দুর মতো জীবন যাপন করতেন। নিজের পুত্রের (বসন্তকুমারীর গর্ভজাত) সঙ্গে তিনি স্থানীয় এক ব্রাহ্মণ কন্যারই বিবাহ দিয়েছিলেন। ডিরোজিওর অপর এক শিষ্য, বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-৮৩) গোপনে নিষিদ্ধ ভোজ্য আহার করতেন সন্দেহ নেই, কিন্তু ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে যখন বাংলার ছোটলাট সার রিচার্ড টেম্পল তাঁর বিলাসতরণী 'রোটাসে' নদী ভ্রমণের জন্য বাঙালী গ্রন্থকারদের আমন্ত্রণ জানান, তখন প্যারীচাঁদ মিত্র সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেও প্রকাশ্যে ম্লেচ্ছতরণীতে জলযোগ করতে অসম্মত হ'ন এবং রাজনারায়ণ বসুকেও ঐ কাজ করতে নিষেধ করেন। ডিরোজিও-শিষ্য উদার মতাবলম্বী রামতনু লাহিড়ী পিতার অনুরোধ উপেক্ষা করে উপবীত ত্যাগ করেছিলেন সত্য, কিন্তু স্ত্রীর অনুশাসনে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণের পাচককে তাঁর রন্ধনাগারে প্রবেশ করতে দেন নি বলে শোনা যায় এবং পরে নিজের প্রথমা কন্যার বিবাহও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পরিবারেই দিয়েছিলেন।

কৃষ্ণনগরের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু কিছুদিন পরে শূদ্র হাজারিলাল কৃষ্ণনগর ব্রাহ্ম সমাজে উপাচার্যের কাজ করেছেন জানতে পেরে তিনি বিরক্ত হয়ে রাজবাড়ী হতে ব্রাহ্ম সমাজ তুলে দেন। দেবেন্দ্রনাথ পরে একজন ব্রাহ্মণকে কৃষ্ণনগরে উপাচার্য করে পাঠান। জাত্যভিমান বোধ উনবিংশ শতাব্দীতে এতই প্রবল ছিল যে ধর্মান্তরিত, উচ্চশিক্ষিত, বিদেশীভাবাপন্ন বাঙালী খ্রীষ্টানরাও অনেক সময় অসতর্ক ভাবে জাতিগর্বের পরিচয় দিতেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র, রাজনারায়ণ বসুর সহাধ্যায়ী, ব্যারিষ্টার জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রায়ই গর্ব করে বলতেন, "I am a Brahmin Christian"। খ্রীষ্টীয় প্রচারক রেভারেণ্ড লালবিহারী দে জাতিতে সুবর্ণ বণিক ছিলেন, কিন্তু তাঁর ধারণা ছিল সুবর্ণবণিক মাত্রই বৈশ্য-জাতীয়, এবং নিজেকে বৈশ্যজাতির লোক বলে পরিচয় দিতে তিনি গর্ববোধ করতেন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এ সব কাহিনী

আমাদের বিস্ময় জাগাতে পারে, কিন্তু মনে রাখা উচিত যে বহুযুগসঞ্চিত সামাজিক সংস্কার সব সময়েই অত্যন্ত প্রবল হয়, এবং এক যুগের চেষ্টায় তা সমূলে বিনাশ করা অসম্ভব। জাতিগত সংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজন আজও আমাদের সমাজে শেষ হয়ে যায় নি।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা কমলালয় (১৮২৩)
রাজনারায়ণ বসু, সেকাল আর একাল (১৮৭৫), আত্মচরিত (১৯০৮)
শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ (১৯০৩)
বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী—সমাজ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৪৫ সন)
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী (সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত, ১৯৬২)
প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী (তারিখ নাই)
স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড (১৩৬৯ সন)
প্যারীচাঁদ মিত্র, রামকমল সেন (সুশীলকুমার গুপ্তের বঙ্গানুবাদ, ১৯৬৪)
বিপিনচন্দ্র পাল, সত্তর বৎসর—আত্মজীবনী (১৯৬২)
বিপিনবিহারী গুপ্ত (সম্পাদিত), পুরাতন প্রসঙ্গ, ৩ খণ্ড একত্র (১৯৬৬) (সম্পাদক—বিশু মুখোপাধ্যায়)
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২ খণ্ড (১৩৫৬ সন)
ক্ষিতিমোহন সেন, জাতিভেদ (১৩৫৩ সন)
নির্মলকুমার বসু, হিন্দু সমাজের গড়ন (১৩৫৬ সন)
নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ (১৩৫২ সন)
সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর-খুলনার ইতিহাস (১৯৬৩)
গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলায় উনবিংশ শতাব্দী (১৩৬৩ সন)

রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলা দেশের ইতিহাস—মধ্যযুগ (১৩৭৩ সন)
সুকুমার সেন, মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী (১৯৪৫)
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী (১৩৭৬ সন)
সরলা দেবী, জীবনের ঝরাপাতা (১৯৫৭)
উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, আচার্য কেশবচন্দ্র, প্রথম খণ্ড (১৯৩৮)
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ, ১৭৮৭ শকাব্দ
H. T. Colebrooke, *Remarks On The Present State of Husbandry And Internal Commerce of Bengal* (1795)
W. Hamilton, *The East India Gazetteer*, Vol I (1828)
J. C. Marshman, *The Life And Times of Carey, Marshman And Ward*, Vol I (1859)
S. D. Collet, *The Life And Letters of Raja Rammohun Roy*, edited by D. K. Biswas and P. C. Ganguli (1962)
K. Nag and D. Burman (Eds.) *The English Works of Raja Rammohun Roy*, Parts II and IV.
S. N. Sastri, *History of The Brahmo Samaj*, Vol. I (1911)
P. N. Bose, *A History of Hindu Civilization During British Rule In India*, Vol II (1894)
S. N. Banerjee, *A Nation In Making* (1925)
K. K. Datta, *Survey of India's Social Life And Economic Condition In The Eighteenth Century (1707-1813)* (1961)
N. K. Sinha (Ed.) *The History of Bengal (1757-1905)* (1967)
J. H. Hutton, *Caste In India* (1963)
P. Sinha, *Nineteenth Century Bengal* (1965)

বাঙালী হিন্দু সমাজে বর্ণ ও বৃত্তি

গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তি আছে:—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম-বিভাগশঃ"। গুণ ও কর্মের তারতম্য অনুসারেই নাকি ভগবান ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের সৃষ্টি করেছিলেন। গুণ বা প্রবৃত্তির সঙ্গে বর্ণ বা জাতির যোগাযোগ অনেক সময়েই আমাদের কাল্পনিক মনে হয়, তবে কর্ম বা বৃত্তির সঙ্গে আদিতে জাতিভেদের সম্পর্ক ছিল বলে ঐতিহাসিকদের ধারণা। স্বজাতিনির্দিষ্ট বৃত্তি লঙ্ঘন করাকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষা ও নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংঘাতের ফল বলেই অনেকে মনে করেন। কিন্তু বাংলা দেশের অতীত ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের লোক প্রাচীন যুগ হতেই নানা কারণে তাঁদের জাতিগত বৃত্তি লঙ্ঘন করে এসেছেন, এবং সেজন্য তাঁরা সমাজে বিশেষ নিন্দনীয় বা অপাংক্তেয় হন নি। এমন কি, বৃত্তি পরিবর্তনের ফলে তাঁদের বর্ণান্তরও ঘটে নি। ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর 'সামাজিক প্রবন্ধ' (১৮৯২) গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে মনুর সময় হতেই (খ্রীঃ পূঃ ২০০—২০০ খ্রীষ্টাব্দ) বৃত্তির ব্যাপারে কিঞ্চিৎ শিথিলতা আমাদের সমাজে দেখা গিয়েছিল। মনু নিজেই বিধান দিয়েছেন যে ব্রাহ্মণ স্বজাতিনির্দিষ্ট বৃত্তি অবলম্বনে জীবিকা নির্বাহে অসমর্থ হলে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের বৃত্তি গ্রহণ করে জীবিকা উপার্জন করতে পারে। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মতে বাংলাদেশে প্রকৃত ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য কোন-দিনই ছিল না। এদেশের বর্ণ-বিন্যাস ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র বর্ণ ও অন্ত্যজ-ম্লেচ্ছদের নিয়ে গঠিত। করণ-কায়স্থ এবং অম্বষ্ঠ-বৈদ্যেরা ও অন্যান্য সংকর বর্ণ সমস্তই শূদ্র পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু কি ব্রাহ্মণ, কি অব্রাহ্মণ সব বর্ণের লোকেই প্রাচীন যুগে ব্যক্তিগত রুচি, প্রভাব প্রতিপত্তি কামনা, আর্থিক উন্নতির প্রেরণা ইত্যাদি নানা কারণে তাঁদের জাতিগত বৃত্তি পরিহার করে অনেক সময় অন্য বৃত্তি বা জীবিকা অবলম্বন করেছেন। ব্রাহ্মণেরা প্রধানতঃ ধর্মকর্মানুষ্ঠান, পৌরোহিত্য, শাস্ত্রাধ্যায়ন ও অধ্যাপনা

বৃত্তি অবলম্বন করলেও ছোট-বড় রাজকর্ম, যোদ্ধ-ব্যবসায় এবং কৃষিকার্য তাঁদের পক্ষে একেবারে নিষিদ্ধ ছিল না, অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বৃত্তি প্রয়োজন হলে তাঁরা গ্রহণ করতেন। স্মার্ত পণ্ডিত ভবদেব ভট্টের (সেন-বর্মণ যুগ) তালিকায় ব্রাহ্মণদের নিষিদ্ধ কর্ম বলে উল্লিখিত হয়েছে—শূদ্রবর্ণের অধ্যাপনা ও তাঁদের পৌরোহিত্য, চিকিৎসা ও জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা এবং চিত্রাঙ্কনের মতো শিল্পবিদ্যা। বিশুদ্ধ জ্ঞান বা অধ্যাত্মজ্ঞান চর্চার তুলনায় ব্যবহারিক জ্ঞান চর্চার স্থান নিম্নে ছিল বলেই বোধ হয় গণক বা গ্রহবিপ্ররা ব্রাহ্মণ-সমাজে পতিত ছিলেন, এবং চিকিৎসা প্রধানতঃ যাঁদের বৃত্তি ছিল সেই অম্বষ্ঠ-বৈদ্যেরাও ধর্ম-কর্মানুষ্ঠানে শূদ্র বলে গণ্য হতেন। ডঃ রায় দেখিয়েছেন যে পাল-চন্দ্র এবং সেন-বর্মণ আমলে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় অষ্টম হতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে বহু ব্রাহ্মণ রাজা, সামন্ত, মন্ত্রী, সেনাপতি, রাজকর্মচারী ও কৃষিজীবীর বৃত্তি গ্রহণ করেছেন, অম্বষ্ঠ-বৈদ্যেরা (প্রধানতঃ চিকিৎসক) মন্ত্রী হয়েছেন, করণ-কায়স্থেরা (প্রধানতঃ লেখক ও হিসাব-রক্ষক বা কেরানী) সৈনিক বৃত্তি ও চিকিৎসা বৃত্তির অনুসরণ করেছেন এবং কৈবর্তরা (নৌ-চালক ও মৎস্যজীবী) রাজকর্মচারী ও রাজ্যশাসক হয়েছেন, এমন কি সাহিত্য চর্চাও করেছেন। তবে সাধারণতঃ অধিকাংশ লোকই সে যুগে নিজেদের বর্ণবৃত্তির অনুশীলন করতেন বলে ঐতিহাসিকদের ধারণা। বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে (খ্রীঃ ১২শ-১৪শ শতাব্দীর মধ্যে রচিত) ব্রাহ্মণেতর যে সব জাতিকে সংকর বর্ণ বা শূদ্র বর্ণ বলে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে (তন্তুবায়, কর্মকার, কুম্ভকার, স্বর্ণকার, বণিক ইত্যাদি। তাদের মধ্যে অনেকে কিন্তু বৃত্তি-পরিচয়ের দ্বারাই পরিচিত। বৃত্তি পরিবর্তন করলে এঁদের জাতি-পরিচয়ও এক থাকার কথা নয়। তবে এঁদের মধ্যেও যে বৃত্তি-পরিবর্তন অসম্ভব ছিল না কৈবর্ত জাতির এক অংশের পরবর্তীকালে কৃষিবৃত্তি গ্রহণ ও মাহিষ্যদের সঙ্গে অভিন্নতা-লাভই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত মোনিয়ার উইলিয়ামসের মতে এই বৃত্তি-পরিচায়িত বর্ণগুলির (trade castes) মধ্যে জাতিভেদ প্রথার বিধি-নিষেধগুলি কঠোরভাবে পালন করা হ'ত।

এগুলির সঙ্গে মধ্যযুগের ইউরোপের শিল্পী-সংঘ বা artisans' guilds-গুলির সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়।

মধ্যযুগের ঐসলামিক রাজশক্তি প্রতিযোগিতা-বিহীন, বংশগত বৃত্তি-নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিল না। ফলে বিভিন্ন বর্ণের লোকেদের স্ব-স্ব বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাখার ব্যাপারে স্বভাবতঃই আরো শিথিলতা দেখা দেয়। ব্রাহ্মণেরা অনেকেই তখনো শাস্ত্রচর্চা ও অধ্যাপনা করতেন, কিন্তু যজন-যাজনরত মূর্খ বিপ্রেরও সমাজে অভাব ছিল না। মুকুন্দরাম তাঁর "কবিকঙ্কন চণ্ডী"তে (১৫৭৯ খ্রীঃ) কাল-কেতুর নতুন রাজধানী বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন,—

"মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে নগরে যাজন করে
শিখিয়া পূজার অধিষ্ঠান।
চন্দন তিলক পরে দেব পূজে ঘরে ঘরে
চাউলের কোচড়া বান্ধে টান।"

সমসাময়িক কালের মূর্খ ব্রাহ্মণদের কটাক্ষ করতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও (১৪৮৬-১৫৩৩) পরাঙ্মুখ হন নি।

"প্রভু কহে সন্ধিকার্য্য জ্ঞান নাহি যার।
কলিযুগে ভট্টাচার্য্য পদবী তাহার॥"

আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত জয়নারায়ণ সেনের "হরিলীলা" পাঠে মনে হয়, ব্রাহ্মণেরা ঐ যুগে শুধু শাস্ত্রচর্চা করতেন না, অন্ততঃ তাঁদের মধ্যে কিছু লোক রাজনীতি চর্চাও করতেন।

"দক্ষিণে বসিয়া বেদবক্তা দ্বিজগণ।
রাজনীতি কহে কহে ব্রহ্ম নিরূপণ॥"

ব্রাহ্মণদের পরেই ছিল সমাজে বৈদ্য ও কায়স্থ উপবর্ণের স্থান। বৈদ্যেরা প্রধানতঃ চিকিৎসা-বৃত্তি গ্রহণ করতেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের ন্যায় অধ্যয়ন-অধ্যাপনারত বৈদ্যের উল্লেখও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায়। চৈতন্য-অনুচর, নবদ্বীপ-নিবাসী মুরারি গুপ্ত জাতিতে বৈদ্য হলেও সর্বদা ব্যাকরণাদি শাস্ত্রের চর্চা করতেন। চৈতন্যদেব তাই তাঁকে পরিহাস করে বলেছেন,—

"প্রভু বোলে বৈদ্য তুমি ইহা কেনে পড়।
লতা পাতা নিঞা গিয়া রোগী কর দড়॥
ব্যাকরণ-শাস্ত্র এই বিষমের অবধি।
কফ-পিত্ত-অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি॥"

চৈতন্যদেবের পরিচিত, বারাণসী-প্রবাসী চন্দ্রশেখর জাতিতে বৈদ্য হলেও কায়স্থদের ন্যায় লিখন-বৃত্তি গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কায়স্থ উপবর্ণের লোকেরা সাধারণতঃ মসীজীবী ও রাজকর্মচারী হলেও কখনো কখনো রাজ্যশাসনের এবং প্রজাপালনের দায়িত্বও গ্রহণ করতেন। বারভূইঞাদের মধ্যে অনেকে জাতিতে কায়স্থ ছিলেন, "আইন-ই-আকবরী" গ্রন্থেও বাংলাদেশে অনেক কায়স্থ রাজার নাম পাওয়া যায়। সমাজে ব্রাহ্মণেরা শ্রেষ্ঠ বর্ণের মর্যাদা পেলেও কায়স্থদের বৈষয়িক প্রতিপত্তি বোধ হয় বেশীই ছিল। ইচ্ছা মতো বৃত্তি গ্রহণের এই স্বাধীনতা অবশ্য মধ্যযুগেও কিছুটা সীমাবদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ সন্তান মুচি-হাড়ি-ডোম প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির বৃত্তি গ্রহণ করেছেন, অথবা কোনো শূদ্র যজন-যাজন, পৌরোহিত্য করছেন এরকম দৃষ্টান্ত মধ্যযুগে, অন্ততঃ বর্ণাশ্রমী সমাজে, পাওয়া যায় না। যজন-যাজন প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদের একাধিপত্য থাকার জন্যই বোধ হয় সমাজে ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত হতেন।

আগেই বলা হয়েছে যে বাংলা দেশে প্রকৃত ক্ষত্রিয় জাতি কখনো ছিল না, যদিও পরবর্তীকালের কোনো কোনো গ্রন্থে কায়স্থদের ক্ষত্রিয়ত্ব দাবী করা হয়েছে। মুকুন্দরামের কাব্যে বাংলা দেশে 'ক্ষত্রি' ও রাজপুত জাতির উল্লেখ করা হয়েছে যাদের বৃত্তি ছিল মল্ল-বিদ্যা শিক্ষাদান, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি। কিন্তু মুকুন্দরাম ক্ষত্রিয় রাজপুতদের স্থান শূদ্র কায়স্থদের নিম্নে নির্দেশ করেছেন। এ বিষয়ে "কবিকঙ্কণ চণ্ডী"তে ভাঁড়ুদত্তের প্রতি কালকেতুর উক্তি স্মরণীয়—

"হয়্যা বেটা রাজপুত বোলহ কায়স্থ-সুত
নীচ হয়্যা উচ্চ অভিলাষ।"

কায়স্থেরা লেখাপড়ার কাজ করতেন বলেই কি তাঁদের এই বিশেষ সম্মান? মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য আলোচনা করলে দেখা যাবে যে সে সময় অস্ত্র চালনা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ, অর্থাৎ ক্ষত্রিয় জাতির কার্য এদেশে প্রধানতঃ শূদ্র বর্ণের, এমন কি অন্ত্যজ জাতির, করণীয় ছিল। এঁদের মধ্যে আগুরি বা উগ্রক্ষত্রিয়দের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায়। কৃষিবৃত্তি ও সামরিক বৃত্তি উভয়ের প্রতিই এঁদের সমান আকর্ষণ ছিল। বাগ্‌দী, হাড়ী, ডোম প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির লোকেরাও এ যুগে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন।

শূদ্র ও অন্ত্যজ জাতির লোকেরা বাংলাদেশে যে শুধু সামরিক বৃত্তিতে পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন তা নয়, শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারেও এঁরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে যথেষ্ট উৎকর্ষের পরিচয় দেন। গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক প্রভৃতি শূদ্র জাতির লোকেরা একদিকে যেমন ব্যবসায়-বাণিজ্য করে ধনবান ও প্রতিপত্তিশালী হতেন (বাংলা মঙ্গল কাব্য তার সাক্ষ্য বহন করছে), তেমনি অপর দিকে বিদ্যাচর্চা ও গ্রন্থরচনার প্রতিও তাঁদের যথেষ্ট অনুরাগ দেখা গিয়েছিল। ষষ্ঠীবর সেন, গঙ্গাদাস সেন প্রমুখ বণিকেরা মধ্যযুগে গ্রন্থ রচনা করে খ্যাত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে, মাঝি কায়েৎ, রামনারায়ণ গোপ, ভাগ্যমন্ত ধুপী প্রভৃতি নিম্নবর্ণজাত লোকেরা পুঁথি-লেখক বলে উল্লিখিত হয়েছেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন নাপিত নল-দময়ন্তীর কাহিনী বাংলা কবিতায় বর্ণনা করেছেন। রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন যে তিনি বাল্যকালে (উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে) চব্বিশ পরগণার বোড়াল গ্রামে যে গুরুমহাশয়ের কাছে লেখাপড়া শিখেছিলেন তিনি বর্ধমান জেলার লোক এবং জাতিতে আগুরি ছিলেন। Adam সাহেবের বিবরণী (১৮৩৫-৩৮) থেকেও জানা যায় যে জাতিভেদ প্রথার প্রাবল্য সত্ত্বেও মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূম জেলায় কলু, শুঁড়ি, ধোপা, মালা ও চণ্ডালজাতীয় গুরুমহাশয়দের পাঠশালাগুলিতে বর্ণহিন্দু ছাত্রের অভাব হ'ত না। এ কথা বোধ হয় ঐ সময় বাংলা

দেশের অন্যান্য জেলার সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। Adam অবশ্য লিখেছেন যে পাঠশালার গুরুমহাশয়দের মধ্যে কায়স্থ জাতীয় লোকেরাই (ব্রাহ্মণেরা নন!) সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর "মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙ্গালী" বইতে লিখেছেন, "দক্ষিণ রাঢ়ে স্থানে স্থানে এখনো ডোম ও বাগ্‌দী পণ্ডিতের টোল আছে। সেখানে ব্যাকরণ, কাব্য ইত্যাদির পঠন-পাঠন হয় এবং বামুনের ছেলেরাও পড়ে।" এই ব্যাপারটিকে মধ্যযুগীয় ধারার অনুকরণ বলেই গ্রহণ করতে হবে, কারণ, এই সব টোলের শিক্ষা-ক্রম পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ছিল না। উপরের সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে সহজেই এই সিদ্ধান্তে আসা চলে যে মধ্য-যুগের শেষে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাবৃত্তি ব্রাহ্মণ বা উচ্চ বর্ণের লোকেদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না।

কেবলমাত্র লৌকিক জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে নয়, পারমার্থিক জ্ঞানের রাজ্যেও নিম্নবর্ণের লোকেদের প্রবেশাধিকার মধ্যযুগের বাঙালী সমাজে স্বীকৃত ছিল। ঐ সময়ের বাংলা সাহিত্য থেকে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এ বিষয়ে কয়েকটি সুন্দর নিদর্শন দিয়েছেন। মাণিকচন্দ্র রাজার গানে আছে যে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের মা তাঁকে হাড়ী-জাতীয় এক গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে বলেছিলেন। "শূন্যপুরাণ"-রচয়িতা ডোম-জাতীয় রামাই পণ্ডিত ধর্মপূজার পুরোহিত ছিলেন এবং নিজ অনুচরদের কাছে ব্রাহ্মণোচিত মর্যাদাই পেয়েছিলেন। চণ্ডীদাসের সঙ্গে রজকিনী রামীর নামও বৈষ্ণব পদাবলীতে যুক্ত হয়েছে। ডঃ মজুমদার ঠিকই বলেছেন, "স্মৃতি ও পুরাণের গণ্ডীর বাহিরে সহজিয়া, তান্ত্রিক, নাথ প্রভৃতি নব্য-পন্থী যে সব ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল তাহারাই বর্ণাশ্রম ধর্মের গণ্ডীর বাহিরে এই সব নিম্ন জাতিকে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।" অবশ্য এই বক্তব্যকেই বোধ হয় অন্যভাবে বলা চলে যে সহজিয়া, তান্ত্রিক, নাথ, যোগী প্রভৃতি নব্যপন্থী ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব বর্ণাশ্রম ধর্মের কঠোরতা ও আচার-সর্বস্বতার বিরুদ্ধে সমাজের নিম্নজাতির লোকেদের বিদ্রোহের ফলশ্রুতি। মধ্যযুগের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজেও বহু অব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণদের মন্ত্র-গুরুর পদ গ্রহণ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতেও এই সব নিম্নবর্ণের

লোকেদের ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতারূপে কখনো কখনো দেখা যায়। সদ্‌গোপ-জাতীয় রামশরণ পাল (নৈহাটির কাছে ঘোষপাড়া গ্রামে বাস) কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাঁর পুত্র রামদুলাল ১৬ বৎসর বয়সে নিজেকে ঈশ্বরের অবতার বলে ঘোষণা করেন। নদীয়া জেলার মেহেরপুর নিবাসী বলরাম হাড়ী (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্ম) বলরামী সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেছিলেন, এবং তাঁর অনুগামীরা তাঁকে বিষ্ণুর অবতার বলে পূজা করতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগসন্ধিক্ষণে উদ্ভূত এই সব নতুন ধর্মসম্প্রদায়গুলি অবশ্য জাতিভেদ প্রথাকে স্বীকারই করেন নি, এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা মুসলমানদেরও নিজেদের দলে স্থান দিয়েছিলেন।

ইসলাম ধর্ম নীতিগত ভাবে জাতিভেদ প্রথার তীব্র বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও মধ্যযুগের বাঙালী মুসলমান সমাজে শেখ, সৈয়দ, পাঠান, মোগল প্রভৃতি সামাজিক ভেদ ছাড়াও বৃত্তিগত শ্রেণীভেদ ছিল বলে মনে হয়। এই ব্যবস্থাকে মুসলমান সমাজের উপর হিন্দু সামাজিক পরিবেশের প্রভাব বলে মনে করা যেতে পারে। অথবা এ-ও সম্ভব যে স্থানবিশেষে কোনো বিশেষ জাতির লোকেরা ধর্মান্তরিত হবার পরেও জাতিগত বৃত্তিকে আশ্রয় করে ছিল। মুকুন্দরামের "কবিকঙ্কন চণ্ডী"-তে এই ধরণের কয়েকটি ইসলামী জাতির নাম পাওয়া যায়, যথা—জোলা (তাঁত বয়নকারী), পিঠারি (পিঠা-বিক্রেতা), কাবাড়ি (মৎস্য-বিক্রেতা), হাজাম (সুন্নৎকারী), কাগজী (কাগজ প্রস্তুতকারক), রঙ্গরেজ (রঙের কাজ করে), কসাই (গোমাংস-বিক্রেতা) ইত্যাদি। তবে এই শ্রেণীভেদ সম্পূর্ণ বংশানুক্রমিক ছিল কি না সঠিক জানা যায় না। "চৈতন্যভাগবত" পাঠে মনে হয় যে এদেশের মুসলমানদেরও ব্রাহ্মণদের মতো প্রবল জাতিগর্ব ছিল (রাজার জাতি হিসাবে তা অস্বাভাবিক নয়!), এবং ব্রাহ্মণদের দেখাদেখি তাঁরাও কিছু কিছু জাতিগত আচার পালন করতেন। যবন হরিদাসের হিন্দু বা বৈষ্ণব-সুলভ আচার সংশোধনের জন্য মুসলমান 'মুলুকপতি' তাঁকে তিরস্কার করে বলেছেন,—

"কত ভাগ্যে দেখ তুমি হৈয়াছ যবন।
তবে কেনে হিন্দুর আচারে দেহ মন॥
আমরা হিন্দুরে দেখি নাই খাই ভাত।
তাহা তুমি ছোড় হই মহাবংশজাত॥
জাতি-ধর্ম লজ্ঘি কর অন্ন ব্যবহার।
পরলোকে কেমতে বল পাইবে নিস্তার॥"

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন দেখিয়েছেন যে সাম্প্রতিককালেও বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে (যথা, বীরভূম) মুসলমানেরা হিন্দু গৃহে অন্ন গ্রহণ করতেন না, যদিও দই চিঁড়া অথবা ঘৃতপক্ক খাদ্য গ্রহণে তাঁদের বিশেষ আপত্তি ছিল না।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে কলকাতায় ইংরেজ রাজশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। দেশীয় লোকেদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা সেই আদি যুগের কলকাতাকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেন। একটি বহুপ্রচলিত বাংলা ছড়া আছে যে কায়স্থ, পিরালী (ব্রাহ্মণ), তন্তুবায় ও সুবর্ণ-বণিকেরাই কলকাতা শহর গড়েছিলেন। কায়স্থদের মধ্যে হাটখোলার দত্ত, কুমারটুলির মিত্র ও শোভাবাজারের দেবেরা. পিরালীদের মধ্যে পাথুরিয়াঘাটা ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুরেরা, তন্তুবায়দের মধ্যে শেঠ ও বসাকেরা এবং সুবর্ণবণিকদের মধ্যে ধর ও মল্লিকেরা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। তন্তুবায়-জাতির শেঠ ও বসাক ব্যবসায়ীরাই বোধ হয় এঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম, পলাশীর যুদ্ধেরও আগে, গোবিন্দপুরে বসতি স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, ১৭৫৭ হতে ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে, কলকাতার সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীদের মধ্যে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের, বিশেষতঃ কায়স্থদের, প্রাধান্য সুস্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়, এবং এঁরাই কলকাতার বাঙ্গালী হিন্দুসমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। অন্যভাবে বলা চলে যে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র (কায়স্থ) উভয় বর্ণের লোকেই এ যুগের কলকাতা শহরে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করে সমাজসৌধের শীর্ষে আরোহণ করেন। বিত্তশালী ব্যক্তি চিরদিনই সমাজে প্রতিষ্ঠাবান হন, কিন্তু এই সময় হতে অর্থই আমাদের সমাজে কৌলীন্যের মানদণ্ডরূপে গৃহীত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় এই উচ্চ বর্ণের ব্যবসায়ীরাই লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুযোগ গ্রহণ করে জমিদার শ্রেণীতে রূপান্তরিত হন। ব্যবসায় বাণিজ্য এর পর আবার নিম্নবর্ণের পুরাতন বণিকগোষ্ঠীর হাতে ফিরে আসে।

উপরের আলোচনা হতে যে সত্যটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল এই যে আধুনিক যুগের বহু পূর্ব হতেই বাঙালী সমাজে জাতি বা বর্ণের সঙ্গে বৃত্তির কোনো অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল না, বর্ণ সব সময় বৃত্তিনির্ভর ছিল না। জাতিভেদের প্রধান সাবধানতা ছিল দুটি বিষয়ে,—প্রথম, বিবাহ-সম্বন্ধ বিচার ও দ্বিতীয়, খাদ্যাখাদ্য বিচার, সংক্ষেপে, হিন্দীতে "রোটি-বেটি"র বিচার। হয়ত, সুপ্রাচীন যুগে ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতি বা বর্ণ বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর (ethnic group) লোক দিয়ে গঠিত হয়েছিল, এবং তারা বৃহত্তর হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত হয়েও স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এই দুই বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করে। অসবর্ণ বিবাহ ও ব্যভিচারের ফলে কিছু কিছু রক্তের মিশ্রণ ঘটলেও মোটের উপর এই বর্ণবিশুদ্ধি রক্ষার প্রচেষ্টা আধুনিককালের সূচনা পর্যন্ত বাঙালী হিন্দুসমাজে যথেষ্ট প্রবল ছিল। জাতিভেদ প্রথার আনুষঙ্গিক স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বিচার বহু পরিমাণে আর্য সভ্যতার উপর আর্যেতর জাতির প্রভাব বিস্তারের ফল বলেও অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। এই কারণেই বোধ হয় জাতিভেদ প্রথার তীব্রতা আর্যপ্রধান উত্তর ও পশ্চিম ভারতের তুলনায় অনার্যপ্রধান দক্ষিণ ভারতে অনেক প্রবল। ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠার ফলে বাংলা দেশে যে বৈশ্যযুগের সূচনা হয় তাতে প্রথম দিকে এই "রোটি-বেটি"র বিচার বিশেষ শিথিল হয় নি। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বিস্তার ও বিভিন্ন ধর্ম এবং সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলনের ফলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হতে ধীরে ধীরে এই ব্যাপারে সমাজ-চেতনা জাগ্রত হতে থাকে ও বিভিন্ন বর্ণের লোকেদের মধ্যে প্রকাশ্যে একত্র আহারাদি প্রচলনের সূচনা দেখা যায়। কিন্তু তার বহু পূর্বেই বৃত্তি ও বর্ণের মধ্যে যে স্বল্প সংযোগ ছিল তা অত্যন্ত ও দুর্বল হয়ে পড়ে। H. T. Colebrooke সাহেব তাঁর ১৭৯৫

খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত *Remarks On the Present State of Husbandry And Internal Commerce Of Bengal* বই-এ লিখেছেন যে সেই সময় কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে অন্য সব বৃত্তিই সব বর্ণের লোকেদের কাছে উন্মুক্ত ছিল, যদিও কৌলিক বৃত্তি অনুসরণ করা সবার কাছে বাঞ্ছনীয় ছিল। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত *East India Gazetteer*-এ এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে। গ্রন্থের লেখক Hamilton সাহেব লিখেছেন,—"In practice little attention is paid to the limitation of castes, daily observation showing Brahmins exercising the marital profession of a Khetri, and even the menial one of a Sudra...every profession, with a few exceptions, being open to every description of persons. তথাকথিত professional caste-গুলির মধ্যে কৌলিক বৃত্তির প্রতি আনুগত্য হয়ত কিছু বেশি ছিল, কিন্তু এঁরাও সকলে স্বজাতির ঐতিহ্য অনুসরণ করতেন না। ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর তিলি জাতির অনেকে সুতা তৈরীর ব্যবসায়ে যোগদান করেন, সুবর্ণবণিকেরা কোম্পানির আমলেই বেনিয়ান ও মুৎসুদ্দির কাজে পারদর্শিতা দেখান, নমঃশূদ্রেরাও সামরিক বৃত্তি ত্যাগ করে কৃষিজীবী হন। উনিশ শতকের শেষ দিকে পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলায় চণ্ডালেরা প্রধানতঃ কৃষিজীবী-ই ছিলেন। কৌলিক বৃত্তিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা, বিশেষতঃ উচ্চ বর্ণগুলির মধ্যে, খুবই বিরল ছিল। এরকম একটি বিরল ঘটনার নিদর্শন ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে প্রকাশিত *Calcutta Gazette*-এর পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়। কলকাতার কিছু বৈদ্যজাতীয় চিকিৎসক চিকিৎসা বৃত্তিকে স্বজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য এই সময় একটি সমিতি স্থাপন করেন। ঐ সমিতির পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে বৈদ্য ভিন্ন অন্য কোন বর্ণের চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলে বৈদ্যজাতীয় কোনো চিকিৎসক আর সেই রোগীর চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করবে না। কিন্তু এ ঘটনাটিকে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বলেই আমাদের গ্রহণ করা উচিত। প্রয়োজনবোধে বর্ণগত বৃত্তি

লঙ্ঘনের প্রাচীন ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তি উনবিংশ শতাব্দীতে দিন দিন আমাদের সমাজে প্রবলতর হতে থাকে, এবং এ ব্যাপারে নিম্নবর্ণের লোকেদের তুলনায় উচ্চ বর্ণের লোকেদেরই (যারা ইংরাজী শিক্ষার এবং নতুন সমাজ ব্যবস্থার সুযোগ প্রথম গ্রহণ করেছিলেন) অগ্রণী হতে দেখা যায়। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় Cotton সাহেব তাঁর *Calcutta Old And New* বইএ মন্তব্য করেছেন যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে বাঙ্গালী সমাজে যে নতুন উদার দৃষ্টিভঙ্গীর জন্ম হয়েছে তাতে জাতিগত বৃত্তিভেদ বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হলেও নিম্ন বর্ণের লোকেরা তার দ্বারা খুব বেশী উপকৃত হয় নি। "The lower castes have not emancipated themselves as completely as the higher". Cotton সাহেবের বিবরণ অনুযায়ী ধোপা, ছত্রি, মালো, ডোম, হাড়ী প্রভৃতি বর্ণের লোকেরা তখনো পর্যন্ত সাধারণ-ভাবে তাঁদের বর্ণগত বৃত্তি আশ্রয় করে ছিলেন। কিন্তু কায়স্থদের অধিকাংশই বর্তমান শতকের সূচনায় ব্যবসায় ও চাকুরী গ্রহণ করেন, বৈদ্যেরা চাকুরী, অধ্যাপনা ও চিকিৎসা বৃত্তি অবলম্বন করেন এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে মাত্র শতকরা তেরো জন তাঁদের শাস্ত্রসম্মত বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। বর্ণের সঙ্গে বৃত্তিকে মেলানো এর পরে আমাদের সমাজে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

গ্রন্থপঞ্জী

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কবিকঙ্কণ চণ্ডী (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ, ১৯৫২)

বৃন্দাবন দাস, শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত (বসুমতী সংস্করণ)

কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৩৫১ সন)

দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড (১৯১৪)

ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ভূদেব-রচনাসম্ভার (প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, ১৩৬৪ সন)

রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত (১৯০৮)
অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (১ম খণ্ড, ১৮৮৮)
ক্ষিতিমোহন সেন, জাতিভেদ (১৯৪৭)
সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড (১৯২৮)
রমেশচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), বাংলা দেশের ইতিহাস—মধ্যযুগ (১৩৭৩ সন)
সুকুমার সেন, মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙ্গালী (১৯৪৫)
নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালী হিন্দুর বর্ণভেদ (১৩৫২ সন)
শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ, বাঙ্গালী জাতি পরিচয় (তারিখ নাই)
M. Monier Williams, *Hinduism* (1877)
The Rev. J. Long (Ed.) *Adam's Reports On Vernacular Education In Bengal And Bihar* (1868)
H. H. Wilson, *Essays and Lectures Chiefly on the Religion of the Hindus*, Vol. 1 (1862)
H. T. Colebrooke, *On the Present State of Husbandry and Internal Commerce of Bengal* (1795)
W. Hamilton, *The East India Gazetteer* (1828)
R. Carstairs, *Human Nature In Rural Bengal* (1895)
H. E. A. Cotton, *Cal utta Old and New* (1907)
A. C. Dasgupta (Ed.) *Selections from Calcutta Gazette, 1824-1832* (1959)
N.K. Sinha (Ed.) *The Economic History of Bengal*, Vol. II (1962)
N. K. Sinha (Ed.) *The History of Bengal, 1757-1905* (1967)
J. H. Hutton, *Caste in India* (1963)

বাংলা দেশে কৌলীন্য প্রথার অত্যাচার

"আর গুণ যার গুণ তার সঙ্গে যায়।
কুলগুণ মহাগুণ পুরুষক্রমে পায়॥
অসৎ করয়ে সৎ কুলের এই কর্ম্ম।
লোহারে করয়ে সোনা পরশের ধর্ম্ম॥"

মধ্যযুগের 'কুলসার' গ্রন্থে ঘোষিত কৌলীন্যপ্রথার এই মহিমা উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলা দেশের সমস্ত হিন্দু সমাজ অবনতশিরে স্বীকার করে নিয়েছিল। হিন্দুশাস্ত্র লঙ্ঘন করে অত্যন্ত অন্যায় কাজ করলেও 'নিকষ কুলীন' সমাজে শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভে বঞ্চিত হতেন না। বাংলা দেশে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্ত্তন ও প্রসার লাভ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মহলে যথেষ্ট আলোচনা ও তর্কবিতর্ক হয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত অনেক বিষয়েই কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নি। মধ্যযুগের কুলজী গ্রন্থমালা (১৫শ-১৮শ শতাব্দী), গোপাল ভট্ট ও আনন্দ ভট্টের 'বল্লালচরিত' (১৪-১৬শ শতাব্দী) এবং বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ নামে দুটি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন পুরাণগ্রন্থ কৌলীন্য প্রথার উৎপত্তি বিষয়ে যে সাক্ষ্য দেয় আধুনিক যুগের পণ্ডিতেরা তাকে একান্তই অনৈতিহাসিক বলে মনে করেন। প্রচলিত কাহিনী অনুসারে কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তান-সন্ততির মধ্যে বিদ্যালোপ ও অনাচার নিবারণের জন্যই সেনরাজ বল্লালসেন (আ ১১৫৮-১১৭৯ খৃঃ) বাংলাদেশে প্রথম কৌলীন্য প্রথার প্রচলন করেন। কোনো বিশেষ পরীক্ষার দ্বারা বল্লালসেন সে যুগের ব্রাহ্মণদের পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেন। এই পাঁচটি ভাগ হচ্ছে, যথাক্রমে, কুলীন, শ্রোত্রিয়, গৌণকুলীন, বংশজ ও সপ্তশতী সম্প্রদায়। এঁদের মধ্যে 'নবগুণ' বিশিষ্ট কুলীনেরাই ছিলেন শ্রেষ্ঠ, তাঁদের পরে ছিলেন শ্রোত্রিয়েরা, আর গৌণ কুলীনেরা তাঁদেরও পরে। সাধারণতঃ কুলীনেরা নিজেদের মধ্যেই বৈবাহিক

আদান প্রদান করবার অধিকারী ছিলেন। তবে শ্রোত্রিয় গৃহ হতে কন্যাগ্রহণ করাও দোষের ছিল না। কিন্তু যে সব কুলীন শ্রোত্রিয় পাত্রে কন্যাদান করতেন অথবা গৌণ কুলীনদের সঙ্গে কোনোরূপ বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতেন তাঁরা কুলভ্রষ্ট হয়ে বংশজ নামে পরিচিত হতেন। গৌণ কুলীনেরা কিছুকাল পরে শ্রোত্রিয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ করে 'সাধ্য শ্রোত্রিয়' বা 'কষ্ট শ্রোত্রিয়' নামে পরিচিত হ'ন আর আসল শ্রোত্রিয়েরা তখন আপন সম্মান বজায় রাখার জন্য নিজেদের 'সিদ্ধ শ্রোত্রিয়' বলে ঘোষণা করেন। কান্যকুব্জ হতে ব্রাহ্মণ আসার পূর্বে বাংলাদেশে যে সব অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত ও আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ বসবাস করতেন তাঁদের বংশধরেরা 'সপ্তশতী' নামে পরিচিত ছিলেন। এঁদের সঙ্গে পূর্বোক্ত চার সম্প্রদায়ের কোনো যোগাযোগ ছিল না। বৈদ্য ও কায়স্থ সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনুরূপভাবে কৌলীন্য মর্যাদা দান করা হয়েছিল, এমন কি সৎশূদ্রদের (তিলী, তাঁতি, কামার, কুমার) গুণ ও সঙ্গতি বিচার করে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লোকদেরও বল্লাল কুলীন করেছিলেন। অবশ্য ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও সৎশূদ্র প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের কুলীনদের মধ্যে সামাজিক ব্যবধান ছিল দুস্তর এবং বর্তমান প্রবন্ধে আমরা ব্রাহ্মণ কুলীনদের কথাই বিশেষভাবে আলোচনা করব। বল্লাল নাকি কৌলীন্য মর্যাদাকে বংশানুক্রমিক করে যান নি,—প্রত্যেক ছত্রিশ বৎসর অন্তর তিনি সমাজে গুণ ও কর্ম অনুসারে কুলীন নির্বাচনের আদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর পরবর্তী রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে (আ ১১৭৯-১২০৫ খৃঃ) এইরূপ একটি নির্বাচনের সাহায্যে কয়েকজন শ্রোত্রিয়কে কৌলীন্য মর্যাদা দান করা হয় এবং বিপরীতভাবে কয়েকটি কুলীন বংশ পতিত হয়ে বংশজ ও সিদ্ধ শ্রোত্রিয় হয়ে যান। কিন্তু এই ব্যাপার নিয়ে দেশে মহা বাদবিতণ্ডার সৃষ্টি হতে পারে এই আশঙ্কায় লক্ষ্মণসেন কৌলীন্য মর্যাদাকে বংশানুক্রমিক করে যান এবং একমাত্র পুত্র-কন্যার বিবাহের উৎকর্ষ-অপকর্ষদ্বারা এই মর্যাদার হ্রাসবৃদ্ধি সম্ভব বলে ঘোষণা করেন। এর ফলে গোলযোগের হয়ত অবসান ঘটেছিল কিন্তু সমাজে

দুর্নীতি প্রবেশের পথ প্রশস্ত হয়ে যায়। আধুনিক যুগের পণ্ডিতদের মধ্যে স্বর্গত রমাপ্রসাদ চন্দ ও শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় যাঁরা প্রথম কুলজী গ্রন্থগুলির ঐতিহাসিক মূল্যনিরূপণের চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা কিন্তু উপরের এই কাহিনীকে একেবারেই নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে ১৫শ-১৬শ শতকে যখন প্রথম কুলজী গ্রন্থগুলি রচিত হয় তখন প্রাক্‌মুসলমানযুগের বাংলার সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে তৎকালীন বাঙ্গালীর ধারণা ছিল খুবই অস্পষ্ট। রাজা আদিশূর ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা সে বিষয়েই সন্দেহ রয়েছে এবং তিনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি হলেও কান্যকুব্জ হতে ব্রাহ্মণ আসার বহু পূর্বেই, ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দী হতে যে বাংলা দেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যে বেদবেদাঙ্গের চর্চা যথেষ্ট ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে! সবচেয়ে বড় কথা এই যে কৌলীন্যপ্রথার সঙ্গে যে বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেনের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত তাঁদের নিজেদের লিপিমালায় অথবা তাঁদের আমলে রচিত স্মৃতি বা ব্যবহারগ্রন্থগুলির কোথাও এই প্রথা সম্বন্ধে ইঙ্গিত মাত্র নেই। এই যুগের ভবদেব ভট্ট, হলায়ুধ, বল্লালগুরু অনিরুদ্ধ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণপণ্ডিত এবং অসংখ্য অপেক্ষাকৃত অপরিচিত পণ্ডিতের যে সব উল্লেখ সমসাময়িক গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় তাঁদের একজনকেও কেউ কুলীন বলে উল্লেখ করেন নি। ব্রাহ্মণদের গাঞী বিভাগও (মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি) যে কৌলীন্য প্রথা অপেক্ষা অনেক প্রাচীন তাও এখন নিঃসন্দেহে প্রমাণিত। কুলজীগ্রন্থমালার প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ই এরূপ আরো দু-একটি অসঙ্গতির কথা স্বীকার করেছেন। সুতরাং ঠিক কি ভাবে, কোন্ সময়ে বাংলা দেশে কৌলীন্যপ্রথার আবির্ভাব হয়েছিল তা নিশ্চিত ভাবে এখন বলা যায় না, যদিও অন্ততঃ ১৫শ শতকের আগেই যে এর প্রথম সূচনা হয়েছিল একথা বোধ হয় কোনো ঐতিহাসিকই অস্বীকার করবেন না।

কিন্তু শুধু কৌলীন্যপ্রথা সমাজের যত অনিষ্ট সাধন করতে

পারত তার চেয়ে অনেক বেশী অনিষ্ট সাধন করার শক্তি তাকে দিয়েছিল দেবীবর ঘটক বিশারদের 'মেলবন্ধন' ব্যবস্থা। প্রচলিত কাহিনী অনুসারে বল্লাল সেন, গুণ-অনুসারে ব্রাহ্মণদের কুলীন, শ্রোত্রিয় ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করেছিলেন, আর তাঁর প্রায় দু'শ' বৎসর পরে দেবীবর ঘটক দোষ অনুসারে কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে 'মেলবন্ধনের' সৃষ্টি করলেন। সেন রাজাদের আমল হতেই বাংলা দেশে, বিশেষতঃ বিত্তবান নাগর সমাজে, দুর্নীতি ও ব্যভিচার প্রবেশ করছিল। ধোয়ীর 'পবনদূত' কাব্য, সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' ও বাৎস্যায়নের গ্রন্থই এ বিষয়ে পর্যাপ্ত সাক্ষ্য দেয়। কুলীন সম্প্রদায়ও এই সব দোষ হতে মুক্ত ছিলেন না এবং ব্যভিচার, ম্লেচ্ছ-সংসর্গ প্রভৃতি যে সব গুরুতর অপরাধে এককালে কুল নির্মূল হয়, কুলীন মাত্রেই সে সমস্ত দোষে দূষিত হয়েছিলেন। যে যে কুলীন বংশ একই প্রকার দোষে দূষিত দেবীবর তাদের এক সম্প্রদায় বা 'মেল' ভুক্ত করেন। এবং এই ভাবে পৃথক পৃথক দোষ অনুসারে সে যুগের কুলীনেরা মোট ছত্রিশটি মেলে বিভক্ত হয়ে যান। পূর্বে কুলীনেরা নিজেদের মধ্যে অবাধে বৈবাহিক আদান প্রদান করতে পারতেন, কিন্তু দেবীবরের বিধি অনুসারে মেলের বাহিরে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন একেবারে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কুলীন কন্যাদের বিবাহ এর ফলে এক বিরাট সামাজিক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। দেবীবরের প্রচলিত বহু 'মেল' বা সম্প্রদায় কালক্রমে সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে, অথচ তাঁর নিয়ম অনুসারে এক 'মেলের' কুলীন কন্যার সঙ্গে অপর মেলের কুলীন পাত্রের বিবাহ নিষিদ্ধ থেকে যায়। অন্যদিকে আবার শ্রোত্রিয় এবং বংশজ সম্প্রদায়ের পিতারা কুলীন পাত্রে কন্যা সমর্পন করে সামাজিক মর্যাদা লাভের চেষ্টা করতে থাকেন। কুলীন পাত্রদের জন্য সমাজে এইভাবে তীব্র প্রতিযোগিতা আরম্ভ হলে স্বাভাবিক কারণে তাদের চাহিদা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং বহু-বিবাহও প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। কাঞ্চন মূল্যের বিনিময়ে যে সব কুলীন

পাত্র শ্রোত্রিয় বা বংশজ কন্যা বিবাহ করতেন তাঁরা 'ভঙ্গকুলীন' বা 'স্বকৃতভঙ্গ' বলে পরিচিত হতেন; কিন্তু একবার এরূপ গণ্য হলে তিনি যে কোন বংশে যথেচ্ছ বিবাহ করতে পারতেন, তাতে তাঁর (এবং নিম্নতন চার পুরুষের) আর কুলক্ষয় হ'ত না। শ্রোত্রিয় বা বংশজ কন্যার পিতারা এমন ভঙ্গকুলীন পাত্রের জন্যও লালায়িত থাকতেন এবং কুলাচার্য বা ঘটকগণও নিজেদের স্বার্থের খাতিরে এ সব বিবাহে উৎসাহ দিতেন। সুতরাং বহু কুলীন সন্তানই বিবাহকে ব্যবসায় বা বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করে জন্ম সার্থক করতেন এবং এই ব্যবসায় সে যুগে নিতান্ত কম লোভনীয় ছিল না। রিজলি সাহেব তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Tribes and Castes of Bengal-এ বলছেন যে পণের অঙ্ক দু'হাজার টাকায় প্রায়ই উঠত এবং পূর্ববঙ্গে কুলীনের চাহিদা এত বেশী ছিল যে দশ বৎসর বয়স হলেই কুলীন সন্তানের বিবাহের কথা তার বন্ধুমহলে আলোচিত হ'ত ও বিশ বৎসর বয়সের পূর্বেই সেই কুলীন সন্তান বহু ভার্যা গ্রহণ করতে সমর্থ হতেন। একই দিনে একটি কুলীন সন্তান চার বা ততোধিক কন্যার পাণি-গ্রহণ করেছেন এমন দৃষ্টান্ত সে যুগে খুব বিরল ছিল না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমনও শোনা যায় যে কোন গৃহকর্তা তাঁর সমস্ত অবিবাহিতা ভগ্নী এবং কন্যাদের উপযুক্ত পাত্রের অভাবে একই কুলীন সন্তানের হস্তে সমর্পণ করেছেন। বলা বাহুল্য এরূপ ক্ষেত্রে কুলীন পাত্রেরা তাঁদের বিবাহিতা পত্নীদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন না। এই সব পত্নীদের অধিকাংশই তাঁদের পিত্রালয়ে সারা জীবন কাটাতেন এবং তাঁদের গর্ভজাত সন্তানেরাও মাতুলালয়ে পালিত হতেন,—কুলীন পিতারা সকল সময়ে তাঁদের সন্তানদের চিনতেনও না। ষোড়শোপচারে পূজা না পেলে কোনো কুলীন সন্তান বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে বড় একটা পদার্পণ করতেন না, এবং কুলীন জামাতার মনোরঞ্জনের জন্য শ্বশুরমহাশয় সব সময়েই উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকতেন। জামাতাদের অবশ্য এতে সুখের অন্ত ছিল না। 'কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব' নাটকের (১৮৫৪)

নায়ক অধর্ম্মরুচি মুখুজ্যের উক্তি সত্যই স্মরণীয়—"মহারাজাধিরাজ বল্লাল সেন আমাদিগকে যে নিষ্কর তালুক দিয়ে গেছেন তার হাজাশুকো নেই—তাতেই আমরা সুখে আছি। আমরা রাজারও রেয়েত নই, সেধেরও খাতক নই, আপনি কি কুলীন ছেলের বিষয় জানেন না?" অনেক সময় রাত্রিকালে পত্নীর সমস্ত অলঙ্কার হরণ করে কুলীন জামাতা শ্বশুরালয় ত্যাগ করেছেন এমন কাহিনীও শোনা যায়। ১৮৩১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখের 'সমাচার দর্পণে' জনৈক পত্র লেখক বল্‌ছেন—"কোন কোন স্থানে এমত ঘটিয়াছে যে কোন কোন কুলীন জামাতা আপন আপন শ্বশুর প্রভৃতির প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া রাত্রিমানে আপন আপন পত্নীর সহ শয়নে থাকিয়া সূর্য্যোদয়ের প্রাক্‌কালে আপন নিদ্রিতা পত্নীর গাত্রের সমস্ত স্বর্ণ রৌপ্যাদির আভরণ লইয়া……পলায়ন করিয়াছেন এবং আরো শুনা এবং দেখা গিয়াছে যে কোন কোন কুলীন মহাশয়েরা রাগচ্ছলে আপনার শ্বশুরের বাটী হইতে স্ব স্ব পত্নীকে আপন আপন গৃহে আনয়নপূর্ব্বক ঐ ঐ কন্যার পিতৃদত্ত স্বর্ণাভরণাদি কাড়িয়া লইয়া তাহা বিক্রয় করিয়া আপনারা মজা মারিয়াছেন।" কুলীনপাত্রে কন্যা সমর্পণ করে কলিকাতাবাসী জনৈক ধনী ব্যক্তির নিঃস্ব ও দেশত্যাগী হওয়ার সংবাদ ১৮৩১ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সমাচার দর্পণে প্রকাশিত এক পত্র হতে জানা যায়। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকে (১৮৫৪) এবং টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ (১৮৫৮) কুলীন জামাতাদের এরকম বহু অত্যাচারের কাহিনী পাওয়া যাবে। তৎকালীন সমাজচিত্র হিসাবে এই বই দুটির সাক্ষ্য নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়। ১৮৩১, ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সমাচার দর্পণের পত্রদাতা আরও জানাচ্ছেন—"কুলীন মহাশয়েরা আপন আপন স্ত্রী পুত্রদিগকে প্রতিপালন করাকে এমত কুকর্ম্ম জানেন যে তাঁহাদিগের পীড়িতাবস্থাতেও তাঁহারদিগের চিকিৎসা বিষয়ে কোন চেষ্টা করেন না এবং এতদ্রূপ চেষ্টাকে আপন কৌলীন্যের হানিকারক জানেন।" কুলীন বিবাহের আরো একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে কুল রক্ষার প্রয়োজনে পাত্র পাত্রীর বয়সের তারতম্যের

দিকে কোন লক্ষ্য রাখা হ'ত না। একদিকে যেমন মুমূর্ষু গঙ্গাযাত্রীর হস্তে কিশোরী কন্যা সমর্পণ করার বহু কাহিনী শোনা যায়, অপরদিকে তেমনি শিশুপাত্রের সহিত বিগত যৌবনা কন্যার বিবাহও নিতান্ত বিরল ছিল না। O'Malley সাহেব Jessore District Gazetteer-এ স্থানীয় কুলীনদের প্রসঙ্গে লিখেছেন—'Little boys sometimes marry aged women and vice versa." 'কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব' নাটকে সুলোচনার উক্তি এবং ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' (১৮শ শতাব্দী) 'নারীগণের পতিনিন্দা' অধ্যায়ে জনৈকা কুলীনবালার আক্ষেপ একই সঙ্গে হাস্যরস ও করুণরসের সৃষ্টি করেছে। ভারতচন্দ্র লিখেছেন—

"আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে।
যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে॥
যদি বা হইল বিয়া কতদিন বই।
বয়স বুঝিলে তার বড়দিদি হই॥"

আবার 'অন্নদামঙ্গলে'রই অন্যত্র শিশুকন্যার বৃদ্ধ কুলীনের কণ্ঠলগ্ন হওয়ার কাহিনীও পাওয়া যায়। বৃদ্ধ জামাতা শিবের দর্শনে পার্বতীমাতা মেনকার বিলাপ বাঙালীগৃহের কুলীনকন্যার জননীর মর্মভেদী শোকোচ্ছ্বাস ছাড়া আর কি? মুকুন্দরামের 'কবিকঙ্কন চণ্ডী'তেও (১৬শ শতাব্দী) দোজবরে কুলীন ধনপতি দত্তের সহিত লক্ষপতি সওদাগরের বার বৎসরের কন্যা খুল্লনার বিবাহের কথা রয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে বয়োজ্যেষ্ঠা কন্যার পাণিগ্রহণ স্মৃতিশাস্ত্রে নিষিদ্ধ হলেও কুলীন-বিবাহে এ নিয়মের লঙ্ঘনে সমাজে কোন আপত্তি শোনা যায় নি; এবং ধর্মশাস্ত্রে বয়স্কা কন্যার বিবাহ নিন্দিত হলেও স্মার্ত রঘুনন্দনের পূর্ববর্তী মেলী কুলীন শ্রীনাথ আচার্য প্রভৃতি তাঁদের গ্রন্থে ইঙ্গিতে এ ব্যবস্থা সমর্থন করে গেছেন।

কৌলীন্যপ্রথা বাংলাদেশের উচ্চশ্রেণীর হিন্দুসমাজে কতদূর ব্যাপক হয়ে উঠেছিল তা দু'একটি তালিকা দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায়। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় বহুবিবাহকারী কুলীনদের

এক তালিকা প্রকাশিত হয়। এতে সর্বসমেত ২৭জন কুলীনের ৮১৮টি বিবাহের সংবাদ পাওয়া যায়। ময়াপাড়া নিবাসী রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৬২টি বিবাহ করে এই কুলীনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বহুবিবাহ-প্রথম পুস্তকে' হুগলী জেলার কয়েকটি গ্রামের কুলীনদের একটি তালিকা দিয়েছেন। এই তালিকায় হুগলী জেলার ৭৬টি গ্রামে ১৩৩ জন কুলীনের ২১৫১ জন পত্নী ছিলেন, অর্থাৎ গড়ে প্রত্যেকের ১৬টিরও বেশী। এঁদের মধ্যে একজন, ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৫ বৎসর বয়সে ৮০টি পত্নীর স্বামী ছিলেন, সর্বকনিষ্ঠ জন ১৮ বৎসর বয়সে ১১জনের স্বামী হয়েছিলেন, এবং অপর একজন ২০ বৎসর বয়সে মাত্র ১৬ জনের পাণিগ্রহণ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বীকার করেছেন যে, যে সব কুলীনের পত্নীসংখ্যা পাঁচের কম ছিল, তিনি তাদের এই তালিকাভুক্ত করেন নি। কলকাতা হতে মাত্র ৫।৬ ক্রোশ দূরে জনাই গ্রামে ৬৪জন কুলীনের ১৮২ জন পত্নী ছিলেন। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় পূর্ববঙ্গের অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল বলে মনে হয়। পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে ১৭৭টি গ্রামে ৬৫২ জন কুলীনের ৩৫৮৮ জন পত্নী ছিলেন। এযুগের কুলীনমহাত্মাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ছিলেন বরিশালের কলসকাটি গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যিনি ৫৫ বৎসর বয়সে মাত্র ১০৭ জন কুলললনার সর্বনাশ করেছিলেন। বাংলা ১২৯৮ সালে অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের তালিকা প্রকাশিত হওয়ার প্রায় বিশ বৎসর পরে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা এবিষয়ে বহু অনুসন্ধান করে আর একটি অনুরূপ তালিকা প্রকাশ করেন। এই তালিকা হতেও কিন্তু অবস্থার বিশেষ কোনো তারতম্য দেখা যায় না। বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী, বীরভূম, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা, কলকাতা, নদীয়া, যশোর, বরিশাল ও ফরিদপুর জেলার ২৭৬টি গ্রামে ১০১৩ জন কুলীনের ৪৩২৩ জন পত্নী ছিলেন বলে জানা যায়। এঁদের মধ্যে একজন ৩৪ বৎসর বয়সে ৩৫ জনের পাণিগ্রহণ করেছিলেন, আর এক কুলীনশিশু মাত্র ৪ বৎসর বয়সেই ৩টি কন্যার স্বামী হয়েছিলেন।

এই সব বহুবিবাহকারী কুলীনদের মধ্যে অন্ততঃ দশ বার জন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন; তিনজন ছিলেন এম, এ, বি, এল, একজন বি, এ, বি, এল, এবং অপর কয়েকজন শুধু বি, এ। অবশ্য শিক্ষিতদের মধ্যে বহুবিবাহকারীর সংখ্যা কম ছিল একথা অনস্বীকার্য। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত একটি ইংরাজী পুস্তকে লেখক তাঁর পরিচিত কয়েকজন কুলীনের নাম ও বিবাহ সংখ্যা দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে, রামকান্ত নামে একজন ব্রাহ্মণ ৮৫ বৎসর বয়সের মধ্যে ৮২ বার বিবাহ করেছিলেন এবং শেষ বিবাহটি তিনি করেন মৃত্যুর মাত্র তিনমাস পূর্বে। এই ব্রাহ্মণের মৃত্যুকালে তাঁর সর্বসমেত ১৮টি পুত্র ও কন্যা ছিল। অবশ্য কৌলীন্যপ্রথা প্রচলনের পুর্বে বাংলাদেশে যে বহুবিবাহ একেবারে অজ্ঞাত ছিল এমন নয়। পাল বা সেন রাজাদের আমলেও রাজা-রাজড়া, সামন্ত-মহাসামন্ত, অভিজাত সমাজ, এমন কি সম্পন্ন ব্রাহ্মণদের মধ্যেও বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। প্রাচীন বাংলার লিপিমালার মধ্যে বহুবিবাহ ও সপত্নীবিদ্বেষের দৃষ্টান্ত সুপ্রচুর। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতেই হবে যে উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজে এমন বিকৃত ও বীভৎসভাবে বহুবিবাহ প্রচলনের জন্য কৌলীন্য প্রথাই সম্পূর্ণ দায়ী। পাদ্রী ওয়ার্ড সাহেব তাঁর "View of the History, Literature and Religion of the Hindus" গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে লিখেছেন—"Vallal's creation of the Order of Merit ended in a state of monstrous polygamy, which had no parallel in the history of human depravity. Among the Turks seraglios were confined to men of wealth. But in Bengal a Hindu Brahmin, possessing only a shred of cloth and a paita kept more than a hundred mistresses"। একগাছি পৈতার জোরে মূর্খ স্বল্পবিত্ত কুলীন ব্রাহ্মণেরা যেভাবে সহস্র সহস্র বঙ্গললনার সর্বনাশ করে গেছেন পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা সত্যই বিরল। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেও সরকারী তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত District

Gazetteerগুলিতে বর্ধমান, হুগলী, যশোর, মালদা, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় কুলীনদের বহুবিবাহের কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। হুগলী জেলা সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে কুলীন বা 'ভঙ্গ' পাত্রে কন্যা সমর্পণ করার জন্য পিতামাতারা এখনো খুব উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকেন, যদিও বংশমর্যাদা ছাড়াও পাত্রের শিক্ষাদীক্ষা, আর্থিক সঙ্গতি প্রভৃতির দিকেও আজকাল লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। উপযুক্ত কুলীন পাত্রদের জন্য যে পিতা বহু কন্যার জনক তাঁর খুবই অসুবিধা হয়েছে। তবে পাত্রের অভাবের ফলে সমাজের একদিক হতে মঙ্গল হয়েছে, কারণ বাল্যবিবাহ প্রথা ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে। আর শিক্ষিত কুলীনদের মধ্যে যাঁরা সহরে বসবাস করছেন তাঁরা মেল সংক্রান্ত বিধিনিষেধ আগের মত মানছেন না। ময়মনসিংহ জেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব অপেক্ষা পশ্চিম দিকেই কৌলীন্য প্রথার প্রভাব ছিল অনেক বেশী, এবং পশ্চিম অঞ্চলের ব্রাহ্মণেরাই সমাজে বেশী মর্যাদা পেতেন। ময়মনসিংহে একটি প্রচলিত প্রবাদই ছিল—'পশ্চিমে বল্লালি, পূর্বে মসনদ আলি'। যশোর জেলায় লক্ষ্মীপাশা, কামালপুর প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামে কুলীনদের প্রধান ঘাঁটি বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যদিও কুলীনদের মধ্যে বহুবিবাহ ক্রমশঃই কমে যাচ্ছে একথাও লেখক স্বীকার করেছেন। অনেক অকুলীন পিতা কুলীন পাত্রে কন্যা সমর্পণ করার জন্য প্রচুর পণ দিতে প্রস্তুত এরকম মন্তব্যও করা হয়েছে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁর 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' গ্রন্থে (২য় সংস্করণ—১৩১৮) আক্ষেপ করেছেন যে পশ্চিম-বঙ্গে কৌলীন্য প্রথার বিষদাঁত ভেঙ্গে যাওয়া সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গে এর প্রতাপ বিশেষ হ্রাস পায়নি। তিনি লিখেছেন—"এখনো যশোর জেলায় কাশীপুর, লক্ষ্মীপাশায়, ঢাকা জেলায় বিক্রমপুর অঞ্চলে, বাখরগঞ্জে কলসকাঠীতে, এবং ফরিদপুর জেলায় খালিয়া, আমগ্রাম, কালামৃধা প্রভৃতি স্থানে গঙ্গোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় বা চট্টোপাধ্যায় গোষ্ঠীর মধ্যে এক এক জনের পঞ্চাশ ষাটটি পর্যন্ত বিবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। এখনো এখানে দেখিতে পাওয়া যায় যে "একরাত্রির মধ্যে চারি মাস হইতে

সপ্ততিবর্ষ বয়স্কা (পাড়ার সমস্ত সমমেলের) কন্যা শ্বেতকেশ লোলচর্ম্মা এক বৃদ্ধের করে অর্পিত হইতেছে; অথবা এক সাতবর্ষ বয়স্ক বালকের স্কন্ধে ত্রিশ বর্ষ হইতে ষাট বর্ষ পর্যন্ত বয়সের আট নয়টি সহধর্মিনী চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে।"

কৌলীন্যপ্রথা ও তার আনুষঙ্গিক বহু বিবাহ বাঙালী হিন্দু সমাজের যে কতদূর ক্ষতি করেছিল তা অনুমান করা বিশেষ কঠিন নয়। প্রথমতঃ, এর ফলে কুলীন পাত্রদের সুখসুবিধা যথেষ্ট বেড়ে গেলেও কুলীন কন্যাদের সুপাত্রে অর্পণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। কুলীন পাত্রেরা অর্থলোভে শ্রোত্রিয়, বংশজ প্রভৃতিদের কন্যা বিবাহ করতেন, তাতে তাঁদের কুলক্ষয় হত না। কিন্তু করণীয় ঘরে (অর্থাৎ সমমেলের মধ্যে) কুলীন পাত্র পাওয়া না গেলে কুলীনকন্যাদের বিবাহ দেওয়া কিছুতেই চলত না। এমন কি স্বসম্প্রদায়ের মধ্যেও নিম্ন মেলে কন্যার বিবাহ দিলে কুলীন পিতার সামাজিক মর্যাদা হানি ঘটত। অথচ স্বজাতীয়া কন্যাদের কুলরক্ষা করা কুলীন পাত্রেরা কখনই তাঁদের কর্তব্য বলে মনে করতেন না। 'সমাচার দর্পণে' জনৈক পত্রলেখক লিখেছেন (৪ঠা জুলাই, ১৮৩৫) "মেলবন্ধ থাকাতে অনেক কুলীনকন্যা জন্মাবচ্ছিন্ন অদত্তাই থাকিলেন"; আর একজন পত্রলেখিকা নিজের পরিচয় দিচ্ছেন এইভাবে— "আমরা প্রৌঢ়া পতিহীনা, দীনা, ক্ষীণা এবং অবিবাহিতা কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা" (১৪ই মার্চ, ১৮৩৫)। বাস্তবিকই কুলীনকন্যাদের অনেককেই বহুবৎসর পর্যন্ত অবিবাহিতা থাকতে হ'ত, কারো কারো সারা জন্মে পাত্রই মিলত না। যে সব কুলীনকন্যাদের পাত্রাভাবে আজীবন কুমারী থাকতে হ'ত তাদের বলা হত "ঠেকা মেয়ে"। নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখেছেন—"যশোরের অন্তর্গত কাশীপুর, লক্ষ্মীপাশা প্রভৃতি গ্রামে এরূপ 'ঠেকা মেয়ে' অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।" O'Malley সাহেবের Jessore District Gazetteer-এও এই সংবাদ সমর্থিত হয়েছে। রিজ্‌লি সাহেব তাঁর গ্রন্থে পূর্ববঙ্গে প্রচলিত একটি অদ্ভুত প্রথার কথা উল্লেখ করেছেন; পূর্ববঙ্গে

কুলীন পিতারা অনেক সময়ে অর্থাভাবে সৎপাত্র না পেলে কুলরক্ষার জন্ম কন্যার এক কুশমূর্তি নির্মাণ করে কোনো কুলীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে ঐ কুশমূর্ত্তির প্রতীক-বিবাহ দিতেন এবং এই কাল্পনিক বিবাহের পর কুলীন ব্রাহ্মণটির সঙ্গে শ্বশুরালয়ের কোনো সংশ্রব না থাকলেও কুলীন কন্যা সিঁথিতে সিন্দুর ধারণ করতে পারতেন। অথবা কন্যার পিতা শুধু ঘটকের উপস্থিতিতে কোনো কুলীনপাত্রকে বলতেন, "আমার কন্যা থাকলে আপনার হাতেই তাকে সমর্পণ করতাম", এবং এই মৌখিক প্রতিশ্রুতিতেই তাঁর কন্যার বিবাহ হয়ে যেত! উত্তর বঙ্গের বারেন্দ্র কুলীনদের মধ্যেও সম্ভবতঃ এই প্রথা প্রচলিত ছিল। যাই হোক, এই সব অবিবাহিতা কুলীনকন্যাদের এবং যে সব বিবাহিতা কুলীনকন্যা আজীবন পিত্রালয়ে বাস করতেন তাঁদেরও সমস্ত জীবন ধরে প্রচুর লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করতে হ'ত, বিশেষতঃ পিতার মৃত্যুর পর। 'সমাচার দর্পণে' ১৮৪০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রকাশিত একটি পত্রে কয়েকজন কুলীন কন্যা ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ এবং ভ্রাতুষ্পুত্রদের কাছে নিজেদের লাঞ্ছণা যন্ত্রণা ভোগের কাহিনী বর্ণনা করে পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যাদের উত্তরাধিকার দাবী করেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বহুবিবাহ—প্রথম পুস্তকে'ও এই লাঞ্ছনা ও অপমানের করুণ কাহিনী দু' একটি পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ, কৌলীন্যপ্রথার কল্যাণে পণপ্রথাও উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজে দৃঢ়মূল হয়ে বসে। সামাজিক মর্যাদা লাভের আশায় শ্রোত্রিয় ও বংশজ পিতারা কিভাবে প্রচুর পণ দিয়ে কুলীন জামাতা সংগ্রহের চেষ্টা করতেন সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে এবং সংবাদপত্রে সে বিষয়ে প্রচুর কাহিনী পাওয়া যায়। এ বিষয়ে District Gazetteer গুলির সাক্ষ্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৬৭ সালে, বাংলার ছোটলাট স্যার সিসিল বীডন বহুবিবাহ বিষয়ে যে তদন্ত সমিতি নিয়োগ করেছিলেন তার রিপোর্ট প্রকাশিত হয় 'India Gazette' নামক সরকারী কাগজে। এই বিবরণীর একস্থানে বলা হয়েছে—"Families, it is said, are ruined in order to provide

the large sums requisite to give a consideration on the occasion of their marriages ... Marriages, it is said, are contracted simply in order to obtain this consideration, and the husbands do not care to inquire what becomes of their wives." আর একস্থানে সমিতির সদস্যরা মন্তব্য করছেন "Polygamy is said to be resorted to as a sole means of livelihood by many Bhongho Koolins." কুলীন পিতারা যদিও সাধারণতঃ তাঁদের পুত্রকন্যাদের বিশেষ সন্ধান রাখতেন না, তবুও পুত্র বিবাহের উপযুক্ত হয়েছে শুনলে তাঁরা শ্বশুরালয়ে এসে পুত্রকে নিয়ে যেতেন এবং সঙ্গতিপন্ন বংশজ পরিবারে তার বিবাহ দিয়ে প্রচুর পণ লাভ করতেন। অবশ্য পুত্রও বেশীদিন পিতাকে এই লাভজনক ব্যবসায়ের সুযোগ দিতেন না, কিছু দিনের মধ্যেই তিনি আপন ইচ্ছামত বিবাহের ব্যবস্থা করতেন। এই পণপ্রথার দৌরাত্ম্যেই বহু দরিদ্র পরিবারের কুলীন কন্যার সারাজীবন সৎপাত্র মিলত না, অথবা বিবাহ হলেও স্বামীগৃহে বাস করার সৌভাগ্য হত না। অথচ অকুলীন সম্প্রদায়ের মধ্যে পণপ্রথা কোনো দিনই এমন মারাত্মক বা বাধ্যতামূলক হয়ে ওঠেনি এবং নিম্নজাতির লোকেদের মধ্যে এই সময়ে পাত্রপক্ষকেই কিছু অর্থব্যয় করে কন্যা সংগ্রহ করতে হ'ত।

তৃতীয়তঃ, কৌলীন্যপ্রথার ফলে একদিকে যেমন কুলীন কন্যাদের বিবাহ দেওয়া প্রায় দুঃসাধ্য হয়েছিল, তেমনই অপরদিকে শ্রোত্রিয় ও বংশজ পাত্রদের অবস্থাও শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। কুলীনকন্যাদের সঙ্গে ত' বংশজ বা শ্রোত্রিয় পাত্রের বিবাহ হ'তই না, উপরন্তু তাঁদের স্বজাতীয়া কন্যার পিতারাও প্রচুর পণের বিনিময়ে কুলীন জামাতা সংগ্রহ করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন। সুতরাং শ্রোত্রিয় ও বংশজ পাত্রদের পণ দিয়ে পাত্রী সংগ্রহ করতে হ'ত এবং পণের অভাবে অনেক পাত্রের বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত বিবাহই হত না। ১৮৩১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে 'সমাচার দর্পণে' জনৈক পত্রলেখক লিখছেন—"কত শত যোত্রহীন শ্রোত্রিয় এবং বংশজ ব্রাহ্মণ বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত অবিবাহিত

থাকিয়া পঞ্চত্ব পাইয়াছেন এবং এইক্ষণেও অনেকে ৩০, ৪০, ৫০ বা ততোধিক বৎসর বয়স্ক হইয়া অবিবাহরূপ শোকে জরজর…হইয়া রহিয়াছেন তাঁহারদিগের এ কাটামোতে আইবড় নাম ঘুচে কিনা বলা যায় না। কিন্তু তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকেরি ঘরে এই রীতি আছে যে তাঁহারদিগের ঘরের কন্যাসন্তানদিগের বিবাহ কুলীন ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহারো সহিত দেন নাই।" শ্রোত্রিয় ও বংশজদের পাত্রী সংগ্রহের জন্য একদল ব্যবসায়ী বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান হতে নিম্নশ্রেণীর (এমনকি মুসলমান পরিবারের) বালিকা কিনে এনে তাদের ব্রাহ্মণ কন্যা বলে পরিচয় দিয়ে মূল্যবিনিময়ে বিবাহ দিত। নৌকা করে আনা হত বলে এদের "ভরার মেয়ে" নাম দেওয়া হয়েছিল। ১৮৩৭ সালের ১৭ই জুন তারিখের 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় বর্ধমানে জনৈক বংশজ ব্রাহ্মণের ৪০০ টাকা মূল্য দিয়ে যবনীকন্যা ক্রয় ও বিবাহ এবং পরে পত্নীর বংশপরিচয় অবগত হয়ে তাকে পরিত্যাগ করার কাহিনী পাওয়া যায়। ঘটকদের প্রতারণায় কাজলাপাড়ায় দুই ব্রাহ্মণের মালাকার কন্যা বিবাহ এবং ভাটপাড়াতে এক ব্রাহ্মণের পোদজাতীয়া বৈষ্ণবকন্যা বিবাহের কাহিনীও ঐ প্রসঙ্গেই উল্লিখিত হয়েছে। 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার পত্র লেখক সব শেষে বলছেন,—"এতভিন্ন কলিকাতা শহরের মধ্যে এইরূপ স্ত্রী অনেক আছে আমি সাহসপূর্বক বলিতে পারি ভারি ভারি পণ্ডিত ন্যায়রত্নের … ঘরে যে তাঁহারদিগের পুত্র পৌত্রাদির গৃহিণী সকল আছেন তাহারদিগের মধ্যে অনেকেই ধোপা, নাপিত, বৈষ্ণব, মালি, কামার, কপালির কন্যা কিন্তু সম্পত্তিশালী ব্রাহ্মণের ঘরে পড়িয়া পবিত্রা ব্রাহ্মণী হইয়া গিয়াছেন, এখন, তাঁহারদিগের পাকান্ন সকলেই পবিত্র জ্ঞান করেন।"

পাদ্রী ওয়ার্ড সাহেবও তাঁর গ্রন্থে এই ব্যবসায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। কুলীন পাত্রের পিতার মত শ্রোত্রিয় কন্যার পিতাও অবশ্য অনেক সময়ে প্রচুর পণের বিনিময়ে শ্রোত্রিয় জামাতার হস্তেই কন্যা সম্প্রদান করতেন। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব'

নাটকে জনৈকা বংশজ গৃহিণী গর্ব করে বলেছেন,—"তবে আপনি শুনুন আমাদের বংশে সকলেই মেয়ে ব্যাচে, আমার বড় ভাসুর পাঁচটা মেয়ে বেচে কোটা করেছেন, আরো এখনো দুটো আছে।" শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদের কন্যাশুল্ক গ্রহণ বিষয়ে বাংলা সাহিত্যে দুটি নাটকও আছে,—একটি নফরচন্দ্র পালের 'কন্যা বিক্রয় নাটক' (১৮৬৩), অপরটি জনৈক "শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ" প্রণীত 'আসুরোদ্বাহ নাটক' (১৮৬৯)।

চতুর্থতঃ, কৌলীন্যপ্রথার ফলে উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজে জাতের দলাদলি অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছিল। কুলীনদের মধ্যেও উচ্চ মেলের লোকেরা নিম্ন মেলের লোকেদের অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতেন, আর কুলীন শ্রোত্রীয় বংশজের মধ্যে ত সামাজিক ক্রিয়াকর্মে যথেষ্ট প্রভেদ করা হত। শুধু ব্রাহ্মণদের মধ্যে নয়, কায়স্থদের মধ্যেও কুলীন—অকুলীনের এই পার্থক্য বিশেষ প্রকট হয়ে উঠেছিল। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' জনৈক অকুলীন কায়স্থ গৃহিণী তাঁর স্বামীর অপমানের কথা বলছেন এইভাবে—

> "মৌলিক কায়স্থ জাতি পদবীতে হোড়।
> কত কষ্টে মিলে এঁটে নাহি মেলে থোড় ॥
> বাহান্তরে কায়স্থ বলিয়া গালি আছে।
> বসিতে না পান ভাল কায়স্থের কাছে ॥"

মুকুন্দরামের 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'তেও ধনপতি দত্তের পিতৃশ্রাদ্ধে মালাচন্দন দানের ব্যাপার নিয়ে সমাগত অতিথিবৃন্দের মধ্যে বাদ-বিসংবাদের উপভোগ্য কাহিনী পাওয়া যায়। এই দলাদলির জন্যই কুলীনদের বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়াকর্ম কখনোই শান্তিতে নিষ্পন্ন হ'ত না,—কোনো না কোনো বিষয় নিয়ে গোলযোগ উপস্থিত হতই। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' দেবী অন্নপূর্ণার প্রতি ঈশ্বরী পাটনীর উক্তি—"যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কন্দল"—বাংলা সাহিত্যে বিখ্যাত হয়ে আছে।

কিন্তু জাতিগত দলাদলির চেয়েও কৌলীন্য প্রথার আরো

একটি মারাত্মক ফল হয়েছিল সমাজে ব্যাপক ব্যভিচার ও দুর্নীতির প্রবেশ। বহু কুলীন কন্যা এবং শ্রোত্রিয় ও বংশজ পুত্র অবিবাহিত থাকার জন্য এবং বিবাহিতা কুলীনকন্যাদেরও চিরজীবন পিত্রালয়ে বাস করার ফলে সমাজে বিরাট দুর্নীতি প্রবেশ করেছিল। পাদ্রী ওয়ার্ড তাঁর গ্রন্থে যে বীভৎস চিত্র অঙ্কন করেছেন তা কিছুটা অতিরঞ্জিত হলেও দুর্নীতির অস্তিত্বকে আমরা কোনোমতেই অস্বীকার করতে পারি না। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে এবং সংবাদপত্রে এই দুর্নীতির কাহিনী ভুরি ভুরি পাওয়া যায়, তাদের পুনরুল্লেখ করে লেখনী কলঙ্কিত করা নিষ্প্রয়োজন। বাংলার ছোটলাট সার সিসিল বিডনের নিয়োজিত তদন্ত সমিতির বিবরণীতে বলা হয়েছে—"The married or unmarried daughters and the wives of the koolins are said to live in the utmost misery, and it is alleged that crimes of the most heinous nature, such as, adultery, abortion, infanticide and prostitution are the common results of the system of Bhongho koolin marriages generally. The crimes that are said to result from the koolin system of marriage are said to be habitually concealed by the actors in them and by their neighbours and this so as to baffle the efforts of the police at discovery."

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বর্ধমানের মহারাজা গভর্ণর জেনারেলের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে কৌলীন্যপ্রথা রহিত করার জন্য যে আবেদন পাঠান তাতেও এই কথা খুব জোর দিয়ে বলা হয়েছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁর 'বহুবিবাহ—প্রথম পুস্তকে' সমাজের এই দুষ্টক্ষতের দিকে শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি রূঢ়ভাবে আকর্ষণ করেছেন। আশ্চর্যের বিষয়, শুধু কুলীন পত্নী বা কুলীনকন্যারা ন'ন, যে সব কুলীন ব্রাহ্মণ ৫০।৬০ বা ততোধিক বিবাহ করতেন তাঁদেরও চরিত্র স্খলনের কাহিনী এযুগে প্রচুর পাওয়া যায়। রেভারেণ্ড্ লঙ্ ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের

'Calcutta Review' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে এক শতপত্নীক কুলীন ব্রাহ্মণের ব্যভিচারের কাহিনী উল্লেখ করেছেন।

সবশেষে কৌলীন্যপ্রথার আর একটি সাংঘাতিক কুফলের দিকে আমাদের দৃষ্টি স্বভাবতই আকৃষ্ট হয়। আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে কৌলীন্যপ্রথা যে যুগে বাংলা দেশে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিল সেটা ছিল সতীদাহের যুগ এবং এই সতীদাহ উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যেই বেশী প্রচলিত ছিল। তার ফলে বহু কুলীনকন্যা কোনদিন স্বামী গৃহে বাস করার সুযোগ না পেলেও স্বামীর মৃত্যুর পর সহমৃতা হতে বাধ্য হ'তেন। ১৮৪৬ সালের 'Calcutta Review' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে রেভারেণ্ড্ লঙ্ লিখেছেন,—"A Kulin of Shantipur Chandra Bandyopadhyay was killed here 30 years ago; he was married to 100 wives ......eight of his wives performed suttee on his funeral pyre." হুগলী এবং নদীয়া জেলায় কোনো কোনো কুলীন ব্রাহ্মণের মৃত্যুর পর তাঁদের দুই বা তিন পত্নীর একত্র সহমরণের কাহিনী ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের সদর নিজামত আদালতের কাগজপত্র থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু পাদ্রী ওয়ার্ড সাহেব তাঁর গ্রন্থে যে সব বীভৎস সতীদাহের কাহিনী উল্লেখ করেছেন তার সত্যই কোনো তুলনা নেই। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়ার কাছে বাগনাপাড়া গ্রামে অনন্তরাম নামে এক কুলীন ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয়। শবদাহ হয়ে যাবার পর তিনদিন ধরে অবিরাম চিতাগ্নি জ্বালিয়ে রাখা হয় এবং এই তিনদিনে তাঁর শতাধিক পত্নীর মধ্যে ৩৭ জন সহমরণে যান। এই সতীদের মধ্যে জ্যেষ্ঠার বয়স ছিল ৪০ এবং কনিষ্ঠার মাত্র ১৬। ৩৭ জন পত্নীর মধ্যে মাত্র ৩ জন তাঁর সঙ্গে বসবাস করতেন, অপর ৩৪ জন তাঁকে জীবনে খুব কমই দেখেছিলেন। ১৮১২ সালে চুণাখালিতে এক কুলীন ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয়। তিনি সর্বসমেত ২৫টি বিবাহ করেছিলেন; তার মধ্যে ১৩ জন পত্নী তাঁর জীবদ্দশাতেই মারা যান, আর অপর ১২ জন তাঁর সঙ্গে সহমৃতা হ'ন। এর ফলে ৩০টি শিশু সহসা অনাথ হয়ে পড়ে। ওয়ার্ড সাহেবের গ্রন্থে

এরূপ দৃষ্টান্ত আরো অনেক পাওয়া যাবে। যাঁরা স্বামীর সহমৃতা হতেন না, সেই সব বিধবা কুলীন পত্নীদের অবশিষ্ট জীবন যে অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে কাটত তা বলাই বাহুল্য।

কৌলীন্যপ্রথার যে সব শোচনীয় কুফলের কথা উপরে আলোচনা করা হ'ল সেগুলি উনবিংশ শতকের বাঙালী চিন্তানায়ক ও সমাজ সংস্কারকদের অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, এবং ঐ শতাব্দীর শেষার্ধেই বাংলাদেশে কৌলীন্যপ্রথা উঠিয়ে দেবার জন্য এক ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন দেখা গিয়েছিল। উনবিংশ শতকের অধিকাংশ সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মতই এই বহুবিবাহ-নিরোধ আন্দোলনের মূল উৎস বা প্রেরণা ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। ১৮২২ সালে রাজা রামমোহন "Brief Remarks Regarding Modern Encroachments on The Ancient Rights of Females" নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন। কৌলীন্যপ্রথার ফলে সমাজে ব্যাপক দুর্নীতি প্রবেশের কথা উল্লেখ করে রামমোহন বলেন যে ভারতে ইংরাজশাসিত অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলাদেশে নারীদের মধ্যে আত্মহত্যার হার প্রায় দশগুণ বেশী এবং এর প্রধান কারণ হচ্ছে কুলীন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহ ও পত্নীদের ভরণপোষণের ভার গ্রহণে অনিচ্ছা। হিন্দুশাস্ত্রে যে কুলীন ব্রাহ্মণদের যথেচ্ছ পত্নী গ্রহণ অথবা শ্রোত্রিয়-বংশজদের কন্যা-বিক্রয়ের কোনো সমর্থন নেই তাও রামমোহন দেখিয়ে দেন (যা বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর অনেক পরে করেছিলেন)। রামমোহন বহুবিবাহ, সতীদাহ প্রভৃতি সামাজিক অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য স্ত্রীলোকের পিতার ও স্বামীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার দাবী করেন, যে দাবী তাঁর মৃত্যুর একশত বৎসর পরেও স্বীকৃত হয়নি। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন কলকাতায় যে আত্মীয়সভা স্থাপন করেছিলেন তার অধিবেশনগুলিতেও জাতিভেদ, বালবৈধব্য, বহু বিবাহ, সতীদাহ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে খোলাখুলিভাবে আলোচনা হ'ত। ওয়ার্ড সাহেব লিখেছেন যে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দেই উচ্চবর্ণের হিন্দুনেতারা কৌলীন্যপ্রথা দমনের জন্য ইংরাজ সরকারের কাছে আবেদন করবার চেষ্টা করেছিলেন, যদিও সে

চেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফল হয় নি। উনবিংশ শতকের তৃতীয়, চতুর্থ দশকেও বাংলা সংবাদপত্রগুলিতে এবিষয় নিয়ে অনেক আলোচনা, আন্দোলন হয়েছিল। বিশেষতঃ 'সমাচার দর্পণ', 'জ্ঞানান্বেষণ', 'সংবাদ সুধাকর' প্রভৃতি পত্রিকায় কৌলীন্য বিরোধী বহু রচনা এ সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৩৫ সালের ১৪ই মার্চ 'সমাচার দর্পণে' শান্তিপুর নিবাসী কয়েকজন মহিলা কুলীনকন্যাদের সমমেল পাত্র না হলে বিবাহ হয় না বলে এক করুণ পত্র প্রকাশ করেন। তাঁদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করে "চুঁচুড়ানিবাসী স্ত্রীগণস্য"-স্বাক্ষরিত এক পত্র 'সমাচার দর্পনের' ২১শে মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ নিরোধ, পণপ্রথার উচ্ছেদ, এবং স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য এই পত্রে আবেদন জানান হয়। খুব সম্ভব পত্রটি কোনো মহিলার রচনা নয়, এর পশ্চাতে কোনো রামমোহন-শিষ্যের অনুপ্রেরণা ছিল বলেই মনে হয়। ১৮৩৫ এর ৪ঠা জুলাই 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত আর একটি পত্রে বারেন্দ্র শ্রেণীর মত রাঢ়ী শ্রেণীর মধ্যেও যাতে মেলবন্ধন উঠে যায় এবং কুলীনদের মধ্যে পরস্পর কন্যা আদান-প্রদানে কোনো অর্থব্যয় না হয় তার জন্য অনুরোধ জানান হয়। ১৮৩৭ সালের ৪ঠা মার্চ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' পাবনা জেলার জনৈক দর্পণ পাঠক লেখেন—"ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইংলণ্ডাধিপতি রাঢ়ীয় শ্রেণী কুলীন্ ব্রাহ্মণদের প্রতি কোন নিয়ম না করাতে লক্ষ ২ সধবা থাকিয়াও বৈধব্যাচরণ…হইতেছে। যদি ধর্ম্মাবতার শ্রীল শ্রীযুক্ত লর্ড অকল্যাণ্ড গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর কৃপাবলোকন পূর্ব্বক কোনো নূতন চার্টার করেন তবে ভূরি ভূরি স্ত্রীলোকের জাতি ও ধর্ম্মরক্ষা পাইয়া তাঁহার পুত্রপৌত্রাদিদিগের আশীর্বাদে নিযুক্ত থাকেন। বিশেষতঃ প্রজার পাপ যথাশাস্ত্র রাজার হইতে পারে। এবং এই বিষয়ের নিমিত্ত ৺রামমোহন রায়ের একান্ত মানস ছিল তাঁহার ইউরোপ গমনেতে নিতান্ত ভরসা ছিল যে এ সকল বিষয় শ্রীল শ্রীযুক্ত বাদশাহের হুজুরে প্রস্তাব করিবেন। কিন্তু এদেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ শীঘ্র তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলেন" ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখের 'সমাচার দর্পণে" প্রকাশিত এক পত্রে ভ্রাতৃগৃহে কুলীন কন্যাদের লাঞ্ছনার কাহিনী বিবৃত

করে লেখিকা পিতৃসম্পত্তিতে কন্যাদের উত্তরাধিকার দাবী করেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে কাশীপুরের কিশোরীচাঁদ মিত্রের বাড়ীতে 'সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদ্ সমিতি' বলে একটি সভা স্থাপিত হয়। সভায় কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রস্তাব করেন এবং অক্ষয়কুমার দত্ত সমর্থন করেন যে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তন, বিধবা পুনর্বিবাহ প্রচলন, বাল্য-বিবাহ বর্জন, ও বহু বিবাহ নিরোধের ব্যাপারে সমিতির সভ্যরা সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সাহায্য করবেন। ১৮৫৫-৫৬ সালে বহু বিবাহ নিরোধ আন্দোলন বাংলাদেশে ক্রমশঃ প্রবল আকার ধারণ করে। ১৮৫৫ সালে বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্রের উদ্‌যোগে সুহৃদ সমিতির পক্ষ হতে গভর্ণর জেনারেলের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে বহু বিবাহ নিরোধের জন্য একটি আবেদনপত্র পাঠান হয়। বর্ধমানের মহারাজাও এই সময়ে (ডিসেম্বর, ১৮৫৫) ব্যক্তিগতভাবে তাঁর একটি আবেদনপত্র গভর্ণর জেনারেলের দরবারে পেশ করেন। বরিশাল ও ফরিদপুরের অধিবাসীদের পক্ষ থেকেও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে একটি আবেদনপত্র পাঠান হয়। (সেপ্টেম্বর, ১৮৫৫) বিপক্ষদলও অবশ্য একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে ছিলেন না। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকেই কলকাতা মহানগরীর ১৬০০ অধিবাসীর স্বাক্ষর সম্বলিত একটি আবেদনপত্র লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে উপস্থিত করা হয় এবং বহুবিবাহের মত শাস্ত্রসম্মত কাজ বন্ধ করা হলে যে হিন্দু-ধর্ম লোপ পাবে এমন কথাও এ আবেদনপত্রে বলা হয়। ১৮৫৬ সালের জুন মাস থেকে বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বহু বিশিষ্ট ও অবিশিষ্ট নাগরিকের স্বাক্ষর সম্বলিত বহুবিবাহ বিরোধী আবেদনপত্র গভর্ণর জেনারেলের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে আসতে থাকে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা সত্যশরণ ঘোষাল, উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কাশিমবাজারের রাণী স্বর্ণময়ী এবং বর্ধমান, নদীয়া, কৃষ্ণনগর, নাটোর ও দিনাজপুরের রাজারা ছিলেন। ঢাকার জমিদার বাবু রামমোহন রায় যে আবেদনপত্রটি পাঠিয়েছিলেন তাতে অনেক অধ্যাপক ও চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতের স্বাক্ষর ছিল। ভাটপাড়ার পণ্ডিতেরাও বহুবিবাহ রহিত করা হোক এই মর্মে একটি

আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে কলকাতার কয়েকটি কুলীন পরিবারের কর্তারাও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে দুটি আবেদনপত্র লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে পাঠিয়েছিলেন। কলকাতার বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী অফিসের উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্মচারীদের পক্ষ থেকেও একটি আবেদনপত্র এসেছিল। বরিশা, বারাসাত, সালকিয়া, শেওড়াফুলি, হুগলী, চন্দননগর, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, নদীয়া, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, রঙপুর, পাবনা, ঢাকা, যশোর, মেদিনীপুর,—বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত অঞ্চল থেকেই বহুবিবাহ বিরোধী আবেদনপত্র পেশ করা হয়। বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলন বাংলা দেশে এই সময়ে কত প্রবল ও ব্যাপক হয়ে উঠেছিল তা উপরের তালিকা হতেই বোঝা যায়। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে প্রায় ২৫,০০০ হাজার লোকের স্বাক্ষর সম্বলিত ১১৬টি আবেদন পত্র লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে পাঠান হয় এবং লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে এদের মধ্যে একটি আবেদন পত্রও বহুবিবাহের স্বপক্ষে ছিল না। ১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে রামমোহন-পুত্র রমাপ্রসাদ রায় রামমোহনের লেখা "Modern Encroachments on The Ancient Rights of Females" পুস্তকখানি দ্বিতীয়বার মুদ্রিত করেন, যাতে দেশবাসী এবিষয়ে তাঁর পিতার মতামত ভালভাবে জানতে পারেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে রমাপ্রসাদ ব্যবস্থাপক সভা থেকে আইন প্রণয়ন করে বহুবিবাহ নিরোধের চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁর এই চেষ্টা সফল হয় নি। বহুবিবাহ নিরোধের এই প্রথম সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা দুটি কারণে ব্যর্থ হয়ে যায়। প্রথমতঃ, এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ আন্দোলনও খুব তীব্র হয়ে উঠেছিল, যার ফলে সরকার থেকে আইন প্রণয়ন করে বিধবাবিবাহকে রাজকীয় স্বীকৃতি দেওয়া হয় (Act XV of 1856)। কিন্তু বিদেশী রাজশক্তি একই সময়ে দুটি বড় সংস্কারকার্যে অগ্রসর হতে চাননি, তাই বহুবিবাহ নিরোধের প্রস্তাব তাঁরা আপাততঃ স্থগিত রাখেন। দ্বিতীয়তঃ, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে সিপাহী বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং সামাজিক ব্যাপারে

সরকারের অতিরিক্ত হস্তক্ষেপকে এই বিদ্রোহের একটি প্রধান কারণ বলে প্রচার করা হয়। সেজন্যও ইংরাজ সরকার আর সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে বিশেষ উৎসাহ দিতে চাননি। এইভাবে বিধবাবিবাহ আন্দোলন ও সিপাহী বিদ্রোহের চাপে পড়ে বহুবিবাহ নিবারণের প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

সিপাহী বিদ্রোহের অবসানের কিছুকাল পরে বহুবিবাহ নিরোধ আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হয়। এবারে এ বিষয়ে প্রথম অগ্রণী হ'ন কাশীর রাজা দেবনারায়ণ সিংহ। সিংহ মহাশয় নিজে গভর্ণর জেনারেলের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন এবং কাউন্সিলে তিনি এ বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করবেন বলে স্থির করেছিলেন; কিন্তু প্রস্তাব উত্থাপনের সুযোগ আসার আগেই তাঁর সদস্যপদের নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যায়, সুতরাং শেষ পর্যন্ত প্রস্তাব আর উত্থাপন করা হয় নি। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে আবার বহুবিবাহ নিবারণের জন্য সংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করা হয়। ঐ বৎসর ১৯শে মার্চ তারিখে বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে বাংলার ছোটলাট স্যার সিসিল বীডনের কাছে প্রায় ২১০০০ হাজার লোকের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি আবেদন পত্র দ্বিতীয় বারের জন্য পেশ করা হয়। এই আবেদন পত্রে যাঁরা স্বাক্ষর করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বর্ধমান ও নদীয়ার মহারাজা, ভূকৈলাসের রাজা সত্যশরণ ঘোষাল, উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শম্ভূনাথ পণ্ডিত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক, দ্বারকানাথ মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্রসন্ন সর্ব্বাধিকারী, প্যারীচরণ সরকার, শ্যামাচরণ সরকার ও কৃষ্ণদাস পালের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সার সিসিল বীডন আবেদনকারীদের বলেছিলেন,—১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ না হ'লে সার জন গ্রাণ্টই এ কাজ সম্পন্ন করে যেতেন। আমি সে সময়েও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম, এখনও করব। ভারত সরকারের কাছেও Indian Councils Act-এর ৪৩ ধারা অনুসারে বাংলা দেশের ব্যবস্থাপক সভায় বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র বাদে সাধারণভাবে বহুবিবাহ রহিত করার জন্য আইন উত্থাপন করার অনুমতি

চাওয়া হয়। ভারত সরকার কিন্তু বাঙালী হিন্দুদের মনোভাব আইন প্রণয়নের সম্পূর্ণ অনুকূল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র বাদে বহুবিবাহ রহিত করলে ঐ বিশেষ ক্ষেত্রগুলিতে বহুবিবাহ আইন-সঙ্গত বলে ঘোষণা করা হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। সুতরাং এ বিষয়ে অবিলম্বে কোনো আইন প্রণয়ন না করে আরো অনুসন্ধান চালাবার জন্য বাংলার ছোট লাটকে আদেশ দেওয়া হয়। এই নির্দেশ অনুসারে সাতজন ইংরেজ ও দেশীয় সদস্যকে নিয়ে একটি তদন্ত সমিতি গঠন করা হয়; এর মধ্যে ছিলেন সি. পি. হব্‌হাউস, এইচ. টি. প্রিন্সেপ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সত্যশরণ ঘোষাল, রমানাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও দিগম্বর মিত্র। ১৮৬৭ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সমিতি তাঁদের তদন্তের ফলাফল সরকারের কাছে পেশ করেন এবং ঐ বৎসর ৩০শে মার্চ তারিখে 'ইণ্ডিয়া গেজেটের' সাপ্লিমেণ্টারি সংখ্যায় এই বিবরণ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। কৌলীন্য প্রথার বিভিন্ন কুফলের কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে সমিতি মন্তব্য করেন যে বহুবিবাহ বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রে যে সব নির্দেশ আছে শুধু সেইগুলিকে আইন বলে ঘোষণা করলে সমাজের মঙ্গল হবে না, কারণ হিন্দুশাস্ত্রে একদিকে যেমন অকারণ বহুপত্নী গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তেমনি অপরদিকে এমন সব তুচ্ছ কারণে পত্ন্যন্তর গ্রহণের নির্দেশ আছে যা ব্রিটিশ আইনের দৃষ্টিতে একেবারেই সমর্থনযোগ্য নয় (যেমন, হিন্দুশাস্ত্রে আছে যে পত্নী প্রতিকূলা বা অপ্রিয়ভাষিণী হলে অথবা স্বামীর অর্থ অপচয় করলে তার জন্য তাকে ত্যাগ করা চলবে। মনু ৯।৮০, ৯।৮১)। সুতরাং বিবাহ-বিষয়ক নির্দেশগুলি লঙ্ঘন না করে, অথচ কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে বহুবিবাহকে আইনের স্বীকৃতি না দিয়ে কুলীনদের বহুবিবাহ সরকারী-ভাবে নিষিদ্ধ করা সম্ভবপর নয় বলে সমিতি রায় দেন। রমানাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও দিগম্বর মিত্র তাঁদের স্বতন্ত্র বিবরণীতে বলেন যে কুলীনদের মধ্যে বহুবিবাহ অনেক কমে গেছে এবং ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আরো কমে যেতে বাধ্য। অতএব এ বিষয়ে রাজ-

শক্তির হস্তক্ষেপের কোনো প্রয়োজন নেই, তাতে বরং হিতে বিপরীত হতে পারে। তাছাড়া যে সব সামাজিক অনাচারকে কৌলীন্যপ্রথার ফল বলে বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলি সব কৌলীন্যপ্রথা থেকে আসে নি। লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, যিনি ১৮৫৬ ও ১৮৬৬ সালের দুটি আবেদনপত্রেই স্বাক্ষর করেছিলেন, তিনিও ১৮৬৭ সালের মধ্যে তাঁর মত পরিবর্তন করে রক্ষণশীল দলে প্রবেশ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কিন্তু তাঁর স্বতন্ত্র বিবরণীতে মন্তব্য করেন যে বহুবিবাহ এত কমে যায় নি যাতে এ বিষয়ে সরকারী হস্তক্ষেপ নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করা যায়। এ বিষয়ে শুধু হিন্দুশাস্ত্রের নির্দেশগুলিকেই আইনের মর্যাদা দিলে ইপ্সিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। এই অবস্থায় সার সিসিল বীডন কৌলীন্যপ্রথা বিষয়ে কোনো আইন প্রণয়ন করা সম্ভবপর নয় বলে ঘোষণা করেন, যদিও হিন্দু বিবাহ সংক্রান্ত আইনের মারাত্মক ত্রুটিগুলি সংশোধনের জন্য কোনো না কোনো সময়ে সরকারী হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হবে বলে তিনি মনে করেন। কুলীন ব্রাহ্মণেরা পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এসে আপনা হতে বহুবিবাহ ত্যাগ করবে এ মত সার সিসিল বীডন গ্রহণ করেন নি। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার ভারত বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীও ভারত সরকারের কাছে আইনের সাহায্যে বহুবিবাহ রহিত করার বিরুদ্ধে নির্দেশ পাঠান। ফলে আইনের সাহায্যে কৌলীন্যপ্রথা উচ্ছেদের প্রচেষ্টার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়।

এই ব্যর্থতার পরও কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় আন্দোলন হতে সম্পূর্ণ নিরস্ত হন নি। পূর্ববঙ্গের তারপাশানিবাসী রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় তিনি পূর্ণোদ্যমে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন। রাসবিহারী বাবু নিজে কুলীন ও বহুদার হলেও মনে প্রাণে এই আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন এবং তিনি গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে প্রচার কার্য চালাতে থাকেন। বিদ্যাসাগরকে সাহায্য করার জন্য রাসবিহারী বাবু "বল্লালি সংশোধনী" (১৮৬৮) ও "কৌলীন্য-সংশোধন" (১৮৭১) নামে দুটি গ্রন্থ রচনাও করেছিলেন এদিকে -

বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে হুগলী জেলার গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান করে ১৮৭১ সালের ১৬ই জুলাই তারিখে বহুবিবাহ বিষয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন, এবং যে সব সনাতনী নেতা বহুবিবাহ অনেক কমে গেছে বলে দাবী করছিলেন তাঁদের মতের অসারতা তিনি এই পুস্তিকায় সুষ্ঠু-ভাবে প্রমাণ করে দেন। একমাত্র হুগলী জেলার ৭৬টি গ্রামে ১৩৩ জন কুলীনের ২১৫১টি বিবাহের সংবাদ তিনি এই পুস্তিকাতে দিয়েছিলেন। এই সময় সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার পক্ষ হতে বহুবিবাহ বিষয়ে শাস্ত্রীয় মত সংগ্রহ করে আবার সরকারের কাছে আবেদন জানাবার উদ্যোগ চলছিল। তাঁদের সেই প্রচেষ্টায় সহায়তা করার জন্যই বিদ্যাসাগর মহাশয় এই পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। এই পুস্তিকার বহু প্রতিবাদ সেযুগের সনাতনী পণ্ডিত মহল থেকে হয়েছিল এবং এই সব প্রতিবাদের উত্তর দেবার জন্যই ১৮৭৩ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর বহুবিবাহবিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তিকা রচনা করেন। এই দ্বিতীয় পুস্তিকাখানি হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের উপর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অসাধারণ আধিপত্যের উজ্জ্বল নিদর্শন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল পুস্তিকাখানি ইংরেজীতে অনুবাদ করে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে পাঠিয়ে দেবেন, কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। সমাজ সংস্কার এবং সমাজোন্নতিবিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় এক প্রতিজ্ঞাপত্রও রচনা করেছিলেন এবং এর মধ্যেও বহুবিবাহ হতে নিরত হবার এবং কুলীন-শ্রোত্রিয়-বংশজ নির্বিশেষে সৎপাত্রে কন্যা সমর্পণ করার তিনটি প্রতিজ্ঞা ছিল; কিন্তু এই প্রতিজ্ঞাপত্রেও আশানুরূপ সংখ্যায় স্বাক্ষর পাওয়া যায়নি। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও তাঁর অনুবর্তীগণ যখন আইনের সাহায্যে বহুবিবাহ রহিত করবার চেষ্টা করছিলেন, তখন বাংলাদেশের আর একজন বিখ্যাত মনীষী তাঁদের এই প্রচেষ্টার প্রকাশ্য বিরোধিতা করেছিলেন। এই বিখ্যাত মনীষী হচ্ছেন সেযুগের শ্রেষ্ঠ বাঙালী সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এই মত প্রকাশ করেন যে কুলীনদের মধ্যে বহুবিবাহ বিনা আয়াসেই দিন দিন কমে যাচ্ছে এবং কিছুদিনের মধ্যেই এ প্রথা আপনা হতে উঠে যাবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এ প্রথাকে যতটা প্রবল

মনে করেছেন আসলে এ প্রথা তত প্রবল নয়। তাছাড়া শুধু শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে কুলীনদের মধ্যে বহুবিবাহ নিরোধ করা সম্ভবপর নয়। শাস্ত্রে যে যে ক্ষেত্রে একাধিক বিবাহের অনুমতি আছে সেই সব ক্ষেত্রেই যদি লোকে একাধিক বিবাহ করে তাহলে "এখন যেখানে একজন কুলীন ব্রাহ্মণ বহুবিবাহপরায়ণ সেখানে সহস্র সহস্র কুলীন অকুলীন ব্রাহ্মণ শূদ্র বহু পত্নী লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে শাস্ত্রানুসারে সংসারধর্ম্ম করিতে পারিবেন।" বঙ্কিমচন্দ্র আরও বলেন যে কেবলমাত্র হিন্দুদের জন্যই আইন করে বহু-বিবাহ নিরোধ করা সরকারের উচিত হবে না। মুসলমান প্রজাদের জন্যও তাঁরা এই ব্যাপারে কি করতে পারেন সরকারের তা ভেবে দেখা উচিত। আর যদি সরকার প্রজার মঙ্গলের জন্য আইনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন তাহলে শাস্ত্রের মান রাখবার কোনো প্রয়োজন নেই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহ-নিরোধ আন্দোলন বিধবাবিবাহ আন্দোলনের মত রাজশক্তির সমর্থন লাভ করেনি। শুধু হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের নির্দেশ গ্রহণ করে যে বহুবিবাহ বন্ধ করা যেতে পারে না একথা ১৮৬৭ সালের তদন্ত সমিতিই স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়েছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের কথার পুনরুক্তি করেন মাত্র। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে আইনের সমর্থন লাভ করেও বিধবাবিবাহ উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুসমাজে প্রচলিত হয়নি, অথচ আইনের সাহায্য না নিয়েও বহুবিবাহ-নিরোধ আন্দোলনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্রুত প্রসার ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে অল্পদিনের মধ্যেই কুলীনদের বহুবিবাহ বন্ধ হয়ে যায়। এবিষয়ে বিদ্যাসাগরের চেয়ে বঙ্কিমের দূরদর্শিতা বেশী ছিল তা স্বীকার করতেই হবে। অবশ্য বহুবিবাহ নিরোধের পথে বিদ্যাসাগরের আন্দোলন যে সমাজে একটা অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি করেছিল তাও অস্বীকার করা যায় না। এবং এই কারণেই এ আন্দোলনকে একেবারে নিরর্থক বা ব্যর্থ বলা চলে না।

গ্রন্থপঞ্জী

ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী (সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ) (১৩৫৭ সন)
বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী—সমাজ (সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ) (১৩৪৫ সন)
বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ)—বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় ভাগ (১৩৪৬ সন)
টেকচাঁদ ঠাকুর, আলালের ঘরের দুলাল (১৯০৩)
রামনারায়ণ তর্করত্ন, কুলীনকুলসর্বস্ব (তৃতীয় সংস্করণ, ১৮৬১)
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কবিকঙ্কন চণ্ডী (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ, ১৯৫২)
চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর (১৮৯৫)
নগেন্দ্রনাথ বসু, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (১৯১২)
নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস—আদিপর্ব (১৩৫৬ সন)
সুধীরকুমার মিত্র, হুগলী জেলার ইতিহাস (১৩৫৫ সন)
সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড (১৯৫০)
অজ্ঞাত, রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত (১৮৮১)
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), সংবাদপত্রে সেকালের কথা ২য় খণ্ড (১৩৫৬ সন)
বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৬২ ও বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৩
H. H. Risley, *The Tribes And Castes of Bengal*, Vol. I (1891)
C. E. Buckland, *Bengal Under The Lieutenant Governors*, Vol. I (1901)
P. N. Bose, *History of Hindu Civilization During British Rule In India*, Vol. II (1894)
Jessore District Gazetteer (1912)
Hooghly District Gazetteer (1912)
Mymensingh District Gazetteer (1917)

W. Ward, *View of The History, Literature And Religion of The Hindus,* Vols. II-III (1817)

S. C. Bose, *The Hindus As They Are* (1881)

K. K. Datta, *Studies In The History of The Bengal Subah,* Vol. I (1936)

R. C. Majumdar (Ed.) *History of Bengal*, Vol. I (Dacca University, 1943)

Proceedings of The Legislative Council of India, Vols. I-II.

Parliamentary Papers ; House of Commons, 1826-27, Vol. XX

The Calcutta Review, 1846, Vol. VI

India Gazette (Supplement), March 30; 1867.

Rammohun Roy, *Brief Remarks Regarding Modern Encroachments On The Ancient Rights of Females* (1822)

S. C. Sarkar, *Anti-Polygamy Tracts* (1856)

বিধবা-বিবাহ আন্দোলন ও বিদ্যাসাগর

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে যে সব সমাজসংস্কার-মূলক আন্দোলন দেখা দিয়েছিল বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে এক হিসাবে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বৈপ্লবিক বলা চলে। যে সামাজিক সংস্কারের বিনাশ সাধন এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল আজ একশত বৎসর পরেও আমাদের সমাজ সেই সংস্কারের প্রভাব হতে মুক্ত হয় নি, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিধবাবিবাহের সংখ্যা ভারতীয় সমাজে আজও নগণ্য বলা চলে। কিন্তু বিধবাবিবাহের বিরোধী সংস্কার ভারতীয় হিন্দু সমাজে বহুদিন বদ্ধমূল হলেও একেবারে প্রাচীন যুগে এই সংস্কারের বিরোধী একটি মনোভাবও সক্রিয়রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল, এবং মধ্য-যুগে মুসলমান রাজত্বকালেও হিন্দু সমাজে বিধবাবিবাহ সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হয় নি। অষ্টাদশ শতকে এবং উনবিংশ শতকে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের পূর্বেও হিন্দু সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য একাধিক আন্দোলন হয়েছিল যদিও বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের মত সুগঠিত ও ব্যাপক রূপ তারা ধারণ করে নি।

স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৭০ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় 'ভারতে হিন্দুজাতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া'-শীর্ষক এক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে প্রাচীন ভারতের হিন্দু সমাজে বিধবাবিবাহের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। মৃত ব্যক্তির চিতায় অগ্নি-সংযোগের পূর্বে তার বিধবা পত্নীকে চিতা হতে নামিয়ে আনা হ'ত এবং পরে মৃত ব্যক্তির কনিষ্ঠ ভ্রাতা বা অন্য কোনো আত্মীয়ের সঙ্গে তার দ্বিতীয়বার বিবাহ দেওয়া হ'ত। যে লোক এই বিধবাকে বিবাহ করত তার নাম হ'ত 'দিধিষু' এবং যে বিধবার এইভাবে পুনর্বিবাহ হত তাকে বলা হ'ত 'পুনর্ভবা'। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ষষ্ঠ প্রপাঠক, প্রথম অনুবাকে এই বিষয়ে একটি মন্ত্র আছে যার অর্থ এইরূপ—"হে নারী, তুমি যার পাশে শয়ন করে আছ তার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়েছে। জীবিতের জগতে তুমি ফিরে

এসো এবং এমন কোনো লোককে পতিত্বে বরণ কর, যে পূর্বে বিবাহিতা মহিলাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত আছে এবং তোমার পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক।" ঋগ্বেদের পঞ্চম কাণ্ড, দশম প্রপাঠকেও অনুরূপ একটি মন্ত্র পাওয়া যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে যে, কোনো নারীর একই সময়ে একাধিক পতি থাকতে পারে না। পরোক্ষভাবে এতে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে যে বিভিন্ন সময়ে এক নারীর একাধিক পতি হওয়া সম্ভব। অথর্ব বেদের নবম কাণ্ড, বিংশতি প্রপাঠকের একটি শ্লোকে বিধবাবিবাহের সুস্পষ্ট সমর্থন রয়েছে, এবং একটি বিশেষ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের সাহায্যে দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী যে স্ত্রীর সঙ্গে স্বর্গবাস করার অধিকারী হতে পারে সে কথাও বলা হয়েছে। বৈদিক যুগে মেয়েদের নিতান্ত অল্প বয়সে বিবাহ হ'ত না, সুতরাং বিধবাবিবাহের এই সমর্থন শুধু যে বালবিধবাদের পক্ষে প্রযোজ্য এ কথা মনে করা সমীচীন হবে না। রামায়ণে সুগ্রীব ও বিভীষণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিধবাকে বিবাহ করার কাহিনী এবং মহাভারতে অর্জুনের সঙ্গে নাগরাজের বিধবা কন্যা উলুপীর বিবাহ ও দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ংবরের ঘটনাও এই কথাই প্রমাণ করে যে মহাকাব্যের যুগে বিধবাবিবাহ সম্পূর্ণ অপ্রচলিত ছিল না। স্মৃতি ও পুরাণের যুগেও আমরা বিধবাবিবাহের যথেষ্ট শাস্ত্রীয় সমর্থন পাই। বিষ্ণু সংহিতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে ও বশিষ্ঠ সংহিতার সপ্তদশ অধ্যায়ে স্বামী-সহবাস হয় নি এমন বিধবার বিবাহ সমর্থন করা হয়েছে। নারদ-সংহিতার দ্বাদশ বিবাদপদে বলা হয়েছে যে কোনো নারীর পতি মৃত, ক্লীব, সন্ন্যাসী, সমাজচ্যুত বা নিঃসন্তান হলে সে নারী পুনরায় বিবাহ করার অধিকারী। বিভিন্ন বর্ণের (জাতির) নারীরা নিঃসন্তান পতির জন্য কত বৎসর অপেক্ষা করতে বাধ্য তাও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় সব রকম বিধবার বিবাহ সমর্থন করে বলা হয়েছে যে, কোনো মৃত ব্যক্তির ঋণ তার বিধবা পত্নীকে যে বিবাহ করবে সে-ই শোধ করতে বাধ্য। পরাশর সংহিতায়, যা নাকি কলিযুগের জন্য বিশেষ-ভাবে লিখিত ('কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ'), সুস্পষ্টভাবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নারীর পত্যন্তর গ্রহণের সমর্থন আছে এবং পরাশর সংহিতায়

চতুর্থ অধ্যায়ের একটি শ্লোককে ভিত্তি করেই বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের পক্ষে তাঁর সমস্ত শাস্ত্রীয় যুক্তিজাল বিস্তার করেছেন। অবশ্য এর ঠিক পরের শ্লোকেই বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্য পালন যে মহাপুণ্যের কাজ এবং মৃত স্বামীর চিতায় সহমরণ যে আরো পুণ্যের, সে কথাও বলা হয়েছে। অন্যে পরে কা কথা, রক্ষণশীল-চূড়ামণি মনু-ও স্বামী-সহবাস হয় নি এমন বিধবার পুনর্বিবাহের আদেশ দিয়েছেন। অন্য রকম বিধবার বিবাহ তিনি সমর্থন না করলেও তাঁর সময়ে এ রকম বিবাহ যে হ'ত তার প্রমাণ তাঁর শাস্ত্রেই রয়েছে (মনু, ৯।১৭৫-১৭৬)। ঐ বিবাহের ফলে জাত সন্তানকে পৌনর্ভব বলা হত এবং পৌনর্ভব সন্তান তাঁর প্রথম পিতার সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশের উত্তরাধিকারী হতেন। ব্রহ্মপুরাণ এবং অগ্নিপুরাণেও মনুর নির্দেশের সমর্থন পাওয়া যায়। পদ্ম-পুরাণে বারাণসীর এক রাজকন্যার অন্ততঃ কুড়ি বার বিবাহের কথা বলা হয়েছে, তবে খুব সম্ভব এই দৃষ্টান্তটি কাল্পনিক। হিন্দু ফলিত জ্যোতিষেও গ্রহ-নক্ষত্রের কি ধরণের সমাবেশ রাশিচক্রে ঘটলে কোনো পুরুষের পুনর্ভবা কন্যার সঙ্গে বিবাহ সম্ভব তা বলা হয়েছে। সমাজে এ ধরণের বিবাহ প্রচলিত না থাকলে জ্যোতিষীরা নিশ্চয় এ বিষয় নিয়ে চিন্তা করতেন না। উপরের প্রমাণগুলি হতে মনে হয় যে অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষে বিধবাবিবাহ সমাজের উচ্চ স্তরেও একেবারে অপ্রচলিত ছিল না, যদিও মনুর বিধান অনুযায়ী বিধবার পক্ষে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন-ই সাধারণ নিয়ম হয়ে উঠছিল। খ্রীষ্টীয় ১০১৪ সালে লিখিত একটি জৈন গ্রন্থে কোনো এক ব্রাহ্মণ পরিবারে বিধবাবিবাহের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আল-বেরুণীর ভারত-বিবরণ পাঠে মনে হয় সমাজে তখন বিধবাবিবাহ প্রায় অচল হয়ে পড়েছিল।

ভারতে মুসলমান রাজত্বের আমলে বিধবাবিবাহ হিন্দু সমাজের উচ্চস্তরে অপ্রচলিত ও নিন্দনীয় হয়ে পড়ে, এমন কি উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানেরাও হিন্দুদের দেখাদেখি এরূপ বিবাহ বর্জন করবার চেষ্টা করেন। কথিত আছে যে ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রবর্তক সৈয়দ আহ্‌মদ মুসলমানদের এই কুসংস্কার দূর করবার জন্য দিল্লীতে এক রাত্রে

পাঁচশত মুসলমান বিধবার বিবাহ দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর এই চেষ্টা বিশেষ সফল হয়নি। তবে হিন্দু সমাজের কোনো কোনো অংশে বিধবা-বিবাহ কোনো দিনই একেবারে লোপ পায় নি। গুজরাটের মনবাণিয়া (বর্তমানে মালবের অধিবাসী) এবং মারু বা যোধপুরী ব্রাহ্মণেরা নিজেদের সমাজে বরাবর বিধবাবিবাহ প্রথা প্রচলিত রেখেছেন। পশ্চিম ভারতে বিধবাবিবাহকে গান্ধর্ববিবাহ বা নট্‌রা বলা হ'ত। দাক্ষিণাত্যে মারাঠা দেশের ক্ষত্রিয় সমাজে অষ্টাদশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত এরূপ বিবাহ প্রচলিত ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য বৃদ্ধির সঙ্গে তা লোপ পেয়েছে। Crooke সাহেব লিখেছেন যে সংযুক্ত প্রদেশে (বর্তমান উত্তর প্রদেশে) উচ্চতম বর্ণগুলি ভিন্ন সমাজের অন্যান্য সব বর্ণের মধ্যেই বিধবাবিবাহ অল্প-বিস্তর প্রচলিত আছে, যদিও সেখানে ব্রাহ্মণ প্রভাব এত বেশি যে এরকম বিবাহ বিশেষ সামাজিক মর্যাদা লাভ করে না এবং সাধারণ বিবাহের কোনো অনুষ্ঠানই এই বিবাহে পালন করা হয় না। যে সব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে তারা এ প্রথা বর্জন করলে সমাজে আরো মর্যাদা পায়। উড়িষ্যার কোনো কোনো অংশে বিধবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীর সঙ্গে কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহের প্রথা সুপ্রচলিত। জাঠ এবং ভারতের কোনো কোনো আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যেও এরূপ বিবাহের কথা স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল তাঁর বই-এ উল্লেখ করেছেন। এই সব সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিবারের বিধবাকে পারিবারিক সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয় এবং সহজে তাকে পরিবারের বাইরে বিবাহ করতে দেওয়া হয় না। সমাজের উচ্চ বর্ণের নেতারা সময়ে সময়ে বিধবাবিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করেছেন এরকম দৃষ্টান্তও যে মধ্যযুগের ইতিহাসে একেবারে পাওয়া যায় না তা নয়। মুঘল আমলে জয়পুরের রাজা জয়সিংহ, কোটার রাণা জলিম সিংহ এবং পেশোয়ার দরবারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী পরশুরাম ভাও-এর প্রচেষ্টা এই প্রসঙ্গে বিশেষ স্মরণীয়। জয়সিংহের প্রচেষ্টা তাঁর বিধবা মায়ের বিরোধিতায় এবং পরশুরাম ভাও-এর প্রচেষ্টা তাঁর পত্নীর বিরূপ মনোভাবের জন্য ব্যর্থ হয়ে যায়। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন আরম্ভ হবার কিছু

পূর্বে ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে রত্নগিরির এক তেলেগু ব্রাহ্মণ বিধবাবিবাহের সমর্থনে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। প্রথমে বোম্বাই শহরে এটি প্রকাশিত হয় ও সেখানকার সাপ্তাহিক পত্রিকা 'মুম্বাই দর্পণে' এর বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হয়। এই ঘটনার কিছুদিন পরে জৈন সম্প্রদায়ের নেতা বাবা পদ্মনজী বিধবাবিবাহ বিষয়ে দুটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুরের এক সম্ভ্রান্ত মারাঠা ব্রাহ্মণ শাস্ত্রীয় যুক্তির অবতারণা করে বিধবাবিবাহ সমর্থনের চেষ্টা করেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পুণায় রঘুনাথ জনার্দন নামে এক ব্রাহ্মণ চিমাবাই নামে এক বিধবার পাণিগ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁর প্রথমা পত্নী তখনো জীবিত থাকায় এই বিবাহ সমাজ-সংস্কারকগণের মনঃপূত হয় নি। বাংলা দেশে বিধবা-বিবাহ আন্দোলন সাফল্য লাভ করবার পরে বিষ্ণু শাস্ত্রীর নেতৃত্বে দাক্ষিণাত্যেও এই আন্দোলন পূর্ণোদ্যমে চলতে থাকে।

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন আরম্ভ হবার বহু পূর্ব হতেই বাংলাদেশে এই অতিপ্রয়োজনীয় সমাজ সংস্কারের চেষ্টা চলছিল, যদিও কোনোদিন তা বিশেষ ব্যাপক রূপ ধারণ করেনি। মধ্যযুগেই চৈতন্যের অনুবর্তী বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে বিধবাবিবাহের প্রচলন হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সমাজ যখন ঘোর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন তখনো ঢাকার রাজা রাজবল্লভ উচ্চবর্ণের বাঙ্গালী সমাজে বিধবাবিবাহ প্রবর্তন করবার চেষ্টা করেছিলেন। ১৭৫৬ সালে আপন বিধবা কন্যার বিবাহ দেবার জন্য রাজবল্লভ বিক্রমপুর, নদীয়া, বারাণসী, মিথিলা, দ্রাবিড় ও তৈলঙ্গদেশের পণ্ডিতসমাজের কাছে শাস্ত্রীয় বিধান প্রার্থনা করেন। তাঁরা সকলেই এই ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছিলেন, কিন্তু রাজবল্লভের তিন সভাপণ্ডিত—সার্বভৌম, বিদ্যাবাগীশ ও সিদ্ধান্ত, এঁদের মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তির বিপরীত আচরণের জন্য ও নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বিরোধিতার জন্য শেষ পর্যন্ত এই চেষ্টা পণ্ড হয়ে যায়। কৃষ্ণচন্দ্রের বিরোধিতার প্রধান কারণ ছিল বৈদ্যবিদ্বেষ। রাজবল্লভের প্রস্তাব শোনামাত্র তিনি বলেছিলেন—"এ ব্যবস্থা শাস্ত্রবিরুদ্ধ না হলেও ব্যবহার-বিরুদ্ধ বলে রাজবল্লভকে নিরাশ করতে হবে। একজন বৈদ্যজাতীয় যে

এই চির-অপ্রচলিত ব্যবহার প্রচলিত করে যাবেন এ কোনমতেই সহ্য যায় না।" রাজবল্লভ কৃষ্ণচন্দ্রের চাতুরী বুঝতে না পেরে প্রচেষ্টা হতে নিবৃত্ত হন। মহারাজ শ্রীশচন্দ্র বলতেন—কৃষ্ণচন্দ্র রাজবল্লভের পাঠানো ব্যবস্থাপত্র পাঠ করে বহু আক্ষেপ করে বলেন, "হায় আমি কেন আগে এবিষয়ে চেষ্টা করিনি।" রাজা রামমোহন রায় তাঁর 'Ancient Rights of Females' (1824) গ্রন্থে হিন্দু বিধবাদের দুঃখ দুর্দশার কাহিনী বিশদভাবে বর্ণনা করে স্বামীর সম্পত্তিতে তাঁদের উত্তরাধিকার দাবী করেন। রামমোহন প্রকাশ্যে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের জন্য কোন চেষ্টা করেছিলেন বলে জানা যায় না, কিন্তু তাঁর বিলাত যাত্রার পর এদেশে এক প্রবল জনরব ওঠে যে তিনি হিন্দু বিধবাদের বিবাহ দেবার চেষ্টা করতেই বিলাত গিয়েছেন। ১৮৫৫ সালে Calcutta Review পত্রে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে লেখক বলছেন,—"We do not know exactly how this impression got abroad, but it was so firm especially in the female mind that the old widows often jocularly talked of their marriage on the return of Rammohan Roy." ১৮৩৫ সালের ১৪ই মার্চ তারিখে 'সমাচার দর্পণে' শান্তিপুর নিবাসী কয়েকজন অবিবাহিতা প্রৌঢ়া কুলীনকন্যার প্রেরিত এক পত্র প্রকাশিত হয়। এই পত্রে তাঁরা নিজেদের দুর্দশার কাহিনী বিবৃত করে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণকায়স্থ ঘরে বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য দাবী জানান ও উপস্ত্রীগমন নিরোধ সম্পর্কে আইন প্রার্থনা করেন। ২১শে মার্চ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' চুঁচুড়ার কয়েকজন ভদ্রমহিলার এই দাবীর সমর্থনে প্রেরিত এক পত্র প্রকাশিত হয়। এই পত্রে চুঁচুড়ানিবাসী মহিলাগণ বঙ্গের পিতা ও ভ্রাতাগণের নিকট এক আবেদনে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের জন্য দাবী জানান, স্বচ্ছন্দে পরপুরুষের সঙ্গে আলাপ করবার অনুমতি প্রার্থনা করেন, পতি-নির্বাচনের ব্যাপারে স্বাধীনতা কামনা করেন, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিরোধের জন্য দাবী জানান, পণপ্রথার বিরুদ্ধে আপত্তি প্রকাশ করেন এবং সর্বশেষে বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য অনুরোধ জানান। খুব সম্ভব এই পত্রদুটির

পশ্চাতে কোনো রামমোহন-শিষ্যের অনুপ্রেরণা ছিল। ১৮৩৭ সালের ২৯শে এপ্রিল 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় এই মর্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হয় যে বাবু মতিলাল শীল, বাবু হলধর মল্লিক প্রমুখ কলকাতার কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক দেশে স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবাবিবাহের প্রচলনের ব্যাপারে উৎসাহ দেবার জন্য একটি সভা আহ্বান করতে মনস্থ করেছেন। Harkara, Courier, Englishman, Reformer, ও সমাচার দর্পণ পত্রিকার সম্পাদকগণও বিধবাবিবাহের পক্ষে নিজেদের অভিমত জ্ঞাপন করেন। Friend of India এবং Bengal Spectator পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি পত্রে ও প্রবন্ধে আমরা এই আন্দোলনেরই অনুবর্তন লক্ষ্য করি। ১৮৪২-এর এপ্রিল সংখ্যা Bengal Spectator-এ এক পত্রলেখক কিভাবে এই আন্দোলনকে সফল করা যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং একটি বিস্তারিত কর্মসূচী লিপিবদ্ধ করেন। ঐ বৎসরের ২৬শে এপ্রিল তারিখে প্রকাশিত 'সংবাদ প্রভাকরে' এই পত্রের এক তীব্র সমালোচনা প্রকাশিত হয় এবং পরের মাসে Bengal Spectator পত্রিকায় একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই সমালোচনার উত্তর দেওয়া হয়। বিধবাবিবাহে কোন্ কোন্ শাস্ত্রীয় আচার পালনীয় সেই সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়। ১৮৪৩-এর ১৫ই জানুয়ারী তারিখে Bengal Spectator-এর সম্পাদকের কাছে প্রেরিত এক পত্র প্রকাশিত হয়। পত্রলেখক এইমর্মে আবেদন জানান যে বিধবাবিবাহের স্বপক্ষে যখন কোন শাস্ত্রীয় সমর্থন পাওয়া যায় না, এবং ভবিষ্যতে তা পাওয়া গেলেও আদালতের কাছে গ্রাহ্য হবে না, তখন সরকারের সাহায্য ছাড়া এই আন্দোলনে সাফল্য লাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। সেই সাহায্য যাতে পাওয়া যায় তার জন্য সকলকে চেষ্টা করতে হবে। বিদ্যাসাগরের হস্তক্ষেপের প্রায় ১০ বৎসর পূর্বে বহুবাজার নিবাসী ৺নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যান্য কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের সহযোগিতায় সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলনে চেষ্টা করে ব্যর্থ হ'ন। এর কিছুদিন পূর্বে কৃষ্ণনগরের মহারাজা ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠাবিষয়ে সাফল্য লাভ করে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে প্রয়াসী হ'ন। বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা

লাভের জন্য নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর এক সভা আহ্বান করা হয়। পণ্ডিতেরা প্রথাটির শাস্ত্রীয়তা স্বীকার করেও সহসা লিখিত ব্যবস্থাপত্র দিতে রাজী হন নি, শেষ পর্যন্ত রাজার বিশেষ অনুরোধে তাঁরা এই কার্যে সম্মত হন, কিন্তু শ্রীশচন্দ্রের চেষ্টাও সাফল্য লাভ করে নি। বাবু ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় ও বারাসত-নিবাসী কালীকৃষ্ণ মিত্র পরিচালিত কৃষ্ণনগরের নব্যসম্প্রদায় কর্তৃক বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আন্দোলনও এই সময়েই আরম্ভ হয়। কিন্তু বীরনগর (উলা) নিবাসী বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের বিরোধিতায় এই আন্দোলন ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৮৪৫ সালে কলকাতার British India Society বিধবাবিবাহের ব্যাপারে ধর্মসভা ও তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে কিছুকাল পত্রালাপ করেন, কিন্তু এই পত্রালাপে বিশেষ কোনো সুফল হয় নি। বিদ্যাসাগরের আন্দোলন আরম্ভ হবার ঠিক আগেই কলকাতার পটলডাঙ্গা নিবাসী শ্যামাচরণ দাস নিজের বালিকা বিধবা কন্যার বিবাহ দেবার জন্য স্মার্ত ভট্টাচার্যদের কাছে ব্যবস্থাপ্রার্থী হলে কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, তারাশঙ্কর বিদ্যারত্ন, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত, ঠাকুরদাস চূড়ামণি, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি কয়েকজন স্মার্ত ভট্টাচার্য বিধবা-বিবাহের বৈধতা স্বীকার করে এক ব্যবস্থাপত্র দেন। কিন্তু তাঁরা কেবলমাত্র শূদ্রের পক্ষেই এই ব্যবস্থা শাস্ত্রসম্মত বলে ঘোষণা করেন এবং পরিশেষে এই ব্যবস্থাপত্রও প্রত্যাহার করে শ্যামাচরণ দাসকে এই কার্য হতে নিবৃত্ত করেন। এই সময়েই রাজা রাধাকান্ত দেবের গৃহে আহূত এক সভায় বহু পণ্ডিতের উপস্থিতিতে নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ স্মার্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের সঙ্গে বিচারে উপরের স্বাক্ষরকারীদের অন্যতম ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন বিধবাবিবাহের পক্ষ সমর্থন করে জয়ী হ'ন এবং রাজবাড়ী হতে একজোড়া শাল পুরস্কার লাভ করেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন ঐ পুরস্কারের শাল গায়ে দিয়েই বিধবাবিবাহের বিপক্ষীয়দের সাহায্য করেন এবং মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশও তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। বিদ্যাসাগর তাঁর বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তকের বিজ্ঞাপনে এইসব পণ্ডিতদের আচরণের তীব্র নিন্দা করেন।

এইভাবে বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের বহু পূর্ব হতেই বাংলাদেশে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের চেষ্টা চলছিল, কিন্তু বিদ্যাসাগরই প্রথম এই ব্যাপার নিয়ে এক দেশব্যাপী আলোড়নের সূচনা করেন এবং বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে প্রবল জনমত গঠন করেন। তাঁর বহু সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টার মধ্যে বিধবাবিবাহ আন্দোলনই যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বৈপ্লবিক সম্ভাবনাযুক্ত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বিদ্যাসাগর নিজেও এই আন্দোলনের গুরুত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। পুত্র নারায়ণচন্দ্রের বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর নিজ সহোদর ও জীবনীকার শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে যে পত্র দিয়েছিলেন তাতে তিনি বলেন, "বিধবাবিবাহের প্রবর্তন আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম—জন্মে ইহা অপেক্ষা অধিক কোন সৎকর্ম্ম করিতে পারিব তাহার সম্ভাবনা নাই; এবিষয়ের জন্ম সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নই, সে বিবেচনায় কুটুম্ব বিচ্ছেদ অতি তুচ্ছ কথা।" বিদ্যাসাগরের জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিকই বলেছেন যে লোকে বিদ্যাসাগরের জীবনকাহিনীতে তাঁর শৈশবে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম, তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, তাঁর স্বাধীনচিত্ততা, তাঁর বঙ্গভারতীর সেবা, দরিদ্র আতুর জনের প্রতি তাঁর সহৃদয়তা ও মমত্ববোধ সব কিছুই ভুলে যেতে পারে, কিন্তু ভারতে হিন্দু বিধবার বিবাহ প্রবর্তন তারা কোনোদিন ভুলতে পারবে না। সতীদাহ নিবারণে রামমোহনের মতো বিধবাবিবাহের সমর্থনে বিদ্যাসাগরও বহু শাস্ত্রীয় যুক্তি ও তত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন সত্য কিন্তু শাস্ত্রে বিধবাবিবাহের সমর্থন আছে বলেই যে তিনি এবিষয়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন তা নয়। উৎপীড়িত অসহায় জনের প্রতি যে নিবিড় সহানুভূতি এবং মানবজীবনের প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধাবোধ তাঁর অন্তরের স্বাভাবিক গুণ ছিল তাই তাঁকে এই আন্দোলনে যোগদান করতে প্রেরণা দিয়েছিল। শাস্ত্রীয় যুক্তি ও তত্ত্ব কেবলমাত্র তাঁর কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশাচারবিমূঢ় দেশবাসীর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের জন্তই ব্যবহৃত হয়েছিল। বাংলার নারীদের দুর্দশা মোচনের জন্ত বিদ্যাসাগর তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন বিধবাবিবাহ

আন্দোলন তাঁর এই বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ মাত্র। অনেকের ধারণা বিদ্যাসাগর তাঁর জননীর অনুরোধে প্রথম এবিষয়ে চিন্তা করতে আরম্ভ করেন। Joseph Chailley তাঁর Administrative Problems of British India গ্রন্থে লিখেছেন—"At the instigation of his mother he interested himself in the lot of child widows and studied the sacred books to see if he could find anything in their favour." কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। বিদ্যাসাগরের জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মা ও ছেলে' বই-এ ভগবতী দেবীর চরিতকাহিনী সম্বন্ধে কয়েকটি আখ্যায়িকা আছে। বিদ্যাসাগর নিজে এগুলি দেখে দিয়েছিলেন। বিধবাবিবাহ বিষয়ে তাঁর জননীর কতটুকু সম্বন্ধ ছিল তাও প্রসঙ্গক্রমে সেখানে লিখিত হয়েছে, কিন্তু তাতে তাঁর জননীর অনুরোধের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

১৮৫৪ সালের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' কয়েকটি প্রবন্ধ লিখে বিদ্যাসাগর প্রথম এই আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হওয়াতে বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজে চাঞ্চল্য দেখা যায়। এই সময়ে কালীকৃষ্ণ মিত্রও কৃষ্ণনগরের এক সভায় পঠিত প্রবন্ধে বিধবাবিবাহের আবশ্যকতা এবং বিদ্যাসাগরের প্রদত্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণগুলির বৈধতা প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেন, এবং তাঁর বক্তৃতার ফলে কৃষ্ণনগরে নূতন করে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৮৫৫ সালের জানুয়ারী মাসে বিদ্যাসাগরের "বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব" নাম পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। বহুদিন চিন্তা করে, বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করে বিদ্যাসাগর এই পুস্তিকাটি রচনা করেন এবং জনসমাজে এর প্রচারের ব্যবস্থা করেন। প্রধানতঃ পরাশর সংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ের একটি শ্লোককে ভিত্তি করেই বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের স্বপক্ষে তাঁর শাস্ত্রীয় যুক্তিজাল বিস্তার করবার চেষ্টা করেছিলেন।

বিধবাবিবাহ যে কোনকালেই হিন্দুশাস্ত্রকাররা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেননি এটাই বিদ্যাসাগরের গ্রন্থের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। বিধবা-বিবাহের প্রচলনের জন্য তিনি দেশবাসীর মনুষ্যত্ববোধ ও বিবেকের

কাছেও আবেদন জানিয়েছিলেন। পুস্তিকাটি প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশে এক তুমুল আলোড়ন আরম্ভ হয়। প্রথম সংস্করণের ২০০০ বই এক সপ্তাহের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যায়। দ্বিতীয় সংস্করণের ৩০০০ বই ও তৃতীয় সংস্করণের ১০,০০০ বইও অল্পকালের মধ্যে বিক্রীত হয়ে যায়। একশত বৎসর আগে বাংলাদেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কত অল্প ছিল তা চিন্তা করলে দেশবাসীর চিত্তকে এই পুস্তিকাটি কতদূর অভিভূত করেছিল তা সহজেই অনুমান করা যাবে। বিদ্যাসাগরের পুস্তিকাটি প্রকাশিত হবার পর তাঁর মত খণ্ডন করে বিভিন্ন প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত প্রায় ৩০টি পুস্তিকা রচনা করেন। বিদ্যাসাগর আবার এঁদের প্রত্যেকের বক্তব্য শাস্ত্রীয় যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করে তাঁর বিধবাবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকটি রচনা করেন (অক্টোবর, ১৮৫৫)। এই দ্বিতীয় পুস্তকে তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে, পরাশরের বচন বিবাহিতা কন্যাবিষয়ক, বাগদত্তা বিষয়ক নয়; এই বচন কলিযুগের পক্ষেই প্রযোজ্য, অন্য যুগের পক্ষে নয়; ইহা মনুবিরুদ্ধ বা বেদবিরুদ্ধ নয়, অথবা নীচজাতির বিবাহ বিষয়কও নয়; বিধবাবিবাহের সময়ে কন্যার পিতা কন্যার পিতৃগোত্র উল্লেখ করেই তাকে সম্প্রদান করতে পারেন; এবং সর্বোপরি দেশাচার শাস্ত্রের চেয়ে প্রবল প্রমাণ নয়; এর পর বিদ্যাসাগরের উপর চারিদিক হতে গালিবর্ষণ হতে থাকে। তাঁর মত খণ্ডন করে আরও দু'একটি পুস্তিকা রচিত হয় এবং সেযুগের প্রায় সব দেশীয় সংবাদপত্রই তাঁর নিন্দা আরম্ভ করলেন। কেবল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'সম্বাদ ভাস্কর' ও 'মাসিক পত্রিকা' তাঁর পক্ষে থাকেন। বিদ্যাসাগর কিন্তু শুধু গ্রন্থ রচনা করেই ক্ষান্ত হলেন না, কার্যক্ষেত্রে বিধবাবিবাহ দেবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলেন। বিধবা-বিবাহের ফলে জাত সন্তান দায়ভাগ আইন অনুযায়ী পিতৃসম্পত্তি হতে যাতে বঞ্চিত না হয় সেইজন্য ভারত সরকারের কাছে প্রায় ১০০০ ব্যক্তির স্বাক্ষর সম্বলিত একটি দীর্ঘ আবেদনপত্র প্রেরণ করা হয় (৪ঠা অক্টোবর, ১৮৫৫)। এই আবেদন পত্রের সঙ্গে বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত আইনের একটি খসড়া প্রস্তাবও ছিল। এই আবেদন পত্রে যাঁরা স্বাক্ষর করেছিলেন তাঁদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত,

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, প্যারীচরণ সরকার, কালীকৃষ্ণ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জি, জয়কৃষ্ণ মুখার্জি, রাজা প্রতাপচন্দ্র ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বর্ধমান-অধিপতি মহাতপচাঁদ বাহাদুর এবং নবদ্বীপ, ঢাকা ও ময়মনসিংহের জমিদারেরা পৃথক পৃথক আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। ১৮৫৫'র ১৮ই নভেম্বর তারিখে Legislative Council-এর অন্যতম সদস্য J. P. Grant আইনের পাণ্ডুলিপি উত্থাপিত করেন এবং Sir James Colville ও P. W. LeGeyt একে সমর্থন করেন। আইনের পাণ্ডুলিপি প্রথমবার আলোচনা হবার সময় প্রস্তাবক Grant রঘুনন্দনের সময় হতে বিধবাবিবাহ আন্দোলনের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করে বলেন—"The Bill does not pretend to say what is the right interpretation of the directions for conduct in respect of marriage in the text-books or which of the conflicting authorities ought to be followed by a Hindu. It will interfere with the tenets of no human being, but it will prevent the tenets of one set of men from inflicting misery and vice upon the families of their neighbours, who are of a different and more humane persuasion." অর্থাৎ, বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে শাস্ত্রের কোন্ ব্যাখ্যা সঙ্গত এবং বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যাগুলির মধ্যে কোন্‌টি হিন্দুর পক্ষে গ্রহণীয় সে সম্বন্ধে আইনে কিছুই বলা হবে না। এই আইনের দ্বারা কোনো ব্যক্তির পারিবারিক আচারে বাধা দেওয়া হবে না, কেবল যাঁরা একটু ভিন্ন প্রকারের রীতিনীতি ও উদার সামাজিক ভাবের অনুবর্তী এর দ্বারা তাঁদের সামাজিক জীবনযাপনের পথের বাধা ও দুর্নীতি দূর হবে। ১৮৫৬'র ৯ই জানুয়ারী তারিখে আইনের প্রস্তাবটি দ্বিতীয়বার পঠিত হবার পর সেটিকে নির্বাচিত সমিতির কাছে প্রেরণ করা হয়। এই সমিতিতে ছিলেন Sir James Colville, Mr. Elliot, Mr. P. W. LeGeyt ও Mr. J. P. Grant। আইনের বিরুদ্ধবাদীরা এরপর কলকাতার রক্ষণশীল সমাজের নেতা রাজা রাধাকান্ত দেবের

নেতৃত্বে এক সভায় মিলিত হয়ে আইনের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের কাছে এবং প্রয়োজন হলে বিলাতেও আবেদনপত্র প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৮৫৬'র ১৭ই মার্চ তারিখে ৩৬,৭৬৩ জনের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি আবেদনপত্র ভারত সরকারের কাছে প্রেরণ করা হয়, কিন্তু স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে কলকাতার সম্ভ্রান্ত লোকেদের বিশেষ কেউ ছিলেন না। ত্রিবেণী, ভাটপাড়া, নদীয়া, বাঁশবেড়িয়া প্রভৃতি স্থান হতেও সর্বসমেত প্রায় ৪০টি আবেদনপত্রে ৫০।৬০ হাজার ব্যক্তি প্রস্তাবিত আইনের বিরোধিতা করেন। প্রস্তাবের পক্ষে ছিল মাত্র ২৫টি আবেদনপত্রে ৫ হাজার ব্যক্তির স্বাক্ষর। তা সত্ত্বেও ব্যবস্থাপক সভা বিরোধীপক্ষের যুক্তিগুলি প্রবল বলে বিবেচনা করেন নি এবং সভা আলোচনার সময়ে বিরোধীদলের মূল আবেদন পত্রের একটি স্থান 'ludicrous' বিশেষণে অভিহিত হয়েছিল। প্রস্তাবক Grant বলেন যে যদি একটি মাত্র বালিকাকেও তিনি এই আইনের সাহায্যে ব্রহ্মচর্যের শাস্তি হতে নিস্তার দিতে পারেন তা হলেও তিনি এই আইন প্রণয়ন করবার পক্ষপাতী। যদি এই আইনের সুযোগ কেউই না গ্রহণ করেন তা হলেও ইংরাজজাতির সুনামের জন্য এই আইন প্রণয়ন করা উচিত। নির্বাচিত সমিতি প্রস্তাব সমর্থন করে ৩১শে মে তারিখে তাঁদের মন্তব্য প্রেরণ করেন। ১৯শে জুলাই পাণ্ডুলিপিটি তৃতীয়বার পঠিত ও গৃহীত হয় এবং ২৬শে জুলাই Governor-Generalএর সম্মতিক্রমে এটি আইনে পরিণত হয় (Act XV of 1856)। এই আইনে বলা হয় যে বিধবাবিবাহ সম্পূর্ণ আইন-সম্মত এবং এরূপ বিবাহের সন্তানও সম্পূর্ণ বৈধ সন্তান হিসাবে আইনের চক্ষে গৃহীত হবে। কোনো বিশেষ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান এই বিবাহে পালন করা যায় না অজুহাতে এই বিবাহ অসিদ্ধ হবে না। কিন্তু যে বিধবা পুনরায় বিবাহ করবেন তিনি তাঁর মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে কোনোরূপ অধিকার দাবী করতে পারবেন না। অবশ্য তাঁর মৃত স্বামী ইচ্ছাপত্র (Will) করে তাঁকে কোনো বিশেষ সম্পত্তি দিয়ে থাকলে তাতে তাঁর অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে না, অথবা তাঁর নিজস্ব স্ত্রীধনেও তাঁর অধিকার লোপ পাবে না। আইন প্রণয়ন হবার

পর মহারাজ শ্রীশচন্দ্র, বাবু রামগোপাল ঘোষ, পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত লোক Grant সাহেবকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

এই আইন নিয়ে দেশে যে বিরাট আলোড়ন আরম্ভ হয় তার কিছু পরিচয় শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে এবং চণ্ডীচরণের বিদ্যাসাগর জীবনীতে পাওয়া যাবে। বিধবাবিবাহ নিয়ে অসংখ্য গান, নাটক, এমন কি দাশু রায়ের পাঁচালি রচিত হয়েছিল। কলকাতার রঙ্গমঞ্চে এরূপ একটি নাটকের অভিনয় হয়। শান্তিপুরের তাঁতিরা বহুমূল্য বস্ত্রের পাড়ের উপর বিধবাবিবাহের গান তুলতে আরম্ভ করে। এই গানগুলি পল্লীগ্রামের কৃষক এমন কি গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানদের মুখে পর্যন্ত শোনা যেত। 'সংবাদ প্রভাকরে' কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কয়েকটি কবিতায় এই গোলযোগের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। ১৮৫৬ সালের ৭ই ডিসেম্বর (বাংলা ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১২৬৩) তারিখে কলকাতায় প্রথম বিধবাবিবাহ সংঘটিত হয়। এই বিবাহের পাত্র ছিলেন পণ্ডিত রামধন তর্কবাগীশের পুত্র পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং পাত্রী ছিলেন নদীয়ার রাজার কুলগুরু পরিবারের ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ১০ বৎসরের বিধবা কন্যা কালীমতী দেবী। বিবাহের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার এবং বিবাহের অনুষ্ঠান হয়েছিল বাবু রামগোপাল ঘোষের ভবনে। বিবাহ-সভায় উপস্থিত পণ্ডিতদের মধ্যে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর পরের দিনই পাণিহাটি নিবাসী মধুসূদন ঘোষের সঙ্গে কলকাতা নিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রের ১২ বৎসরের বিধবা কন্যার বিবাহ হয়। এর কয়েকমাস পরে বিদ্যাসাগর-সুহৃৎ রাজনারায়ণ বসুর পিতৃব্যপুত্র দুর্গানারায়ণ বসু ও সহোদর মদনমোহন বসু বিধবা বিবাহ করেন। এই ব্যাপারে মেদিনীপুর হিন্দুসমাজে বিরাট চাঞ্চল্য দেখা দেয় ও রাজনারায়ণ বসুকে যথেষ্ট বিপদে পড়তে হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণকে এই ব্যাপারে সহানুভূতি জানিয়ে চিঠি

লেখেন। এর কিছুদিন পরে বরিশালের প্রসিদ্ধ উকিল বাবু দুর্গামোহন দাশ নিজের বিধবা বিমাতার বিবাহ দেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হ'ন। বিধবাবিবাহের ব্যাপারে লিপ্ত হয়ে বিদ্যাসাগরকে নানা বিপদে পড়তে হয়েছিল। আন্দোলনের সূচনা হতে কলকাতায় কেউ কেউ গোপনে তাঁকে হত্যা করবার চেষ্টা পর্যন্ত করেছিল। একসময়ে অবস্থা এমন হয় যে বিদ্যাসাগরকে সবসময়ে পথে রক্ষীপরিবৃত হয়ে চলতে হত। প্রচুর অর্থব্যয়ের ফলে তিনি একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েন। ঠিক এই সময়েই দেশে সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা হওয়ায় অনেকে জনরব তোলেন যে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের ফলেই দেশে এই বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলা ১২৬৪ সালের 'বর্ষবিদায়' কবিতায় এই বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বিদ্রোহের গোলযোগ ধীরে ধীরে প্রশমিত হবার পর আবার বিধবাবিবাহ একে একে হতে আরম্ভ করে। বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন করে বিদ্যাসাগরের যে বিরাট আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল, তাঁর পরম সুহৃৎ প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী ও তাঁর ভ্রাতারা কিছু পরিমাণে তা পূরণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরকে প্রথমে যাঁরা সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পরে তাঁদের অনেকেই সরে দাঁড়ান। বিধবাবিবাহের আনুকূল্য করবার ভানে অর্থলোভে অনেকে বহু বিবাহ করতে আরম্ভ করে। বিদ্যাসাগর এর প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করেন। বিধবাবিবাহকারীদের তিনি এক অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করাতে থাকেন, যাতে বলা হয় যে বিবাহিতা পত্নীর জীবদ্দশায় স্বাক্ষর-কারীরা দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারবেন না। বাংলা ১২৭৭ সালের ২৭শে শ্রাবণ তারিখে বিদ্যাসাগরের পুত্র নারায়ণচন্দ্র স্বয়ং ১১ বৎসরের এক বিধবার পাণিগ্রহণ করেন এবং এর জন্য বিদ্যাসাগরকে আবার নতুন করে বিপদে পড়তে হয়।

বিদ্যাসাগরের এত চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর এই আন্দোলন বিশেষ সফল হয়েছিল বলা যায় না। আইন প্রণয়ন করে বিধবাবিবাহকে বৈধ ঘোষণা করলেও হিন্দুসমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকদের মধ্যে বিধবাবিবাহ আজও তেমন আদৃত হয় নি এবং এরূপ বিবাহ কোথাও ঘটলে সমাজে আজও

তা আলোচনার বিষয় হয়ে থাকে। বিদ্যাসাগরের পরেও অনেক সমাজ-সংস্কারক বিধবাবিবাহকে সমাজে প্রচলিত করবার চেষ্টা করেছেন। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত আর্য্যসমাজ পাঞ্জাবে এই কাজে উৎসাহ দেখিয়েছেন। বাংলাদেশে ব্রাহ্মসমাজও এই ব্যাপারে যথেষ্ট তৎপরতা দেখান। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন বিধবাবিবাহ আন্দোলনের পরিচালনায় ভার গ্রহণ করেন এবং ১৮৬৪ সালে ব্রাহ্মসমাজে প্রথম বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৮২ সালে অনুষ্ঠিত ১৩টি ব্রাহ্মবিবাহের মধ্যে ৫টিই ছিল বিধবাবিবাহ। বরাহনগরের বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন এবং ১৮৬৭ সালে তাঁর চেষ্টাতেই হিন্দু বিধবাদের জন্য একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়। মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর হিন্দু বিধবাদের সাহায্যকল্পে ১ লক্ষ টাকা দান করেন এবং বাংলা সরকারও বিধবাদের শিক্ষা দানের জন্য কিছু আর্থিক বরাদ্দের ব্যবস্থা করেন। দাক্ষিণাত্যেও মারাঠা দেশে বিষ্ণু পরশুরাম শাস্ত্রী বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। ১৮৬৬ সালে বোম্বাই শহরে Widow Marriage Associationএর প্রতিষ্ঠা হয় এবং এই বৎসরই দাক্ষিণাত্যে আধুনিক কালের দ্বিতীয় বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৮৪ সালে বেহরামজী মালাবারী নামে এক পার্শী ভদ্রলোক বিধবাবিবাহকে সমাজে ব্যাপক-ভাবে প্রচলিত করবার জন্য নূতন একটি আইন প্রণয়নের চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। কিন্তু এই সব চেষ্টা সত্ত্বেও সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে একশত বিধবাবিবাহ হয়েছিল কি না সন্দেহ। বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের এই ব্যর্থতার প্রধান কারণ যে আমাদের সমাজের স্থিতি-শীলতা ও কুসংস্কারের প্রাবল্য তা অস্বীকার করা যায় না। বিদ্যাসাগরের উপযুক্ত উত্তরসাধকও আমাদের দেশে আর আবির্ভূত হয় নি। আন্দোলনের তৎকালীন নেতাদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করেছিলেন। এছাড়া নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে বাল্যবিবাহ প্রথা আমাদের দেশ থেকে বর্তমানে প্রায় উঠে গেছে। সুতরাং বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের পশ্চাতে যে প্রধান যুক্তিটি ছিল তাই

আজ অনুপস্থিত। অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে মধ্যবিত্ত সমাজে আজ অবিবাহিতা কন্যার বিবাহই সমস্যার বিষয় হয়ে উঠেছে, বিধবাবিবাহের কথা চিন্তা করবার অবকাশও লোকে আজ পায় না। অবশ্য একেবারে আধুনিক কালে বিধবাবিবাহ বিষয়ে দেশবাসীর মনোভাব কিছুটা উদার হয়েছে সন্দেহ নেই এবং ভবিষ্যতে সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে বিধবা-বিবাহের আরো প্রচলন হবে বলে মনে হয়। বিদ্যাসাগরের আন্দোলন সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করেনি সত্য, কিন্তু এই আন্দোলনের পশ্চাতে তাঁর যে ঔদার্য্য, দৃঢ়চিত্ততা এবং প্রগতিশীল আধুনিক মনের পরিচয় আমরা পাই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে আজও তা আমাদের অভিভূত করে।

গ্রন্থপঞ্জী

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮৯৫)

বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী—সমাজ (সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ, ১৩৪৫ সন)

দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত (১৯৩২)

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, বিদ্যাসাগর জীবনচরিত (১২৯৮ সন)

রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত (১৯০৮)

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মা ও ছেলে (১৮৮৭)

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড (১৩৫৬ সন)

J. Muir (Ed.) *Original Sanskrit Texts* 5 Vols. (1868-73), Vol. V has been used here.

C. Y. Chintamani (Ed.) *Indian Social Reform*, Part I

L. Wilkinson, *An Introduction To An Essay On The Second Marriage Of Widows* (1841)

W. Crooke, *The North-Western Provinces Of India* (1897)

G. Campbell, *Memoirs Of My Indian Career*, Vol. I (1893)

Marriage Of Hindu Widows, published by the Pathare Reform Association, Bombay. (1869)

P. N. Bose, *A History of Hindu Civilization During British Rule In India*, Vol. II (1894)

S. Tattvabhushan, *Social Reform In Bengal* (1904)

Rammohun Roy, *Brief Remarks Regarding Modern Encroachments On The Ancient Rights of Females* (1822)

J. Chailley, *Administrative Problems of British India* (1910)

K. K. Datta, *Education And Social Amelioration of Women In Pre-Mutiny India* (1936)

The Calcutta Review, 1855, Vol. XXV, Article on "Marriage of Hindu Widow".

উনিশ শতকের বাংলায় চড়ক পূজা

"কলিকাতা শহরের চার দিকেই ঢাকের বাজনা শোনা যাচ্চে, চড়কীর পিঠ সড়্‌সড়্‌ কচ্চে; কামারেরা বাণ, দশলকি, কাঁটা ও বঁটি প্রস্তুত কচ্চে; সর্বাঙ্গে গয়না, পায়ে নূপুর, মাতায় জরির টুপি, কোমোরে চন্দ্রহার, সিপাই পেড়ে ঢাকাই শাড়ি মালকোচা করে পরা, তারকেশ্বরে ছোবানো গামছা হাতে, বিল্বপত্র বাঁদা সূতা গলায় যত ছুতোর, গয়লা, গন্ধবেণে ও কাঁসারীর আনন্দের সীমা নাই—'আমাদের বাবুদের বাড়ির গাজোন!'···এদিকে ঢুলে, বেয়ারা হাড়ি ও কাওরারা নূপুর পায়ে উত্তরি সূতা গলায় দিয়ে নিজ নিজ বীরব্রতের ও মহত্বের স্তম্ভস্বরূপ বাণ ও দশলকি হাতে করে·· ঢাকের সঙ্গতে নেচে বেড়াচ্চে, ঢাকীরা ঢাকের টোয়েতে চামর, পাখির পালক, ঘণ্টা ও ঘুঙুর বেঁধে পাড়ায় ঢাক বাজিয়ে সন্ন্যাসী সংগ্রহ কচ্চে; গুরুমশায়ের পাঠশালা বন্দ হয়ে গিয়েচে —ছেলেরা গাজনতলাই বাড়ি করে তুলেচে; আহার নাই, নিদ্রা নাই; ঢাকের পেচোনে পেচোনে রপ্টে রপ্টে ব্যাড়াচ্চে; কখন 'বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো মহাদেব' চীৎকারের সঙ্গে যোগ দিচ্চে, কখন ঢাকের টোয়ের চামর ছিঁড়ছে, কখন ঢাকের পেছনটা দুম্‌দুম্‌ করে বাজাচ্চে—বাপ মা শশব্যস্ত, একটা না ব্যয়রাম কল্লে হয়।"—হুতোম প্যাঁচা তাঁর 'নক্শা'য় প্রায় একশ' বছর আগে কলকাতায় চড়ক-পার্বণের বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে। কিন্তু আজ চড়ক পূজার চেয়ে বিশ্বকর্মা পুজার ধূমই অনেক বেশি, অন্য পূজার তো কথাই নেই। অতি আধুনিক যন্ত্রযুগকে সহ্য করতে না পেরে একান্তই গ্রাম্য এই চড়ক পার্বণ আজ মহানগরীর সীমা হতে প্রায় নির্বাসিত হতে চলেছে। হুতোমের যুগে চড়ক পূজা কিন্তু কেবল আনন্দের ব্যাপারই ছিল না; এর সঙ্গে অনেক বীভৎস এবং ঘৃণ্য প্রথাও জড়িত ছিল, যা সে যুগের অন্তত একদল সমাজ সংস্কারককে বেশ ভাবিয়ে তুলেছিল; এবং যে বিদেশী সরকার হিন্দুর সামাজিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সেযুগে বড় একটা

হস্তক্ষেপ করতে চাইতেন না, তাঁরাও এই ব্যাপারে একেবারে নিরপেক্ষ হয়ে থাকতে পারেন নি। প্রধানত সেই সব কাহিনী আলোচনা করার জন্যই আমার এই প্রবন্ধ।

ধর্মপূজার মতই চড়কপূজা "মূলতঃ অবৈদিক, অস্মার্ত, অপৌরাণিক ও অব্রাহ্মণ্য"—'বাঙালীর ইতিহাস'-এর লেখকের এই অভিমত বহুলাংশে সত্য হলেও বোধহয় সম্পূর্ণ সত্য নয়। চড়ক পূজা যে অবৈদিক সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু বর্তমান যুগে হিন্দুর অধিকাংশ পূজা-পার্বণই তাই। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ অপৌরাণিক কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। মহাভারতে বাণরাজার কাহিনী থেকে জানা যায় যে মহাদেবের দর্শনলাভের জন্য বাণ রাজা নিজের শরীরের উপর নানারকম অত্যাচার করেছিলেন, যে ধরনের অত্যাচার মহাদেবের কৃপা লাভের জন্য চড়কের সন্ন্যাসীরা আজও করে থাকেন। তবে চড়ক পূজার ধারাটি যে মূলত অনার্য এবং বর্ণহিন্দু সমাজে যে এটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে স্বীকৃতি লাভ করেছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। নীল বা চড়কপূজার কেন্দ্র যে শিবলিঙ্গ তার প্রচলিত নাম হচ্ছে 'বুড়ো শিব', এবং এই বুড়ো শিবের যাঁরা পূজারী সেই আচার্য ব্রাহ্মণ বা গ্রহবিপ্রেরা যে স্মার্ত মত অনুসারে পতিত এ কথা কারো অজানা নয়। কুমিরের পূজা, জলন্ত আগুনের উপর দোলা, কাঁটাঝাঁপ, ছুরিঝাঁপ, বাণফোঁড়া, আগুন নিয়ে নাচা, চড়ক গাছে দোলা, শিবের বিয়ে, 'দানো বারাণো' এইসব হচ্ছে চড়কপূজার বিশেষ বিশেষ অঙ্গ। এদের মধ্যে 'দানো বারাণো'র স্থান সাধারণত শ্মশান এবং এই অনুষ্ঠানটির সঙ্গেই চড়কের সঙ্ জড়িত। চড়কের সন্ন্যাসীরা হয় সাধারণত দুলে, বাগদী, হাড়ি, কাওরা ইত্যাদি জাতের, যাদের হাতের জল আজও বর্ণহিন্দু সমাজে অচল। সামাজিক জনতত্ত্বের পণ্ডিতেরা বলেন যে ধর্মপূজা এবং চড়কপূজা দুটিই নাকি আদিম সমাজে প্রেততত্ত্ব ও পুনর্জন্মে বিশ্বাস থেকে এসেছে, এবং প্রত্যেক গোষ্ঠীর মৃতব্যক্তিদের পুনর্জন্ম কামনা করেই নাকি এই দুই পূজার অনুষ্ঠান করা হত। তাছাড়া চড়কের সময় বাণফোঁড়া, কাঁটাঝাঁপ, ছুরিঝাঁপ প্রভৃতি দৈহিক যন্ত্রণা গ্রহণ বা

রক্তপাতের যে সব অনুষ্ঠান করা হয় তাদের পেছনেও বোধহয় আদিম সমাজের নরবলি প্রথার স্মৃতি রয়েছে। উনিশ শতকের শেষের দিকে যখন চড়কের বীভৎস অনুষ্ঠানগুলি সরকারী চেষ্টায় বন্ধ করে দেওয়া হয় তখন বীরভূম জেলার কোনো কোনো অঞ্চলের নিম্নবর্ণের চাষীরা কর্তৃপক্ষের কাছে এই বলে অভিযোগ জানিয়েছিল যে এর ফলে তাদের চাষের কাজে খুব ক্ষতি হবে, কারণ মাটিতে কিছুটা নররক্ত না পড়লে আশানুরূপ ফসল নাকি পাওয়া অসম্ভব! আজকের মত একশ' বছর আগেও বর্ণহিন্দুরা চড়কপূজায় প্রত্যক্ষভাবে কোনো অংশ গ্রহণ করত না। রেভারেণ্ড আলেকজাণ্ডার ডাফ্ তাঁর *India And India Missions* (Edinburgh, 1839) বই-এ লিখেছেন, "It is proper to state that Brahmins, Kshatriyas and Vaisyas do not take any active part in the actual celebration of the rites peculiar to this festival. Most of them, however, contribute largely towards the expense of it, and countenance the whole of the proceedings as applauding spectators." (pp. 246-265) ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মে তারিখের Calcutta Journal পত্রিকাতেও আমরা এই উক্তির সমর্থন পাই: "No Hindoo of respectability ever degrades himself by swinging, no Brahman, no one of the medical tribe, and none among the Kaistha or writer caste, except the most abandoned... (p. 626)" চড়কপূজার কৌলীন্যহীনতা সম্পর্কে এর পর আর কোনো কথা চলে না।

হুতোমের যুগে বা তারও কিছু আগে বাঙলাদেশে চড়ক-পার্বণের বর্ণনা পাওয়া যায় সে সময়কার সংবাদপত্রগুলির মধ্যে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' থেকে দু-একটি বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করা হল। চড়ক পূজার সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেসব বীভৎস ও ঘৃণ্য ব্যাপার জড়িত থাকত তাদেরও কিছু কিছু পরিচয় এই সব প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় পাওয়া যায়। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল

তারিখে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা লিখছেন: "গত সন্ন্যাসবিষয়ক নীলোৎসব দর্শন করিয়া তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ উক্তি করাতে পাঠকগণের সন্তোষ জন্মিতে পারে যেহেতুক চড়কপূজার বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের বিশেষ মনোযোগ প্রার্থনা করা গিয়াছিল।...চিৎপুরের রাস্তায় অসংখ্যক ঢাকের মহাশব্দ এবং রাস্তার উভয়পার্শ্বের বাটীর বারান্দার উপর লোকের মহা কোলাহল হয়। সন্ন্যাসির দল সকল বাণ প্রভৃতি ফুঁড়িয়া বাদ্যসহিত আসিল এই সকল ব্যাপার বেলা ৯ ঘণ্টা পর্য্যন্ত দেখা যায়, পরে তামাসা যাহা দর্শনার্থে অনেক লোক জমা হয় তাহা ক্রমে কম হইয়া আসিতে লাগিল। বাঁশ, বাঁকারি ও কাগজমণ্ডিত একটা পাহাড় নির্মিত হইয়া নীল ও রক্তবর্ণের রং করা গিয়াছিল তদুপরি একটা প্রকাণ্ড মন্দির, তন্মধ্যস্থিত কাগজে নির্মিত হিন্দুর দেবতারা ইহাই দেখিয়া প্রথমে দর্শকগণেরা চমৎকার ভাবিলেন!...তৎপরে একখানা ময়ুরপঙ্খী দেখা গেল তাহা বাঁশ বাঁকারির দ্বারা নির্ম্মাণ হয়...তাহার উপর কএকজন লোকেতে গানবাদ্য করত দাঁড় ফেলিতেছিল, তাহা একটা পাঠশালার ন্যায় কিন্তু বালকের নহে সেটা প্রকাণ্ড মনুষ্যের বিদ্যালয় ইহার গুরুমশায় ছাত্রগণের মূর্খতা দেখিয়া লজ্জিত হইয়া কহিলেন আমি ইহাদিগকে আর মারিয়া সোজা করিতে পারি না।...পরে গোদযুক্ত একটা বৃদ্ধ পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা শরীর আবৃত করত দেবতাতুল্য হইবায় অন্য একজন তাহার গোদপূজা করিতেছিল এবং সং দেখিয়া বড়ই হাসির ধুম পড়িল কিন্তু দেবপূজা করেন যে হিন্দু তিনি কিরূপে গোদপূজা করিলেন তাহা আমরা বলিতে পারি না।" হুতোম প্যাঁচার নক্শাতেও চিৎপুরের রাস্তায় চড়কের সঙের সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়।..."প্রথমে তুটো মুটে একটা বড় পেতলের পেটা ঘড়ি বাঁশে বেঁদে কাঁদে করেচে—কতকগুলো ছেলে মুগুরের বাড়ি বাজাতে বাজাতে চলেচে—তার পেচোনে এলোমেলো নিশেনের শ্রেণী। মধ্যে হাড়িরা দল বেঁদে ঢোলের সঙ্গতে...ভজন গাইতে গাইতে চলেচে। তার পেচোনে বাবুর অবস্থামত তকমাওয়ালা দরওয়ান, হরকরা সেপাই, মধ্যে সর্ব্বাঙ্গে ছাই ও খড়ি মাখা, টিনের সাপের ফণার টুপি মাথায় শিব ও পার্বতী সাজা সং। তার পেচোনে কতকগুলো সন্ন্যাসী দশলকি ফুঁড়ে চলেচে।

দর্শকেরা হাঁ করে গাজন দেখচেন, মধ্যে বাজনার শব্দে ঘোড়া খেপেচে—হুড়মুড় করে কেউ দোকানে কেউ খানার উপর পড়চেন, রৌদ্রে মাথা ফেটে যাচ্চে—তথাপি নড়চেন না।” বিশপ হেবারের ভ্রমণ-কাহিনীতেও চৌরঙ্গীর রাস্তায় চড়কের সন্ন্যাসীদের শোভাযাত্রার এক সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। হেবার এদেশের লোকেদের শান্তিপ্রিয় মনোভাবের প্রশংসা করে লিখেছেন যে ইংলণ্ডে যদি কখনো এত লোক একসঙ্গে জমায়েত হত, তাহলে আধঘণ্টার মধ্যে তিনবার মুষ্টিযুদ্ধ দেখা যেত এবং ইটালিতে এরকম ঘটলে রাত্রি আরম্ভ হবার আগেই অন্তত ছয়টি খুনজখম হয়ে যেত। চড়কের সময় কলকাতায় যে সব সঙ বার হত তার মধ্যে উত্তরে জেলে পাড়ার সঙ ও দক্ষিণে কালিঘাটের সঙ সেযুগে বিখ্যাত ছিল। অনেক ক্ষেত্রে এই সব সঙের সন্ন্যাসীরা যে নির্দোষ আমোদের সীমা লঙ্ঘন করত তার প্রমাণও সে যুগের কাগজে পাওয়া যায়। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিল তারিখে ‘সমাচার দর্পণ’ লিখছেন,—“চড়ক পূজার সময়ে সন্ন্যাসিদের মধ্যে কেহ কেহ সঙ হইয়া পথেতে এমত কদর্যরূপে নৃত্যাদি করে যে তাহা দর্শন করিতে ভদ্রলোকেরদের অতিশয় লজ্জা হয় অতএব তাহার বিবরণ হইতে কলিকাতাস্থ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব লোকেরা নিশ্চয় করিয়াছেন এবং গত চড়ক পূজার সময় এইরূপ অতি নির্লজ্জ তিন-চারিজন সন্ন্যাসীকে পুলিশে ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন ইহার পর এমত কর্ম্ম যে তাহারা কিম্বা অন্য লোক শহরের মধ্যে আর না করে এই নিমিত্ত তাহারদের শাস্তি হইবেক।” ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল তারিখের ‘সমাচার দর্পণে’ও দু’জন ভণ্ড সন্ন্যাসীর কুৎসিত সঙ সাজার অপরাধে কিছুদিন কারাভোগ হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়।

সঙ ছাড়া চড়ক-পূজার আর দুটি প্রধান অঙ্গ ছিল কাঁটাঝাঁপ ও চড়কগাছে দোলা। হুতোম প্যাঁচার নক্‌শায় কাঁটাঝাঁপের হাস্যকর বর্ণনা পাওয়া যায়: “সন্ন্যাসীরা নাচ্‌তে নাচ্‌তে কাছের পুকুর থেকে পরশুদিনের ফ্যালা কতকগুলি বঁইচির ডাল তুলে আন্‌লে। গাছতলায় বিশ আঁটি বিচালি বিছানো ছিল, কাঁটার ডালগুলো তার উপর রেখে বেতের বাড়ি ঠ্যাঙ্গান হলো, ক্রমে সব কাঁটাগুলি মুখে মুখে বসে গেলে

পর পুরুত তার উপর গঙ্গাজল ছড়িয়ে দিলেন, দুজন সন্ন্যাসী ডবল গামছা বেঁধে তার দু-দিকে টানা ধল্লে,—সন্ন্যাসীরা ক্রমান্বয়ে তার উপর ঝাঁপ খেয়ে পড়তে লাগলো; 'উঃ শিবের কি মাহাত্ম্য' কাঁটা ফুটলে বলবার যো নাই!...ক্রমে সকলের ঝাঁপ খাওয়া ফুরুলো; একজন আপনার বিক্রম জানাবার জন্য চিৎ হয়ে উল্‌টো ঝাঁপ খেলে, সজোরে ঢাক বেজে উঠ্‌লো।" আর একরকম ঝুল সন্ন্যাসের বর্ণনাও হুতোমের বইতে পাওয়া যায়: "ক্রমে সন্ন্যাসীরা খড়ে আগুন জ্বেলে ভারার নিচে ধল্লে—এক-জনকে তার ভারার নিচে ধল্লে—একজনকে তার উপর পানে পা করে ঝুলিয়ে দিয়ে তার মুখের কাছে আগুনের উপর গুড় ধুনো ফেলতে লাগলো, ক্রমে একে একে ঐরকম করে তুল্লে ঝুল সন্ন্যাস সমাপন হলো···।" কাঁটা-ঝাঁপ বা ঝুল সন্ন্যাসের চেয়েও আরো মারাত্মক ছিল চড়ক গাছে দোল খাওয়ার ব্যবস্থা। ১৮৩৭ খ্রীঃ ২২শে এপ্রিল তারিখে 'সমাচার দর্পণ' সংবাদ দিচ্ছেন,—"চড়ক পূজার অতি ঘৃণ্য ব্যবহার ১২ তারিখে দৃষ্ট হইল। ঐ দিবসীয় অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা সময়ে দক্ষিণ ইণ্টালির রাস্তার পশ্চিম দিগ্‌বর্ত্তি প্রথম গলির মধ্যে রাধাকান্ত মুন্সী নামক এক ব্যক্তির ভুমিতে চড়কগাছ প্রোথিত হইয়াছিল তৎসময়ে ঐ স্থান সমূহ সর্ব্বজাতীয় দিদৃক্ষুলোকেতে পরিপূর্ণ হইয়া অতি যুব এক ব্যক্তিকে পাখ খাইতে দেখিতেছিল এবং তৎকালে ঐ মুন্সীর চাকর-বাকর ও অন্যান্য অত্যন্ত কলরব করিতেছিল কিন্তু যে রজ্জুতে সন্ন্যাসী ঘুরিতেছিল তাহা দৈবাৎ ছিঁড়ে যাওয়াতে ঐ ব্যক্তি বেগে গিয়া ২০ হাত দূরে পড়িল, তারে উঠাইয়া দেখা গেল শরীরটা একেবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে মুখখানা পিণ্ডাকার প্রায় কোন অঙ্গ অবিকল ছিল না।" ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মে তারিখের 'সমাচার দর্পণে' চুঁচূড়া থেকে জনৈক পত্রলেখক কয়েক-জন সন্ন্যাসীর চড়কঘোরার ফলে মৃতপ্রায় হওয়ার সংবাদ দিয়েছেন। ১৮১৪ সালে শ্রীরামপুরের চড়কেও একজন সন্ন্যাসীর মৃত্যু-বরণের সংবাদ আমরা জর্জ স্মিথ রচিত উইলিয়ম কেরীর জীবনীতে পাই। উন্মত্ত অবস্থায় ছাড়া সন্ন্যাসীদের পক্ষে এতটা দৈহিক যন্ত্রণা সহ্য করা কখনই সম্ভবপর ছিল না এবং বলা বাহুল্য এসব অনুষ্ঠানের সময় সন্ন্যাসীরা

প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করতে সঙ্কোচ করত না। বিশপ হেবার তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীতে লিখেছেন যে সন্ন্যাসীরা শরীরে বাণ ফোঁড়ার আগে যন্ত্রণাবোধ কমাবার জন্য প্রায়ই কিছুটা আফিঙ্‌ খেয়ে নিত, যদিও তাতে শেষ পর্যন্ত দুর্ঘটনা রোধ করা সম্ভবপর হত না। স্বভাবতই উন্মত্ত অবস্থার জন্য তারা কখনো শ্লীলতার মাত্রা ছাড়িয়ে যেত। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল তারিখের *Calcutta Journal*-এ (p. 205) এক হিন্দু সহিস এবং এক পর্তুগীজ ক্রীশ্চান মহিলার একত্র চড়ক ঘোরার কাহিনী পাওয়া যায়। সংবাদদাতা জানাচ্ছেন যে অনুমান ত্রিশ হাজার লোক ঐ দৃশ্য দেখবার জন্য সমবেত হয়েছিলেন। সেযুগের সাধারণ লোকের রুচি যে এসব দৃশ্য দেখার বিরোধী ছিল না তা বলাই বাহুল্য।

আগেই বলা হয়েছে যে, সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা—ডুলে, বাগ্দী, হাড়ি, কাওরা ইত্যাদি সাধারণত চড়কের পূজারী হত। কিন্তু এ থেকে যদি মনে করা হয় উচ্চ শ্রেণীর বর্ণহিন্দুদের এ পূজার সঙ্গে কোনো সংশ্রব ছিল না তাহলে বিরাট ভুল করা হবে। হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা পড়ে মনে হয় যে সেযুগের কলকাতার বাবুরা, বিশেষত ভুঁইফোড়ের দল এক-একটি করে চড়কের দল রাখতেন নিজেদের মর্যাদাবৃদ্ধির জন্যে। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল তারিখের 'সমাচার দর্পণে' কালীঘাট মন্দিরের জনৈক পূজারী লিখেছেন,—"সন্ন্যাস ছোটলোক করে যথার্থ কিন্তু এই ছোটলোকের মধ্যে শিবালয় কাহার আছে গাজন কতক জনা উঠাইয়া থাকে সমস্ত ভাগ্যবান ভদ্রলোক গাজন করেন খরচপত্র নিজে দেন তথায় ছোটলোক গিয়ে কেহ বা মানত করে কেহ বা আহ্লাদ কারণ চড়ক ইত্যাদি সন্ন্যাস করে অতএব যদ্যপি ঐ গাজনওয়ালা মহাশয়েরা গাজন না উঠান চড়ক গাছ না পুতেন তবে ছোটলোক কোথায় চড়কগাছ পায় যে চড়ক করে।" ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মে তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' (পৃঃ ৪) সুখচরনিবাসী জনৈক রামকমল মজুমদারের পত্রেও চড়কের ব্যাপারে ধনী ব্যক্তিদের আনুকূল্যের কথা বলা হয়েছে। পত্রলেখক চড়ক বন্ধ করার জন্য সরকারের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের (মাসিক) *Friend*

of India পত্রিকায় (পৃঃ ১৩৯-১৪৩) এ বিষয়ে একটি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাতে লেখক অভিযোগ করেছেন যে ধনী লোকেরা, বিশেষত জমিদারেরা তাঁদের নিম্নশ্রেণীর প্রজাদের উপর জোর-জুলুম করেন, এমন কি অনেক সময় বাড়ি চড়াও হয়ে তাদের চড়কের সন্ন্যাস নিতে বাধ্য করেন। কোনো জমিদারের এলাকায় ক'টি চড়কের বাড়ি বাঁধা হয়েছে এবং কজন লোক সন্ন্যাস নিয়েছে তা থেকে জমিদারের সামাজিক মর্যাদা মাপ করা হয়। সন্ন্যাসের কয়দিন (অর্থাৎ চৈত্রসংক্রান্তির আগের দশ-পনের দিন) জমিদারই সন্ন্যাসীদের সমস্ত খরচ দেন, কারণ এ কাজ নাকি বিশেষ পুণ্যের। সন্ন্যাসীদের কষ্টের মাত্রা কমাবার জন্য ও তাদের লোভ দেখাবার জন্য মদিরা ও বারবনিতার সাহায্যও গ্রহণ করা হত। অবশ্য *Friend of India* সেযুগের পাদ্রীদের কাগজ, এই অভিযোগের সবটুকু সত্য কিনা বলা কঠিন। তবে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মে তারিখের *Calcutta Journal*-এও (p. 627) গ্রামের জমিদারদের বিরুদ্ধে ঠিক এই অভিযোগ করা হয়েছে, এবং খুব সম্ভব এর মধ্যে কিছুটা সত্য রয়েছে। ১৮১৪ সালে শ্রীরামপুরের পাদ্রীরা বিলেতে যে কার্যবিবরণী পাঠিয়েছিলেন তাতেও তাঁরা বলেছেন যে চড়কের সময়ে নিম্ন শ্রেণীর দরিদ্র লোকেরা জমিদারদের অত্যাচারের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে কিছুদিন লুকিয়ে থাকত, এবং কোনোক্রমে ধরা পড়লে তাদের ভাগ্যে জুটত প্রচুর প্রহার ও লাঞ্ছনা। শ্রীরামপুরের ছাপাখানার কয়েকজন কর্মী ঐ বৎসর (১৮১৪) জমিদারদের জুলুমের ভয়ে পাদ্রী ওয়ার্ডের কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। *Friend of India*-র মতে সারা বাঙলা দেশে অন্তত পঞ্চাশ হাজার লোক প্রত্যেক বৎসর চড়কের সন্ন্যাস গ্রহণ করত। কলকাতার বাইরে চড়ক ও গাজনের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল তারকেশ্বরে. তবে বাংলা দেশের প্রায় সর্বত্রই এই দুই অনুষ্ঠান হত। বিনয় সরকার মহাশয় তাঁর *The Folk Element In Hindu Culture* বইএ (Chap IV) লিখেছেন যে নীলপূজার দিন সকালে যে সব অনুষ্ঠান হত তাতে শুধু হিন্দু নয় মুসলমানেরাও যোগদান করত। সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দু'চারজন সন্ন্যাসিনীও যে এসব অনুষ্ঠানে

যোগ দিত তার সাক্ষ্যও সে যুগের সংবাদপত্রে এবং পাদ্রীদের লেখায় পাওয়া যায়।

চড়কপূজার সঙ্গে যে সকল বীভৎস ও ঘৃণ্য অনুষ্ঠান জড়িত ছিল সেগুলি দূর করার জন্য উনিশ শতকের মাঝামাঝি বাংলা দেশে একটা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল এবং সরকারও এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে এগিয়ে আসেন। সেযুগের সংবাদপত্রগুলিতে এবং Buckland সাহেবের **Bengal Under the Lieutenant Governors** বই-এ এই আন্দোলনের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে Reformer কাগজে জনৈক লেখক চড়কপূজা বন্ধ করার জন্য সরকারী আদেশ প্রচারিত হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন। এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ঐ বৎসর ৩০শে এপ্রিল তারিখের 'সমাচার দর্পণে' কালীঘাট মন্দিরের কোনো পূজারী এক বিবৃতি পাঠান। এই বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, চড়কের মত পালাপার্বণে তাঁর মত অনেক পূজারীর অন্নসংস্থান হয়, সুতরাং এই সব অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিলে তাঁদের খুবই অসুবিধা হবে। তাছাড়া তাঁর মতে কোনো দেশাচার বন্ধ করা প্রয়োজন মনে হলে আগে সে-বিষয়ে দেশবাসীর একমত হওয়া উচিত, মতৈক্য না থাকলে এ বিষয়ে সরকারী সাহায্য প্রার্থনা করা সঙ্গত হবে না। চড়কপূজায় প্রধানত নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা অংশ গ্রহণ করলেও এ ব্যাপারে ভদ্রলোকেরা যে যথেষ্ট উৎসাহ দেন সেকথাও এই বিবৃতিতে মনে করিয়ে দেওয়া হয়। ১৮৩৩ সালের ২০শে এপ্রিল তারিখে রক্ষণশীল দলের মুখপত্র 'সমাচার চন্দ্রিকায়' চড়কের বিরোধী দলকে 'ধর্মদ্বেষী' বলে অভিহিত করা হয় এবং সরকার এই দলের অনুরোধে কর্ণপাত না করায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। ১৮৩৮ সালের ১২ই মে তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত এক পত্রে চুঁচুড়াবাসী জনৈক ভদ্রলোক লেখেন,—"অস্মদাদির মানস ঐ প্রব্রজ্যা এককালীন প্রশমন না করিয়া তাহার আর ২ তামাসা ও পূজা প্রভৃতি বজায় রাখিয়া কেবল বাণফোঁড়া ও চড়কমাত্র রহিত আজ্ঞা করেন।" ১৮৩৯ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট চৌরঙ্গীর রাস্তায় সন্ন্যাসীদের শোভাযাত্রা বন্ধ করার জন্য

যে আদেশ প্রচার করেন তার এক অনুলিপি 'সমাচার দর্পণে'র ৬ই এপ্রিল সংখ্যায় পাওয়া যায়। বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হওয়ার আগেই সরকারের অভিপ্রায় জানতে পেরে Commercial Advertiser পত্রিকা আনন্দ প্রকাশ করেন।

১৮৫৬-৫৭ সালে ভারত সরকার ও বিলাতের কর্তৃপক্ষের মধ্যে চড়কপূজা সম্পর্কে কিছু মতামত বিনিময় হয়। কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স ভারত সরকারকে নির্দেশ দেন যে চড়কপূজার মধ্যে যে সব যন্ত্রণাদায়ক অনুষ্ঠান থাকে সেগুলি সন্ন্যাসীরা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন না বলে সরকার যদি মনে করেন তাহলে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। এই নির্দেশ পাবার পর বাংলার লাট হ্যালিডে সাহেব চড়কপূজার সম্পর্কে এক সরকারী তদন্তের আদেশ দেন। কিন্তু তদন্তের ফল প্রকাশিত হওয়ার আগেই কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স আবার লিখে পাঠান যে এ ব্যাপারে কোনো সংস্কার প্রয়োজন হলে আইনের সাহায্য না নিয়ে সরকারের পরোক্ষ প্রভাবের সাহায্যেই তা করা উচিত হবে। ঠিক এই সময় Calcutta Missionary Conference-এর পক্ষ থেকে সরকারের কাছে চড়কের বীভৎস এবং যন্ত্রণাদায়ক অনুষ্ঠানগুলি আইনের সাহায্যে বন্ধ করার জন্য এক আবেদন পেশ করা হয়। হ্যালিডে সাহেব শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে আসেন যে চড়কের অনুষ্ঠানগুলি যেহেতু বাধ্যতামূলক নয়, অতএব শিক্ষার বিস্তার এবং মিশনারীদের প্রচারের সাহায্যেই এগুলি বন্ধ করতে হবে, এর জন্যে আইন প্রণয়ন করা সঙ্গত হবে না। হ্যালিডের পর সার জন গ্রাণ্ট্ বাংলাদেশের শাসনকর্তা হয়ে আসেন (১৮৫৯)। Calcutta Missionary Conference-এর পক্ষ থেকে দ্বিতীয়বার লাট-সাহেবের আইনসভার কাছে চড়কঘোরা বন্ধ করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে এক আবেদনপত্র পেশ করা হয়। লাটসাহেব এই আবেদনপত্রটি বিলাতের কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেন। কর্তৃপক্ষ তখন নির্দেশ দেন যে পরোক্ষভাবে জনমত গঠন করে এবং সরকারের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে বিরূপ মনোভাবের পরিচয় দিয়ে চড়কের নৃশংস অনুষ্ঠানগুলি একে একে বন্ধ করতে হবে। লাটসাহেব এর পর বিভিন্ন বিভাগীয় কমিশনারদের

এক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে ঠিক করা হয় যে যেসব অঞ্চলে বহুদিন ধরে চড়ক-পার্বণ চলে আসছে সেই সব স্থানে সরকারী কর্মচারীদের ব্যক্তিগত প্রভাবের দ্বারা এবং স্থানীয় জমিদারদের সমর্থনের সাহায্যে নৃশংস অনুষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে হবে; এবং যে সব স্থানে চড়কের অনুষ্ঠানগুলি দীর্ঘকাল প্রচলিত হয়নি সেসব ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে অনুষ্ঠানগুলি বন্ধ করার জন্য আদেশ দেবেন। বিভাগীয় কমিশনারদের বিবরণী থেকে জানা যায় যে চড়ক-পার্বণের বীভৎস অনুষ্ঠানগুলির প্রচলন ইতিমধ্যেই অনেক কমে গিয়েছিল। ১৮৬২ সালে সার সিসিল বীডন বাংলার লাট হয়ে আসেন এবং তার দু-বৎসর পরেই সরকার চড়কপূজার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আইন সভার একজন হিন্দু সদস্য চড়কের নৃশংস অনুষ্ঠানগুলি বন্ধ করার জন্য এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন, ও তা গৃহীত হয়। ১৮৬৬ সালের ১৫ই মার্চ বীডন সাহেব এক সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন। এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে চড়কঘোরা, বাণফোঁড়া প্রভৃতি নৃশংস অনুষ্ঠান ভারতের অন্য সব প্রদেশে বন্ধ হয়ে গেলেও বাংলা দেশের বহু জেলায় সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা অগ্রাহ্য করে এগুলি এখনো টিকে আছে। ভবিষ্যতে এগুলি যাতে বন্ধ হয়ে যায় সেজন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও কমিশনারদের প্রতি তাঁদের সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং জমিদার ও স্থানীয় অন্যান্য প্রভাবশালী লোকেদেরও এ ব্যাপারে সরকারকে সমর্থন করার জন্য অনুরোধ জানান হয়। যারা এর পরেও স্বেচ্ছায় সরকারী আদেশ লঙ্ঘন করবে তাদের আইন অনুসারে শাস্তি দেওয়া হবে বলে ভয় দেখান হয়। তবে নৃশংস অনুষ্ঠানগুলি বাদ দিয়ে চড়কপূজার আয়োজন করলে সরকার তাতে কোনো রকম বাধা দেবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দেন। British Indian Association এ ব্যাপারে সরকারকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে। এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হওয়ার পর কলকাতা সহরে ও সহরতলীতে চড়কঘোরা, বাণফোঁড়া ইত্যাদি নৃশংস অনুষ্ঠান একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে কলকাতা সহরের মধ্যে এ ধরনের অনুষ্ঠানের

সংবাদ আর পাওয়া যায় নি, সহরতলী থেকে অবশ্য কয়েকবার সরকারে নির্দেশ অগ্রাহ্য করা হয়েছিল বলে জানা যায়। বীডন সাহেবের প সার উইলিয়ম গ্রে ১৮৬৭ সালে বাংলার শাসনকর্তা হয়ে আসেন। তাঁ আমলে মেদিনীপুর ও ঢাকা অঞ্চলে আবার চড়কের নিষিদ্ধ অনুষ্ঠানগু প্রচলিত হওয়ার কাহিনী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। স্থানীয় সরকার কর্মচারীরা অবিলম্বে ঘটনাগুলির তদন্ত করেন এবং আইন-লঙ্ঘনকারীদে শাস্তি দেন। এর পর ধীরে ধীরে বাংলাদেশের সর্বত্রই চড়কের নৃশং অনুষ্ঠানগুলি বন্ধ হয়ে যায়।

গ্রন্থপঞ্জী

হুতোম (কালীপ্রসন্ন সিংহ), হুতোম প্যাঁচার নকশা (সাহিত্য পরিষ সংস্করণ, ১৯৫৭)

নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস—আদিপর্ব (১৩৫৬ সন)

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), সংবাদপত্রে সেকালের কথা ২ খণ্ড (১৩৫৬ সন)

R. Heber, *Narrative of A Journey Through The Uppe Provinces Of India* Vol. I (1828)

Alexander Duff, *India And India Missions* (1839)

G. Smith, *Life Of William Carey* (1885)

P. N. Bose, *History Of Hindu Civilisation During Britisl Rule In India*, Vol. I (1894)

C. E. Buckland, *Bengal Under The Lieutenant Governors* 2 volumes (1901)

B. K. Sarkar, *The Folk Element In Hindu Culture* (1917)

The *Friend Of India* (Monthly) March, 1819.

The *Calcutta Journal* 20 April, 1819 and 23 May, 1819.

শতবর্ষ পূর্বে বাংলাদেশে নরবলি

আধুনিক যুগের জনৈক ঐতিহাসিক বলেছেন, দৈবীশক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস যে অনেক সময়ে মানুষের চিত্তবৃত্তিকে নির্মল করার পরিবর্তে তার স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি এবং মানবিকতাবোধকে আচ্ছন্ন করে রাখে তার সবচেয়ে জ্বলন্ত নিদর্শন হ'ল ভারতবাসীর মত ধর্মপ্রাণ জাতির মধ্যে শত শত বৎসর ধরে সতীদাহ প্রথার মত বিভীষিকাময় সংস্কারের অস্তিত্ব। শুধু সতীদাহ কেন, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রচলিত আমাদের সমাজের অনেক কিছু কুসংস্কারই,—যেমন গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন, পুরীর জগন্নাথের রথের তলায় আত্মবলিদান, কুষ্ঠরোগীকে জীবন্ত কবর দান, চড়ক পূজায় শরীরের নানা অংশ বাণবিদ্ধ করে অকালমৃত্যু বরণ, নর্মদার কাছে মহাদেও পর্বতের শিখর হতে লাফিয়ে পড়ে মৃত্যুকে আহ্বান, উড়িষ্যার খোন্দ্ জাতির মধ্যে শিশুকন্যা হত্যার প্রথা ইত্যাদি —উপরোক্ত ঐতিহাসিক মতবাদের সত্যতাই প্রমাণ করে। বর্তমান প্রবন্ধে আমি এই ধরণেরই একটি বীভৎস সামাজিক কুসংস্কারের পরিচয় দেব,—এটি হচ্ছে শাস্ত্রীয় নরবলি।

বহু প্রাচীন যুগ হতেই আমরা ভারতীয় সমাজে নরবলির উল্লেখ পাই। রামায়ণে শূদ্রকের ও মহীরাবণের উপাখ্যান এবং মহাভারতে জরাসন্ধের কাহিনী প্রমাণ করে যে মহাকাব্যর যুগেও এই ধরণের ঘটনা আমাদের দেশে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল না। মনুসংহিতায় কলিযুগে ব্রাহ্মণদের পক্ষে গোহত্যা, অশ্বমেধ এবং নরবলি নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এথেকেও মনে হয় যে মনুর পূর্বের যুগে (অথবা মনুর যুগেও) নরবলি আমাদের সমাজে বেশী না হলেও কিছু কিছু ঘটত। উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের নামের সহিত জড়িত উপাখ্যান "বেতাল-পঞ্চবিংশতি"র সূচনাও হয়েছে একটি কাপালিকের কাহিনীকে অবলম্বন করে। হিন্দুরাজত্বের শেষভাগে, গুপ্তোত্তর যুগে, ভারতবর্ষে তন্ত্রধর্মের অভ্যুত্থান হয় এবং বামাচারী তান্ত্রিক সাধকরাই খুব সম্ভবতঃ

নরবলিকে আবার শাস্ত্রীয় মহিমায় মণ্ডিত করেন। খ্রীষ্টীয় ১২শ বা ১৩শ শতাব্দীতে রচিত কালিকাপুরাণে নরবলি দানের শাস্ত্রীয় আচারগুলি বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্বভারতের কামরূপ অঞ্চল এই তান্ত্রিক সাধনার একটি প্রধান কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠে এবং সমগ্র মধ্যযুগ ধরে তন্ত্রধর্ম বাংলা, আসাম, উড়িষ্যায়, অপ্রতিহতভাবে রাজত্ব করতে থাকে। তান্ত্রিক কাপালিকদের সাধনার কল্যাণে এই যুগে নরবলি ব্যাপারটাও খুব স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল একথা কল্পনা করে নেওয়া বোধ হয় অন্যায় হবে না।

কাপালিকদের নরবলিদানের কাহিনীকে বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা' বাংলা সাহিত্যে অমর করে রেখেছে। কিন্তু মাত্র একশত বৎসর পূর্বেও বাংলাদেশের নানাস্থানে, এমন কি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী কলকাতার বুকের উপরে, মাঝে মাঝে নরবলি ঘটত একথা শুনলে নিশ্চয়ই অনেকেই চমকে উঠবেন। 'সত্য ঘটনা অনেক সময়ে গল্পের চেয়েও বিস্ময়কর' একথাটা নিতান্ত প্রবাদবাক্য নয়। জনৈক ইংরাজ লেখকের রচনা থেকে জানা যায় যে ১৮৪১ সালের ৮ই জানুয়ারি তারিখে পাঞ্জাব প্রদেশে একমাত্র পূর্ণিমা উৎসবেই নাকি ২৪০টি নরবলি হয়েছিল! কিন্তু এ বিষয়ে সমসাময়িক বাংলাদেশের 'কৃতিত্ব'ও নিতান্ত কম নয়। পাদ্রী ওয়ার্ড সাহেব তাঁর বিখ্যাত বই View of the History, Literature and Religion of the Hindus-এর দ্বিতীয় খণ্ডে বাংলাদেশের কোন্ কোন্ স্থানে নরবলি দেওয়া হত তার একটি সুদীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন। তাঁর এই তালিকা হতে জানা যায় যে বর্ধমানের নিকট ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা দেবীর মন্দিরে, মুর্শিদাবাদের নিকট কিরীটকণায় কালী মন্দিরে, কাটোয়ার নিকট শ্রীরামপুরে তারামন্দিরে, গুপ্তিপাড়ার নিকট সুমরা গ্রামে স্থানীয় দেবীমন্দিরে, নদীয়ার নিকট ব্রাহ্মণীতলায় দুর্গামন্দিরে এবং তমলুকে বর্গভীমার মন্দিরে গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেও মধ্যে মধ্যে নরবলি হত এবং এই সব নরবলির পিছনে কে বা কারা থাকৃত তা বহু অনুসন্ধান করেও জানা যেত না। ওয়ার্ড বলেছেন যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আমল পর্যন্ত নদীয়ায় বহু নরবলি হ'ত

এবং জনশ্রুতি ছিল যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র একবার জনৈক ব্রহ্মচারীর (কাপালিকের ?) পরামর্শে দুই তিন বৎসরের মধ্যে প্রায় এক হাজার নরবলি দিয়েছিলেন ! রেভারেণ্ড্ লঙ্ সাহেবও ১৮৪৬ সালে Calcutta Review পত্রে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে—যেমন নদীয়া, শান্তিপুর, বিষ্ণুপুর, সুমুরা ইত্যাদি,—নরবলির কথা উল্লেখ করেছেন। ক্রিশ্চান পাদ্রীরা আমাদের সমাজের দোষগুলির কথা স্বভাবতই কিছু বাড়িয়ে বলেছেন একথা যাঁদের মনে হবে, সমসাময়িক বাংলা সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণগুলি পড়লে তাঁদের সে ধারণা কেটে যাবে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' হতে কয়েকটি বিবরণ পাঠকদের অবগতির জন্য এখানে দেওয়া হ'ল। ১৮২২ সালের ২২শে জুন সংখ্যায় 'সমাচার দর্পণ' লিখছেন,—"শুনা গেল যে জিলা নদীয়ার অন্তঃপাতি চাঁদড়া জয়াকুঁড় নামে গ্রামের রূপরাম চক্রবর্ত্তী আড়বান্দা নামে গ্রামে মাঘী পূর্ণিমাতে বলিদানরূপে খুন হইয়াছে। ইহা প্রকাশ হওয়াতে ঐ গ্রামের গৌরকিশোর ভট্টাচার্যের প্রতি সন্দেহ হইয়া তাহাকে কএদ রাখিয়াছিল কিন্তু সপ্রমাণ না হওয়াতে সে মুক্ত হইয়াছে।" ১৮২৯ সালের ৪ঠা জুলাই 'বঙ্গদূত' সংবাদ দেন,—"কিয়দ্দিবস হইল জেলা হুগলির অন্তবর্ত্তি কালীপুর গ্রামে এক সিদ্ধেশ্বরী আছেন তাঁহাকে পূজা করিয়া একদিবস পূজারিরা দ্বাররুদ্ধ করণান্তর গমন করিয়াছিল পরদিবস তথায় আসিয়া, ঐ পূজারিরা দেখিলেক যে কতকগুলিন ছাগ ও এক মহিষ ও এক নর ঐ সিদ্ধেশ্বরীর সম্মুখে ছেদিত হইয়া পড়িয়া আছে ইহাতে তাহারা অনুমান করিলেক যে পূর্ব্ব রজনীতে কেহ পূজা দিয়া থাকিবেক, ইহাতে পুজারিরা নরবলি দেখিয়া রিপোর্ট করাতে তত্রস্থ রাজপুরুষ অস্ত্রশস্ত্রাদি সম্বলিত বহুলোক সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়া অনেক সন্ধান করিলেন কিন্তু তাহাতে কিছু অবধারিত হয় নাই আমরা অনুমান করি দস্যুদিগের কর্ত্তৃক এরূপ কর্ম্ম হইয়া থাকিবেক।" কিন্তু এর চেয়েও রোমহর্ষক নরবলির সংবাদ পাওয়া যাবে ১৮৩৭ সালের ২১শে জানুয়ারী সংখ্যার 'জ্ঞানান্বেষণে'। "এক দিবস দেবীর (বর্দ্ধমানের নিকট রুক্মিণী দেবী) পূজক ব্রাহ্মণ

যথানিয়মে প্রাতঃস্নানাদি সমাধাপূর্ব্বক মহামায়ার অর্চ্চনার্থে মন্দিরের সন্নিকটে গমন করিয়া দেখিলেন যে খর্পরের স্থান রক্তে প্লাবিত চারি পার্শ্বে ধূপ ও ঘৃতের গন্ধে আমোদ করিয়াছে ইহাতে পুরোহিত অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া কুঠুরির মধ্যে প্রবেশ করত আবার বিস্ময়াপন্ন হইলেন যেহেতু ঘরের চারিদিকে দেবীকে বেষ্টিত করিয়া রুধির জমাট হইয়াছে। সম্মুখে এক প্রকাণ্ড চিনির নৈবেদ্য এবং তদুপযুক্ত আর ২ সামগ্রী ও একখানা চেলির শাটি তদুপরি এক স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণা এবং প্রায় ১০০০ রক্তজবা পুষ্প তন্মধ্যে নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কার তাহাও প্রায় দুই সহস্র মুদ্রার অধিক হইবেক।" পুরোহিত এর পর মন্দির পরিস্কার করে নৈবেদ্য নিয়ে নিজের বাড়ীতে চলে যান। "পরন্তু তাহার দুই চারি দিন পরে উক্ত নদ (মন্দিরের নিকটস্থ পুষ্করিণী) হইতে এক মুণ্ডহীন শব ভাসিয়া উঠিল, ইহাতে সুতরাং তত্রস্থ বিচক্ষণগণেরা বিলক্ষণরূপেই অনুমান করিলেন যে ঈশ্বরীর নিকট ঐ শব বলি হইয়াছিল কিন্তু পূজার বাহুল্য দেখিয়া সকলে কহিলেন কোন রাজা আপনার সাধনার নিমিত্তই এ প্রকার ভয়ানক মহাকর্ম্ম সমাধা করিয়াছেন।" বর্ধমানের চারটি থানার দারোগা এসে অনেক অনুসন্ধান করেন কিন্তু অপরাধীকে তাঁরা ধরতে পারেন নি। মুর্শিদাবাদের কমিশনারের প্রতি তদন্তের আদেশ হওয়াতে 'জ্ঞানান্বেষণ' আশা প্রকাশ করে লেখেন—"এই সন্ধানের ফল জানিবার নিমিত্ত আমরা অত্যন্ত আশাযুক্ত হইয়াছি যেহেতু সাধারণ লোকেরদের মধ্যে এমত জনরব উপস্থিত হইয়াছে যে তথাকার কোন প্রধান লোক এই নরবলিতে লিপ্ত আছেন এবং আরো জানি এই রুক্মিণী দেবীর নিকট পূর্ব্বেও বিস্তর নরবলি হইয়াছে।" ১৮৩৭ সালের ২৩শে ডিসেম্বর 'সমাচার দর্পণ' এই বীভৎস ব্যাপারের উপর মন্তব্য করে লেখেন যে সর্বসাধারণের মনের ধারণা যে এই কাজ বর্ধমানের রাজার তরফে হয়েছে। বর্ধমানের রাজবংশের কোনো লোকের কঠিন অসুখ হলে রাজ্যে নরবলির আয়োজন হ'ত বলে জনশ্রুতি ছিল। বর্তমান বলির কিছুদিন আগে খুব সম্ভব যুবরাজের বসন্ত রোগ হয়েছিল, হয়ত সেই কারণেই নরবলির ব্যবস্থা করা হয়। বলি যাকে দেওয়া

হত তার নাকি এতে সম্মতি থাকৃত এবং তাকে পিতার একমাত্র পুত্র হতে হ'ত। বলির কিছুদিন আগে হতে রাজবাড়ীর এক বিধবা দাসীর পুত্রের কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না, হয়ত সেই হতভাগ্যকেই বলির জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল।

সেযুগে ইংরেজী সংবাদপত্রগুলিতেও মধ্যে মধ্যে এ ধরণের সংবাদ পাওয়া যায়। ১৭৮৮ সালের ২৪শে এপ্রিল তারিখে Calcutta Gazette-এর সম্পাদকীয় স্তম্ভে চিৎপুরে চিত্রেশ্বরীর মন্দিরে একটি নরবলির সংবাদ প্রকাশিত হয়। এক্ষেত্রে নরবলি দেবার সময়ে দেবীর অঙ্গ বহুমূল্য বস্ত্র ও সোনারুপার গহনায় সাজানো হয়েছিল এবং শাস্ত্রের আদেশমত একজন চণ্ডালকেই বলি দেওয়া হয়। শাস্ত্রীয় নির্দেশমত পূজার উপযোগী পাত্রাদিও বলির স্থানে পাওয়া যায়। এথেকে মনে হয় যে বলির পিছনে কোনো ধনী এবং শাস্ত্রজ্ঞ লোকের হাত ছিল। কলকাতার ফৌজদার মন্দিরের পূজারী পুরোহিতকে গ্রেপ্তার করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত আসল অপরাধীকে ধরা যায়নি। চিৎপুরের চিত্রেশ্বরী ও সর্বমঙ্গলা দেবীর মন্দির প্রথম কবে স্থাপিত হয়েছিল তা সঠিক জানা যায় না। সর্বমঙ্গলা দেবীর নাম বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গলে'ও (খ্রীঃ ১৪৯৫।'৯৬ সালে রচিত) পাওয়া যায়। তবে ১৭শ শতাব্দীর সূচনাতেও যে এ দুটি দেবীর মন্দিরে যথেষ্ট নরবলি হ'ত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ১৬৩৭ সালে চিত্রেশ্বরী দেবীর সেবায়েত মনোহর ঘোষের মৃত্যু হয়। এই সময়ে মন্দিরে এত নরবলি হ'ত যে মনোহরের পুত্র রামসন্তোষ ঘোষ রোজ সকালে মন্দিরে গিয়ে বহু নরমুণ্ড দেখতে পেতেন এবং এই ভীষণ ব্যাপার অসহ্য হওয়াতেই নাকি তিনি চিৎপুর ত্যাগ করে বর্ধমানে চলে যান। চিৎপুরে চিত্রেশ্বরীর মন্দির ছাড়াও কলকাতায় আরো একটি স্থানে নরবলি হত,—সেটি হচ্ছে কালীঘাটের কালী মন্দিরে। ওয়ার্ড এবং লঙ্ উভয়েই কালীঘাটে নরবলির কথা উল্লেখ করেছেন। ওয়ার্ড বলেছেন যে ১৮০০ সালে দু'জন হিন্দু কালীমন্দিরে দেবীর কাছে নিজেদের জিহ্বা বলি দেন। ১৮২৭ সালের ২১শে এপ্রিল 'সমাচার চন্দ্রিকা'তেও জনৈক পশ্চিমদেশীয় ব্যক্তির কালী

প্রতিমার চরণে জিহ্বাদানের সংবাদ পাওয়া যায়। লঙ্ সাহেব ১৮৩২ সালে সংঘটিত একটি বীভৎস কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। কালীঘাটের জনৈক হিন্দু এক মুসলমান নাপিতকে মন্দিরে ডেকে এনে তাকে বলির ছাগলটি চেপে ধরতে বলেন। নাপিত ঐ রকম করলে হিন্দু ভদ্রলোকটি ছাগলের উপরে খাঁড়া না চালিয়ে নাপিতের উপরেই চালান। ফলে নাপিতের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয় এবং বিচারে সদর নিজামত আদালত হিন্দু ভদ্রলোকটির ফাঁসির আদেশ দেন। নয়াদিল্লীর ভারত সরকারের মহাফেজখানায় কালীমন্দিরে নরবলির বিষয়ে দুটি চিঠি পাওয়া গেছে। প্রথম চিঠিখানা ১৮৫৪ সালের ১৭ই জানুয়ারী তারিখে ২৪ পরগণার ম্যাজিস্ট্রেট স্যামুয়েল্‌স্ সাহেব পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডেম্পিয়ারকে লিখেছেন আর দ্বিতীয় চিঠিখানা ডেম্পিয়ার সাহেব ঐ মাসেরই ২১ তারিখে বাংলা সরকারের সেক্রেটারি সিসিল বিডনকে লিখেছেন। প্রথম চিঠিতে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব লিখ্‌ছেন ১৮৫৩ সালের ২৯শে ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় কালীঘাটের মন্দিরে একটি হিন্দুস্থানী আত্মবলিদান করেছে এই সংবাদ পেয়ে স্থানীয় থানার দারোগা ও পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় কিন্তু তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও ডাক্তার আসবার পূর্বেই হতভাগ্য প্রাণত্যাগ করে। লোকটির বয়স অনুমান ৩৫ বৎসর। সে ঐ অঞ্চলের লোকেদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। মৃতদেহ পাঁচদিন ফেলে রেখেও সনাক্ত করা যায় নি। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের চিঠিতে জানা যায় যে ১৮৩৬ সালে মন্দিরে এইরূপ আত্মবলিদানের সংখ্যা এত বেড়েছিল যে মন্দিরে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করতে হয়। মন্দিরের সেবায়েত হালদারদের এই ব্যাপারে গোপন সহানুভূতি ছিল বলে সন্দেহ করা হয়। সান্ত্রী নিযুক্ত করার পরও কিন্তু এই ব্যাপারের সম্পূর্ণ শেষ হয় নি। অন্ততঃ দুবার দুজন লোক প্রহরীকে ফাঁকি দিয়ে নিজেদের জিহ্বাদান করেছিল। যখন দেখা গেল প্রহরী রেখেও কোনো সুবিধা হচ্ছে না তখন ১৮৫০ সালের এপ্রিল মাসে পাহারা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৮৫৩ সালের ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রেটের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি হয়। তিনি লক্ষ্য করেন যে হালদারেরা এই কুপ্রথা

নিবারণের কোনো চেষ্টা করছেন না, এমন কি মন্দিরের চৌকীদারদেরও তাঁরা নিয়মিত বেতন দেন না; চৌকীদারেরা যাত্রীদের উপর অত্যাচার করে যথাসম্ভব উপার্জন করে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে লেখেন যে হালদারদের বেতন দিয়ে প্রহরী নিযুক্ত করতে বাধ্য করা হোক; এমনকি প্রয়োজন হলে আইনের সাহায্য নিয়েও কুপ্রথা দমন করতে হবে। হালদারেরা যে এই সব নৃশংস আত্মহত্যার জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী ছিলেন তা নয়; কিন্তু তাঁরা খুব সম্ভব প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করতে চাইতেন না, কাজেই কুপ্রথা দমনের জন্য কোনো বিশেষ চেষ্টা করেন নি।

১৮৬৫-৬৬ সালেও যশোর, হুগলী ও বীরভূম জেলায় ভূতপ্রেত পূজা ও ভাল শস্য লাভের জন্য নরবলির কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়। ছোট ছোট ছেলেদেরই প্রায় এই সব স্থানে বলি দেওয়া হ'ত। অবশ্য এ ধরণের বলি যে খুব বেশী ঘট্‌ত তা নয়। হাণ্টার সাহেব তাঁর Annals of Rural Bengal বইখানিতে ১৮৬৬ সালে যশোরের লক্ষ্মীপাশা গ্রামে কালীমূর্তির সম্মুখে একটি মুসলমান বালকের বলির কথা লিখেছেন। ১৮৬৬ সালের ১৯শে মে সংখ্যার Englishman কাগজে হুগলী জেলাতেও এইরূপ একটি নরবলির কথা পাওয়া যায়। হাণ্টার বলেছেন যে তিনি বীরভূমের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যেও শীঘ্র বৃষ্টিপাত কামনা করে এই ধরণের নরবলি দেওয়া হত বলে শুনেছিলেন। ছোটনাগপুরের কমিশনার ড্যাণ্টন সাহেব ১৮৬৪ সালের ২০শে অক্টোবর সরকারের কাছে জানান যে ধলভূমের রাজার গৃহদেবী রঙ্কিণীর মন্দিরে মাঝে মাঝে নরবলি হয় বলে তিনি সন্দেহ করেন, এবং বলির জন্য নিকটের গ্রাম হতেই বালক সংগ্রহ করা হয়। ধলভূমের রাজাকে সন্দেহ করে গ্রেপ্তার করা হয় কিন্তু পরে প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রসারের ফলে নরবলি প্রথা বিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশ থেকে একরকম উঠে গেছে বললেই চলে,

কিন্তু এখনো আসাম, উড়িষ্যা, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর অঞ্চল হতে দু'একটি বিচ্ছিন্ন নরবলির সংবাদ কাগজে মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। ১৯৫৫ সালেও উড়িষ্যার কালিয়াবোধার মঠে পুলিশের খানাতল্লাসীর ফলে অনেক গোপন কক্ষ ও বলিদানের উপযোগী মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়েছিল। এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে দু'একজন উন্মাদের কাজ মনে করে আমরা সান্ত্বনা পেতে পারি। কিন্তু জাতিগতভাবে আমরা যে আজও নরবলিদানের অভ্যাস সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলিনি তার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ গত ১৯৪৬-৪৭ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতেই পাওয়া গেছে।

গ্রন্থপঞ্জী

(১) W. Ward—*View of the History, Literature and Religion of the Hindus*. 3rd Ed. (1817), Vol. II, Bk. III.

(২) *The Calcutta Review* : 1846 : Vol. VI. "The Banks of the Bhagirathi" By Rev. Long.

(৩) W. W. Hunter—*The Annals of Rural Bengal* (1897)

(৪) *Judicial Proceedings*—February 1865.

(৫) হরিহর শেঠ—পুরাতনী (১৯৩৫)

(৬) 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত —১ম ও ২য় খণ্ড (পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত ৩য় সংস্করণ—শ্রাবণ ১৩৫৬)

(৭) মাসিক 'বসুমতী'—আশ্বিন, ১৩৬০—শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ইংরাজী সংবাদপত্রে সেকালের কথা'।

(৮) মাসিক 'ভারতবর্ষ'—মাঘ, ১৩৪১—পূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন—প্রাচীন কলিকাতা।

ঐ, শ্রাবণ, ১৩৪৭—গোপাললাল চক্রবর্ত্তী—কালী-ঘাটের কালীমন্দিরে আত্মবলিদান প্রথা।

(৯) *Selections From The Calcutta Gazettes*. By Seton Karr (1864)

ধর্মসংস্কারক রামমোহন

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে রামমোহন রায়ের কীর্তি অবিস্মরণীয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে, বাংলা গদ্য-সাহিত্যের বিকাশে, সমাজ ও ধর্মসংস্কারে, রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষসাধনে রামমোহন রায়ের অবদানকে উপেক্ষা ক'রে এ যুগের কোনও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হ'তে পারে না। ঐতিহাসিক বিচারে রামমোহন শুধু একজন ব্যক্তি নন, তিনি একটি বিশিষ্ট ভাবধারার, একটি বিশিষ্ট আন্দোলনের প্রতীক; এবং উনবিংশ শতাব্দীর যুগাদর্শের রূপায়ণে সেই ভাবধারা ও আন্দোলন যে একটি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে—একথা কোনমতেই অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমাদের এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে রাম-মোহনের কীর্তিকলাপ নিয়ে শুধু উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রশংসা অথবা বিদ্বেষমূলক নিন্দা করার দিন বহুকাল গত হয়েছে। আজ পর্যন্ত এ ধরণের স্তুতি বা নিন্দা যা করা হয়েছে তার অধিকাংশের পশ্চাতেই রয়েছে সাম্প্রদায়িক মনোভাব। তা থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রামমোহনের কীর্তিকলাপের যথাযথ মূল্য নিরূপণের চেষ্টা আজ ইতিহাস-সচেতন বাঙ্গালী মাত্রেরই কর্তব্য। একটি প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে রামমোহনের প্রতিভার সম্পূর্ণ বিচার করা অসম্ভব। বর্তমান প্রবন্ধে শুধু তাঁর ধর্মসংস্কারক রূপটিরই কিছু আলোচনা করা হবে।

রামমোহনের জীবনী আলোচনা করলে এ সিদ্ধান্তে কোনমতেই আসা যায় না যে প্রথম জীবন থেকেই ধর্মসংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার কোন বাসনা তাঁর মনে জেগেছিল। তাঁর বাল্য ও কৈশোর কালের কয়েকটি কাহিনী অবশ্য লোকমুখে প্রচলিত আছে, যা থেকে মনে হ'তে পারে যে অল্প বয়সেই তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের ধর্মে আস্থা হারিয়েছিলেন। ধর্মের ব্যাপারে পিতার সঙ্গে মনান্তরের ফলে তাঁর গৃহত্যাগ এবং বহু দেশ-পর্যটনের, এমন কি

তিব্বত গমনের কাহিনীও লোকমুখে প্রচলিত) কিন্তু রামমোহনের আত্মজীবনী ব'লে যে রচনাটি বিলাতের Athenœum পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল (৫ই অক্টোবর, ১৮৩৩) এবং যাকে এই সকল কিংবদন্তীর প্রমাণরূপে গণ্য করা হয়, রামমোহনের জীবনীকার শ্রীমতী কলেট তাকে রামমোহনের রচনা বলেই স্বীকার করেন নি। আধুনিক যুগের ঐতিহাসিকদের মধ্যেও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বহু গবেষণা ক'রে প্রমাণ করেছেন যে এই সব জনশ্রুতির পশ্চাতে সত্য খুবই কম। ব্রজেন্দ্রনাথের মতে প্রায় পঁচিশ ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত রামমোহন "সে যুগের সকল সমৃদ্ধ ভদ্রসন্তানের মত স্বগ্রামে থাকিয়া পিতার ও নিজের সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত ছিলেন। হয়ত বা তখন তাঁহার সাধারণ ভদ্রলোক অপেক্ষা ফার্সী ও সংস্কৃত জ্ঞান বেশী ছিল, কিন্তু তখনো তিনি দেশাচার বা প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে কোনরূপ বিদ্রোহ করেন নাই।" (সাহিত্যসাধকচরিতমালা—১৬; পৃঃ ৪৭)।

১৭৯৬ খ্রীঃ বাইশ বৎসর বয়সে পারিবারিক বিগ্রহ-সেবার ভার-বহনের অঙ্গীকার ক'রে তিনি পিতার নিকট হ'তে সম্পত্তি গ্রহণ করেন। ১৮০৩ খ্রীঃ পিতার মৃত্যুর পর রামমোহন কলকাতায় পিতৃশ্রাদ্ধও করেছিলেন। অবশ্য এর পূর্বেই রামমোহন যে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেছিলেন তার মধ্যে তাঁর ভবিষ্যৎ ধর্মমতের বীজ নিহিত ছিল, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। তা না হ'লে পঁচিশ বৎসর বয়সের রামমোহন এবং চল্লিশ বৎসর বয়সের রামমোহনের মধ্যে এতটা পার্থক্য কখনই সম্ভব হ'ত না। পঁচিশ বৎসর বয়সের ভিতরই রামমোহন সংস্কৃত, আরবী ও ফার্সী ভাষা শিক্ষা করেছিলেন এবং মোটামুটি-ভাবে হিন্দু দর্শনশাস্ত্র, বিশেষতঃ বেদান্ত, স্মৃতি, তন্ত্র ও পুরাণ, কিছু বৌদ্ধ (মহাযান) ও জৈন দর্শন এবং ইসলাম ধর্মের মূল তত্ত্ব অধিগত করেছিলেন। স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পালের মতে তিনি মুসলমানদের ভিতর চিন্তাস্বাতন্ত্র্যের জন্য বিখ্যাত মুতাজিলা সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতবাদও আয়ত্ত করেছিলেন।

১৭৯৭ খ্রীঃ হ'তে রামমোহন বৈষয়িক কার্যে কলকাতায় যাতায়াত আরম্ভ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই সদর দেওয়ানী আদালত ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে ওঠে। কলকাতায় রামমোহন এক সম্পূর্ণ নতুন জগতের সন্ধান পান এবং এর পরেই তাঁর মনে সংশয় ও বিদ্রোহের সূচনা হয়। পরে ১৮০৫ হ'তে ১৮১৫ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রায় দশ বৎসর ইংরেজ রাজকর্মচারী জন ডিগ্‌বীর সান্নিধ্যে বসবাসের ফলে তাঁর ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারা গ্রহণের সুযোগ ঘটে। ধর্মের ক্ষেত্রে যুক্তিবাদের আদর্শ এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে জাতীয়তার আদর্শ তাঁকে এই সময় হতেই প্রভাবিত করতে থাকে। একদিকে যেমন আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস ও বিখ্যাত ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ গঠনে সহায়তা করে, অপরদিকে তেমনি বেকন, লক্, হিউম্, গিবন্ ও ভল্‌টেয়ারের রচনাবলী তাঁকে দার্শনিক যুক্তিবাদের দিকে আকৃষ্ট করে। প্রথম দিকে এই পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে তিনি কিছুটা সংশয়বাদী হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু পরে আবার ভারতীয় বেদান্তদর্শনে তাঁর আস্থা ফিরে আসে। ১৮১২ হ'তে ১৮১৪ খ্রীঃ পর্যন্ত রঙপুরে প্রবাসকালে রামমোহন হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর সাহচর্যে হিন্দুদর্শনের—বিশেষতঃ তন্ত্রশাস্ত্রের রীতিমত চর্চা করেন। ১৮১৪ খ্রীঃ রামমোহন ডিগ্‌বীর চাকরি পরিত্যাগ ক'রে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আসেন এবং এর পর হতেই তাঁর ধর্মসংস্কার প্রচেষ্টার সূচনা হয়। অর্থাৎ, রামমোহনের জীবনের প্রায় ষাট বৎসরের মধ্যে মাত্র শেষের কুড়ি বৎসর তিনি বিশেষ ভাবে ধর্মসংস্কারের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন।

রামমোহনের রচিত প্রথম দার্শনিক গ্রন্থ 'তুহ্‌ফাৎ-উল-মুয়াহিদ্দিন' ফার্সী ভাষায় (ভূমিকাটি মাত্র আরবীতে) প্রকাশিত হয় ইংরেজী ১৮০৩-১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে। পরবর্তীকালে প্রকাশিত তাঁর অন্যান্য রচনা থেকে এ গ্রন্থটি কিছুটা স্বাতন্ত্র্যের দাবি করতে পারে। রামমোহন তাঁর এই গ্রন্থে প্রচলিত সমস্ত ধর্মমতের এবং জগতের বিভিন্ন ধর্মগুরুর

কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করেন। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে সব প্রত্যাদেশের কাহিনী এবং অলৌকিক বা অতিলৌকিক অংশ রয়েছে, সেগুলি সম্পূর্ণরূপে বর্জন ক'রে একমাত্র তাদের মূলতত্ত্ব—একেশ্বরবাদ, গ্রহণের জন্য রামমোহন আবেদন জানান। পরবর্তী কালে তাঁর মতামতের এই তীব্রতা অবশ্য অনেকাংশে দূর হয়, যদিও একেশ্বরবাদে বিশ্বাস চিরদিনই রামমোহনের ধর্মমতের প্রধান অঙ্গ হয়েছিল।

১৮১৫ সালে রামমোহন ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয় আলোচনার জন্য কলকাতায় আত্মীয় সভা নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। আত্মীয়-সভার অধিবেশনে শাস্ত্রীয় আলোচনা, বেদপাঠ ও ব্যাখ্যা, প্রভৃতি সবই হ'ত, এমন কি মধ্যে মধ্যে সে যুগের প্রধান সামাজিক কুসংস্কারগুলি এবং তাদের দমনের উপায় নিয়েও আলোচনা হ'ত) প্রথম প্রথম এই সভার অধিবেশনে কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আসতেন। এঁদের মধ্যে জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ ঠাকুর, পাথুরিয়াঘাটার প্রসন্নকুমার ঠাকুর, টাকীর জমিদার কালীনাথ মুন্সী, ভূকৈলাসের জমিদার রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, রাজনারায়ণ বসুর পিতা নন্দকিশোর বসু, বৃন্দাবন মিত্র, ব্রজমোহন মজুমদার, নীলরতন হালদার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা সকলেই যে রামমোহনের ধর্মমত আন্তরিক ভাবে সমর্থন করতেন তা নয়, অনেকে রামমোহনের মতো প্রতিভাশালী ব্যক্তির আনুকূল্য লাভের জন্য এবং বৈষয়িক ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ গ্রহণের জন্যও সভায় যাতায়াত করতেন। (ক্রমে ক্রমে যখন রামমোহনের ধর্মমত হিন্দুসমাজে আলোড়নের সূচনা করল তখন এঁদের অনেকেই ভয়ে রামমোহনের সঙ্গ ত্যাগ করেন। কয়েক বৎসর পরে রামমোহনের আত্মীয় সভার অধিবেশন আপনা হতেই বন্ধ হয়ে যায়)

(১৮১৫ খ্রীঃ রামমোহনের 'বেদান্ত গ্রন্থ' (ব্রহ্মসূত্রের অনুবাদ) প্রকাশিত হয় এবং ১৮১৬ হ'তে ১৮১৯ সালের মধ্যে পাঁচটি প্রধান উপনিষৎ—ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্যের, বঙ্গানুবাদও তিনি প্রচার করেন। ১৮১৫ খ্রীঃ (মতান্তরে ১৮১৬) তাঁর 'বেদান্তসার'

গ্রন্থও . রচিত হয়েছিল) সে যুগে বাংলা দেশে বেদ, উপনিষৎ প্রভৃতির চর্চা খুবই কমে এসেছিল। রামমোহন আবার নতুনভাবে বেদান্তচর্চার সূত্রপাত করেন। (বাংলা ভাষায় তিনিই বেদান্তের সর্বপ্রথম ব্যাখ্যাতা) অবশ্য, রামমোহন বেদান্তের কোন নিজস্ব বিশেষ ব্যাখ্যা দেননি, শঙ্করাচার্যকৃত বেদান্তের অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যাই তিনি প্রচার করেছিলেন। (তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে তিনি হিন্দুদের প্রাচীন ও অতি-সম্মানিত শাস্ত্র প্রকাশ ক'রে প্রমাণ ক'রে দেবেন যে হিন্দুধর্মে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাই শ্রেষ্ঠ ব'লে স্বীকৃত হয়েছে এবং পরবর্তীকালে সাকার উপাসনা ও বহু দেবদেবীর পূজার উপর প্রতিষ্ঠিত যে পৌরাণিক ধর্ম ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়েছে, তাই ভারতীয় হিন্দুসমাজের অবনতির জন্য মূলতঃ দায়ী) এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে পৌরাণিক ধর্মমতের বিচারে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গী ও পরবর্তী যুগের ব্রাহ্ম নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য ছিল। রামমোহন সাকার উপাসনার সমর্থন না করলেও এবং স্বার্থপর লোভী পুরোহিত সম্প্রদায়কে এর বহুল প্রচলনের জন্য দায়ী করলেও এ-কে ধর্মক্ষেত্রে নিম্নস্তরের অধিকারীদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ব'লে স্বীকার করেছিলেন। 'বেদান্ত গ্রন্থের' ভূমিকায় তিনি লিখেছেন: "অতএব এইরূপ পুরাণতন্ত্রের বর্ণন দ্বারা পূর্ব পূর্ব যে সাকার বর্ণন কেবল দুর্বলাধিকারীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত করিয়াছেন, এই নিশ্চয় হয়।" তাঁর রচিত ঈশোপনিষদের ভূমিকাতে রামমোহন পুরাণ ও তন্ত্রাদিকে শাস্ত্রের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হননি, কারণ "পুরাণ ও তন্ত্রাদিও পরমাত্মাকে এক এবং বুদ্ধি-মনের অগোচর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।" রামমোহনের এই উদারতা পরবর্তীকালের ব্রাহ্মনেতাদের মধ্যে একেবারেই দেখা যায় না।

(রামমোহনের বেদান্ত-মতপ্রচারের চেষ্টাকে সে যুগের হিন্দুসমাজ আদৌ সমর্থন করেনি) ১৮১৭ খ্রীঃ পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'বেদান্তচন্দ্রিকা' ইংরেজী অনুবাদ সহ প্রকাশিত হয়। মৃত্যুঞ্জয় তাঁর গ্রন্থে পৌরাণিক ধর্মমত, অর্থাৎ মূর্তিপূজা ও বহু দেবদেবীর পূজা সমর্থন করেন এবং ঐ মত যে বেদান্তবিরোধী নয়,

তা শাস্ত্রীয় যুক্তিসহ প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। মৃত্যুঞ্জয়ের প্রধান বক্তব্য ছিল: সগুণ ব্রহ্ম নিরাকার হলেও অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে আকার ধারণে সক্ষম। বেদান্তমতে ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ দুই-ই হওয়াতে দেবদেবী মাটিপাথরের পূজাতেও জগতের উপাদান কারণ ব্রহ্মেরই পরোক্ষভাবে পূজা করা হয়। প্রতিমাপূজা দ্বারা মানসিক চাঞ্চল্য দূর হ'লে সহজে উপাস্য বিষয়ে মনোনিবেশ হয়। লোকৈষণা বিত্তৈষণা প্রভৃতি কামনা-বাসনা মন হ'তে যতদিন না একেবারে দূর হয়, ততদিন অদ্বৈতজ্ঞানের সাধক হওয়া যায় না, তত্ত্বজ্ঞানের বীজও ততদিন জন্মে না; এবং যতদিন এই তত্ত্বজ্ঞান না হয়, ততদিন শাস্ত্রীয় আচার পরিত্যাগ করা কোনমতেই সমীচীন নয়। আপন দেহের মিথ্যাত্ব জ্ঞান না হ'লে দেববিগ্রহের মিথ্যাত্ব প্রচার করা অন্যায় এবং অশাস্ত্রীয়। মৃত্যুঞ্জয়ের যুক্তি কতদূর প্রমাণসহ দার্শনিকরাই তার বিচার করবেন; তবে দার্শনিক না হয়েও একথা বলা যায় যে ভারতীয় অদ্বৈতবাদের ইতিহাসে রামমোহনের যাঁরা পূর্বসূরী তাঁরা কেউই সম্পূর্ণভাবে প্রতিমাপূজার বিরোধী ছিলেন না। যে শঙ্করাচার্যের বেদান্তব্যাখ্যা রামমোহন মূলতঃ গ্রহণ করেছিলেন, তিনিও চরম আত্মোপলব্ধির পূর্বস্তর পর্যন্ত সাকার উপাসনার যৌক্তিকতা স্বীকার করেছিলেন। এ বিষয়ে যে রামমোহনের কিছুটা নূতনত্ব আছে, তা অস্বীকার করা চলে না। মৃত্যুঞ্জয়ের দু'একটি যুক্তির সঙ্গে আমরা পরবর্তী যুগের শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশের আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করি। মৃত্যুঞ্জয় একস্থানে বলেছেন: "মহারাজাধিরাজকে অতি ক্ষুদ্র লোকেরা শ্রদ্ধাভক্তিতে যৎকিঞ্চিৎ ফুলজল যদি দেয়, তবে তিনি কি তাহাতে আমোদ করেন না।.........পিতাকে বালকেরা মিষ্টান্ন বলিয়া মৃৎখণ্ড দিলে তিনি কি তৎপরিতোষার্থে হাতে লইয়া মুখ নাড়েন না!" (মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী, 'বেদান্ত চন্দ্রিকা': পৃঃ ২০৭)। 'কথামৃতে'ও আমরা দেখি যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন: ছোট ছেলে বাবাকে বাবা ব'লে ডাকতে না পারলে বাবা কি তাকে কম স্নেহ করবে? (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ৪র্থ ভাগ,

পৃঃ ৯৩)। অবশ্য রামকৃষ্ণদেব মৃত্যুঞ্জয়ের রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন—একথা মনে করার কোন কারণ নেই। মৃত্যুঞ্জয়ের এই প্রতিবাদ-গ্রন্থের উত্তর হিসাবে রামমোহন ১৮১৭ খ্রীঃ তাঁর 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। রামমোহন তাঁর এই রচনায় বহু যুক্তির সাহায্যে অদ্বৈত মত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন, এবং সাকার উপাসনাকে গৌণ সাধনা হিসাবে স্বীকার করেও নিরাকার উপাসনাই যে শ্রেষ্ঠ সাধনা, এ কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। রামমোহন বলেন, আত্মোপাসনা কঠিন হলেও যথাসাধ্য তারই জন্য চেষ্টা করা উচিত, কারণ সাকার উপাসনাও যথারীতি অনুষ্ঠান করা প্রায় দুঃসাধ্য।

(রামমোহন তাঁর বেদান্তসম্মত শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা সে যুগের রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন, বলাবাহুল্য, এত সহজেই তার নিবৃত্তি হয়নি। স্বমত প্রতিষ্ঠার জন্য রামমোহনকে আরও অনেক পণ্ডিতের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হতে হয়েছিল, এবং সে যুগে রচিত কয়েকটি পুস্তিকা আজও সেই বাদপ্রতিবাদের সাক্ষ্য বহন করছে। এই পুস্তিকাগুলির মধ্যে 'উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার' (১৮১৬-১৭), 'গোস্বামীর সহিত বিচার' (১৮১৮ জুন), 'সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার' (১৮২০), 'কবিতাকারের সহিত বিচার' (১৮২০), 'চারি প্রশ্নের উত্তর' (১৮২২) ও 'পথ্যপ্রদান' (১৮২৩) উল্লেখযোগ্য। সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সঙ্গে বিচার ১৮১৯ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে 'আত্মীয় সভা'র এক অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হয়) এই বিচারে রামমোহন ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য বর্ণাশ্রমধর্মের অনুষ্ঠান প্রশস্ত—এ কথা স্বীকার করেন, কিন্তু বেদব্যাসের সূত্র উদ্ধৃত ক'রে প্রমাণ করেন যে বর্ণাশ্রমধর্মের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকেও ব্রহ্মজ্ঞানলাভ সম্ভব। উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশও রামমোহনের সঙ্গে বিচারে পরাস্ত হন এবং শেষ পর্যন্ত রামমোহনের জীবদ্দশাতেই ব্রাহ্ম সমাজের প্রার্থনা-সভায় উপনিষৎ পাঠের ভার গ্রহণ করেন। 'চারি প্রশ্নের উত্তর', 'পথ্যপ্রদান' ও 'গুরুপাদুকা' (১৮২৩) প্রতিপক্ষের আক্রমণ রোধ করার জন্য রচিত হয়েছিল। রামমোহন এই পুস্তিকাগুলিতে তাঁর উপর

বিভিন্ন দিক হ'তে যে সব প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বর্ষিত হচ্ছিল, তাদের বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করেন। তিনি হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করেছেন কি না, এই মূল প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে বর্তমান যুগে শাস্ত্রের প্রতিটি ক্ষুদ্র নির্দেশ দৈনন্দিন জীবনে পালন করা অসম্ভব, এবং তিনি নিজে সেগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন না, এ কথা সত্য; কিন্তু হিন্দুধর্মের মূল কথা একেশ্বরবাদ এবং একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী মাত্রেই নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দিতে পারে। ১৮১৬ খ্রীঃ মাদ্রাজী পণ্ডিত শঙ্কর শাস্ত্রী 'মাদ্রাজ কুরিয়ার' পত্রে রামমোহনের ধর্মমতকে আক্রমণ ক'রলে রামমোহন তার উত্তরে ১৮১৭ খ্রীঃ A Defence of Hindoo Theism নামে এক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। রামমোহনের শাস্ত্রজ্ঞান এ সব সনাতনপন্থী পণ্ডিতদের কারও চেয়ে কম ছিল না এবং নিছক তর্কের দিক থেকে বিচার ক'রলে তিনি প্রায় প্রতিবারই জয়ী হয়েছিলেন। ১৮১৮ খ্রীঃ রামমোহন 'গায়ত্রীর অর্থ' নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করেন এবং ভগবদ্গীতারও একখানি পদ্যানুবাদ তিনি রচনা করেছিলেন ব'লে জানা যায়। ১৮২৬ খ্রীঃ পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে ভারতীয় বেদান্তদর্শন শিক্ষা দেবার জন্য তিনি কলকাতায় বেদান্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি।

নূতন ধর্মমত প্রচারের জন্য রামমোহনকে একদিকে যেমন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হ'তে হয়, অপরদিকে তেমনি গোঁড়া খৃষ্টান পাদরিদের সঙ্গে তাঁর তর্কবিতর্ক বাধে। খ্রীষ্টান ধর্মশাস্ত্রের প্রতিও রামমোহনের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। বাইবেলের 'ওল্ড্ টেষ্টামেণ্ট্' অংশ মূল ভাষায় পাঠের জন্য তিনি হিব্রু ভাষা শিক্ষা করেন। 'নিউ টেষ্টামেণ্ট্'-এর বাঙ্গানুবাদ প্রকাশের ব্যাপারেও তিনি শ্রীরামপুরের মিশনারিদের সাহায্য করেন। কিন্তু শীঘ্রই কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে মিশনারিদের সঙ্গে রামমোহনের বিবাদ বাধে। রামমোহন খ্রীষ্টের জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলীকেই খ্রীষ্টধর্মের সারতত্ত্ব ব'লে বিবেচনা করেননি এবং খ্রীষ্টের অবতারত্বেও তিনি সন্দিহান ছিলেন, যদিও

তাঁকে একজন ঈশ্বরপ্রেরিত মহামানব ব'লে স্বীকার করতে কখনও কুণ্ঠিত হননি। রামমোহনের মতে খ্রীষ্টের উপদেশের মধ্যে মানুষের মন, চরিত্র ও ধর্মবুদ্ধি উন্নত করবার যথেষ্ট উপাদান রয়েছে এবং সেগুলিই খ্রীষ্টধর্মের মূল তত্ত্ব। ১৮২০ খ্রীঃ তিনি **Precepts of Jesus** নাম দিয়ে খ্রীষ্টের উপদেশের একটি সারসঙ্কলন প্রকাশ করেন এই সঙ্কলনকে উপলক্ষ্য করেই পাদরিদের সঙ্গে তাঁর তর্ক বাধে। শ্রীরামপুরের পাদরিরা তাঁদের **Friend of India** পত্রিকায় মন্তব্য করেন যে রামমোহন খ্রীষ্টধর্ম ভালভাবে না বোঝার ফলে তার সারাংশই বাদ দিয়েছেন। রামমোহন অত্যন্ত শান্তভাবে এই সমালোচনার উত্তর দেন তাঁর **Appeal to the Christian Public** নামে পর পর প্রকাশিত তিনটি পুস্তিকায় (১৮২০-২৩)। তিনি বলেন যে যীশুর জীবনের অলৌকিক ঘটনাগুলি তিনি ব্যক্তিগতভাবে অবিশ্বাস করেন না, কিন্তু প্রচলিত হিন্দুধর্মের মধ্যেও এই ধরণের অলৌকিক কাহিনী ও নরপূজার মনোভাব যথেষ্ট পরিমাণে থাকায় এই সব কাহিনী দ্বারা হিন্দু-মনকে অভিভূত করা যাবে না, এবং তার দ্বারা খ্রীষ্টধর্ম প্রচারেরও কোন সুবিধা হবে না। এই কাহিনীগুলি খ্রীষ্টধর্মের মূল কথাও নয়, যার বহুল প্রচারের জন্য তিনি নিজে উদ্‌গ্রীব। রামমোহন তাঁর এই রচনাগুলিতে খ্রীষ্টধর্মের ত্রিত্ববাদকেও (**Doctrine of Trinity**) আক্রমণ করেন এবং তার ফলে কলহ আরও তীব্র আকার ধারণ করে। এই বাদবিসংবাদের ফলে রামমোহন শেষ পর্যন্ত উইলিয়াম অ্যাডাম নামে এক পাদরিকে তাঁর পক্ষে আনতে সক্ষম হন। অ্যাডামের এই অপ্রত্যাশিত মত পরিবর্তনে বাংলাদেশের খ্রীষ্টান সমাজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পাদরিরা এই ঘটনাকে **'Fall of Second Adam'** নামে অভিহিত করেন এবং কলকাতার তদানীন্তন বিশপ অ্যাডামকে ভারতবর্ষ থেকে কোন অছিলায় বিতাড়িত করা যায় কি না—সে বিষয়ে এটর্নি জেনারেলের পরামর্শ গ্রহণ করেন। অ্যাডাম প্রমুখ খ্রীষ্টান একেশ্বরবাদীদের (**Unitarians**) সহযোগিতায় রামমোহন ১৮২১ খ্রীঃ **Unitarian Committee** নামে আর একটি সভা স্থাপন করেন। এই সভার ধর্মমত খ্রীষ্টান ধর্ম

হ'তে গৃহীত হয়েছিল ও সভাতে Unitarian খ্রীষ্টান মতেই উপাসনা করা হ'ত। পুত্র রাধাপ্রসাদ, অপর কয়েকজন আত্মীয় এবং তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব নামে দুজন শিষ্য সহ রামমোহন এই সভার প্রার্থনায় যোগ দিতেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই সভাও খুব কার্যকরী হয়নি। অবশ্য রামমোহনের সঙ্গে অ্যাডামের সৌহার্দ্য আজীবন অটুট ছিল। ১৮২৩ খ্রীঃ 'রামদাস' ছদ্মনামে রামমোহন ডাক্তার টিট্‌লার নামে জনৈক ত্রিত্ববাদীর উপর বিদ্রূপাত্মক আক্রমণ আরম্ভ করেন। ঐ বৎসরেই প্রকাশিত 'পাদরি ও শিষ্য সম্বাদ' নামে এক পুস্তিকাতেও আমরা এই ধরণের আক্রমণ লক্ষ্য করি; বলা বাহুল্য এই পুস্তিকাটিও রামমোহনের রচনা। ১৮২৩ খ্রীঃ রামমোহনের একটি ইংরেজী পুস্তিকা 'Humble Suggestions to his countrymen who believe in the One True God' প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নামে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকায় রামমোহন তাঁর অনুবর্তীদের ত্রিত্ববাদী খ্রীষ্টান পাদরিদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ জানান। ১৮২৭ খ্রীঃ চন্দ্রশেখর দেবের নামে প্রকাশিত একটি রচনায় রামমোহন খ্রীষ্টান ত্রিত্ববাদকে হিন্দুর বহু দেবদেবী-পূজার নামান্তর ব'লে ঘোষণা করেন। খ্রীষ্টান পাদরিদের হিন্দুধর্মের উপর বিদ্বেষমূলক আক্রমণ রোধ করবার জন্য ১৮২১ খ্রীঃ রামমোহন শিবপ্রসাদ শর্মার ছদ্মনামে 'ব্রাহ্মণিক্যাল ম্যাগাজিন— ব্রাহ্মণ-সেবধি' নামে ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮২৩ খ্রীঃ পর্যন্ত এই পত্রিকার চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। আমেরিকার জনৈক বিশপ হেনরী ওয়্যারকে লিখিত কয়েকটি পত্রে (১৮২৩-২৪) রামমোহন ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের সম্ভাবনা খুবই অল্প ব'লে মত প্রকাশ করেন। তবে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা দানের সঙ্গে খ্রীষ্টান একেশ্বরবাদ কিছু পরিমাণে প্রচার ক'রলে তা ভারতীয়দের পক্ষে কল্যাণকর হবে ব'লে তিনি মনে করতেন।

অ্যাডাম প্রমুখ খ্রীষ্টান একেশ্বরবাদীরা হয়তো মনে করেছিলেন যে শেষ পর্যন্ত রামমোহন তাঁদের মতকেই নিজের ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করবেন। কিন্তু ১৮২৮ খ্রীঃ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা ক'রে রামমোহন তাঁদের

একেবারে নিরাশ করলেন। এই নতুন সভা স্থাপনের প্রস্তাব প্রথম তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব করেছিলেন এবং রামমোহন তাঁদের প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেন। কারও কারও মতে অ্যাডামই নাকি প্রথম এই সভার পরিকল্পনা করেন, কিন্তু ১৮২৯ খ্রীঃ ২২শে জানুয়ারি ডাঃ টাকারম্যান্‌কে লিখিত এক পত্রে অ্যাডাম নিজেই বলেছেন যে শেষ পর্যন্ত যে আকারে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে তাঁর কোন সমর্থন ছিল না। সম্পূর্ণভাবে হিন্দু একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, খ্রীষ্টান একেশ্বরবাদের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক ছিল না। শুধু অ্যাডাম নয়, রামমোহনের আরও অনেক খ্রীষ্টান বন্ধু এই সভার প্রতিষ্ঠায় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কলকাতার 'জন বুল' পত্রিকার সম্পাদক এই মর্মে দুঃখ প্রকাশ করেন যে রামমোহনের দ্বারা ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের যেটুকু আশা ছিল তা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হ'ল। যাই হোক, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ মুন্সী প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ১৮২৮ খ্রীঃ ২০শে আগষ্ট রামমোহন এই ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। সে সময় সাধারণ লোকে এই সমাজকে 'ব্রহ্মসভা' নামেই জানত। প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৭টা হ'তে ৯টা পর্যন্ত সভার অধিবেশন চ'লত। বাওজী নামে একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ বেদ এবং উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষৎ পাঠ করতেন। পরে হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর সহোদর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বৈদিক শ্লোকের ব্যাখ্যা করতেন। সবশেষে ব্রহ্মসঙ্গীত হবার পর সভা ভঙ্গ হ'ত। ১৮২৮ খ্রীঃ রামমোহনের 'ব্রহ্মোপাসনা' ও 'ব্রহ্মসঙ্গীত' নামে দু'খানি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। অবশ্য 'ব্রহ্মোপাসনা'য় উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসারে এ সময়ে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা পরিচালিত হ'ত না। ১৮৩০ খ্রীঃ ২৩শে জানুয়ারি ব্রাহ্মসমাজের নিজস্ব গৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়। এই উপলক্ষ্যে প্রায় পাঁচশত হিন্দু এখানে সমবেত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে বহু ব্রাহ্মণও ছিলেন। মণ্টগোমারি মার্টিন নামে এক ইংরেজও সেদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। ব্রাহ্ম-সমাজের প্রথম সম্পাদক হন তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও প্রথম আচার্য হন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। সমাজে কিভাবে উপাসনা করা হবে—সে বিষয়ে

রামমোহন একটি দলিলে (Trust Deed of the Brahmo Samaj) বিস্তারিত নির্দেশ দেন। তিনি বলেন :

"ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, পালনকর্তা, আদি-অন্ত-রহিত, অগম্য ও অপরিবর্তনীয় পরমেশ্বরই একমাত্র উপাস্য। কোন সাম্প্রদায়িক নামে তাঁহার উপাসনা হইতে পারিবে না। যে কোন ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত উপাসনা করিতে আসিবেন তাঁহারই জন্য জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, সামাজিক পদ নির্বিশেষে মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে। কোন প্রকার চিত্র, প্রতিমূর্তি বা খোদিত মূর্তি এই মন্দিরে ব্যবহৃত হইবে না। প্রাণীহিংসা হইবে না, পান ভোজন হইবে না, জীবই হউক বা জড়ই হউক, কোন সম্প্রদায়ের উপাস্যকে ব্যঙ্গবিদ্রূপের ভাবে উল্লেখ করা হইবে না। যাহাতে পরমেশ্বরের ধ্যান ধারণার প্রসার হয়, প্রেম নীতি ভক্তি দয়া সাধুতার উন্নতি হয় এবং সকল সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের মধ্যে ঐক্যবন্ধন দৃঢ়ীভূত হয়, এখানে সেই প্রকার উপদেশ, বক্তৃতা, প্রার্থনা ও সঙ্গীত হইবে; অন্য কোনরূপ হইতে পারিবে না।"

ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার কয়েক মাস পরেই রামমোহন দিল্লীর বাদশাহের দূতরূপে বিলাত যাত্রা করেন এবং সেখানেই ১৮৩৩ খ্রীঃ ২৭শে সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। রামমোহন যতদিন বিলাতে ছিলেন, ততদিন তাঁর পুত্র রাধাপ্রসাদ দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহায়তায় সমাজের তত্ত্বাবধান করতেন। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর তাঁকে বৈষয়িক ব্যাপারে দিল্লী যাত্রা করতে হয় এবং কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর তিনি আর সমাজের বিষয় চিন্তা করেননি। তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব রামমোহনের অনুপস্থিতিতে বর্ধমান রাজসরকারে চাকরি গ্রহণ ক'রে কলকাতা ত্যাগ করেন। কিছুদিনের মধ্যে রামমোহনের বন্ধুরা একে একে সকলেই সমাজকে পরিত্যাগ করেন। শেষ পর্যন্ত কেবল দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশই সমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সমাজের এই ঘোর দুরবস্থা হ'তে তাকে অবশেষে রক্ষা করেন দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ, কিন্তু সে ঘটনা ঘটে আরও প্রায় দশ বৎসর পরে।

রামমোহনের ধর্মমত সম্বন্ধে আলোচনা করতে হ'লে প্রথমেই আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে পরবর্তী যুগে একটি বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা-রূপে পরিচিত হলেও তিনি নিজে কোনদিন এ দাবি করেননি যে হিন্দু সমাজ হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কোন সম্প্রদায় তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন। এক-মাত্র গায়ত্রী-মন্ত্রের সাহায্যেই তিনি ব্রহ্মোপাসনার বিধান দিয়েছিলেন। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের ভিতর সর্বাধিক সম্মানিত বেদান্তকেই তিনি তাঁর দার্শনিক মতবাদের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছিলেন, এবং বেদান্তের ভাষ্য-রচনায় নিজস্ব কোন ব্যাখ্যা উপস্থাপিত না ক'রে অদ্বৈতবাদী শঙ্করের ব্যাখ্যাই তিনি অনুসরণ করেছিলেন। অবশ্য তাঁর রচিত 'তুহ্‌ফাৎ উল্‌-মুয়াহিদ্দিন্‌' ও ব্রাহ্মসমাজের দলিলপত্র পাঠে সন্দেহ হতে পারে যে অদ্বৈতবাদের চেয়েও একেশ্বরবাদের প্রতিই তিনি বেশী আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু অদ্বৈতবাদীর পক্ষে চরম আত্মজ্ঞান লাভ না করা পর্যন্ত একেশ্বরবাদী হওয়া হিন্দুদর্শন অনুসারে অযৌক্তিক বা অস্বাভাবিক নয়। রামমোহনের একেশ্বরবাদে বিশ্বাস যে অন্ততঃ আংশিকভাবে ইস্‌লাম ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, এ কথা স্বয়ং শিবনাথ শাস্ত্রী স্বীকার করেছেন। খ্রীষ্টধর্মের প্রতিও রামমোহনের শ্রদ্ধা ছিল গভীর। বিশেষতঃ খ্রীষ্টের উপদেশাবলীর মধ্যে যে নীতিকথা রয়েছে, মানুষের চরিত্র ও ধর্মবুদ্ধি উন্নত করার পক্ষে তার উপযোগিতা তিনি চিরকাল মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। অবশ্য প্রচলিত খ্রীষ্ট ধর্ম হতে তাঁর ব্যবধান প্রচলিত হিন্দুধর্ম হতে ব্যবধানের মতই ছিল দুর্লঙ্ঘ্য। এমন কি খ্রীষ্টান একেশ্বরবাদও তিনি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেননি। ১৮২৯ খ্রীঃ ২২শে জানুয়ারি অ্যাডাম ডাঃ টাকারম্যান্‌কে এক পত্রে লেখেন :

"The conviction has lately gained ground in my mind that he (Rammohon) employs Unitarian Christianity...as an instrument for spreading pure and just notions of God without believing in the divine authority of the Gospel."

জগতের সব কয়টি প্রধান ধর্মের মূল কথা একেশ্বরবাদ—রামমোহন এ সত্যে বিশ্বাসী ছিলেন। এই একেশ্বরবাদ ভিন্ন অন্য যা কিছু বিভিন্ন

ধর্মে স্থান পেয়েছে, সেগুলি তাঁর মতে ধর্মের বহিরঙ্গ। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির নিজস্ব প্রয়োজনে সেগুলির সৃষ্টি হয়েছে বলে তিনি মনে করতেন। এই একেশ্বরবাদের ভিত্তিতেই যে জগতের বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে মিলন ও পারস্পরিক আদানপ্রদান সম্ভব, তা তিনি বুঝেছিলেন। এ বিষয়ে রামমোহনের দৃষ্টি ছিল সুদূরপ্রসারী। রামমোহন ছিলেন যুক্তিবাদী, সব সময়েই তিনি যুক্তিকে সংস্কারের উপর স্থান দিতেন। কিন্তু মানুষের যুক্তি যে সব সময় অভ্রান্ত নয়, একথাও তিনি মানতেন এবং যুক্তি ও শাস্ত্রের মধ্যে সমন্বয়-সাধনই যে বিবেকী ব্যক্তির কর্তব্য—একথা তিনি কেনোপনিষদের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় বলেছেন। বিলাত-প্রবাসকালে রামমোহনের কর্মসচিব ছিলেন স্যাণ্ডফোর্ড আর্নট। ১৮৩৩ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে এশিয়াটিক জার্নাল পত্রিকায় প্রকাশিত রামমোহনের এক জীবনীতে আর্নট লিখেছেন: শেষজীবনে রামমোহনের মনে সন্দেহ জেগেছিল—শুধু যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন ধর্মমত সমাজের উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারে কিনা। রামমোহনের প্রথম যুগের রচনায় যে সামান্য সংশয়বাদের চিহ্ন দেখা যায়, পরবর্তীকালে তা একেবারেই চলে গিয়েছিল। শেষজীবনে তিনি মনে করতেন, অতিরিক্ত অবিশ্বাসের চেয়ে বরং অন্ধ বিশ্বাস সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। স্বদেশে এবং ইংলণ্ডে নাস্তিক যুবকবৃন্দের উচ্ছৃঙ্খল কার্যকলাপ লক্ষ্য ক'রে তিনি বিচলিত হয়েছিলেন। কলকাতার সরকারী হিন্দু কলেজে ছাত্রদের ধর্মশিক্ষা দেবার কোন ব্যবস্থা না থাকায় তিনি স্কটিশ মিশনের নেতা আলেকজাণ্ডার ডাফ্‌কে 'জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনস্টিটিউশন' নামে এক নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে উৎসাহিত করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল কোন ধর্মশিক্ষা না পাওয়ার চেয়ে ছাত্রদের বরং খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা পাওয়া ভাল। সকল ধর্মের মধ্যেই কিছু লৌকিক অনুষ্ঠান থাকা প্রয়োজন—এ কথাও রামমোহন স্বীকার করতেন, কিন্তু সে সব অনুষ্ঠান যতদূর সম্ভব সরল হওয়া উচিত, এই ছিল তাঁর বক্তব্য। আর নিষ্ঠাবান বৈদান্তিক হিসাবে প্রতিমা-উপাসনাকে তিনি জীবনে কোনদিনই গ্রহণ করতে পারেননি। জাতিভেদ-প্রথা ও পুরোহিত-তন্ত্রের নিন্দায় রাম-

মোহন চিরদিন ছিলেন মুখর। জাতিভেদপ্রথার বিরোধী একটি সংস্কৃত গ্রন্থ 'বজ্রসূচী'র বঙ্গানুবাদও তিনি প্রকাশ করেন ১৮২৭ খ্রীঃ। কিন্তু সমাজের সংস্কার করতে হ'লে সমাজের ভিতরে থাকা যে একান্তই প্রয়োজন, তা রামমোহন বুঝেছিলেন। সেইজন্যই মৃত্যুর সময়েও তাঁর স্কন্ধে ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত অটুট ছিল এবং মৃত্যুর পরে যেন খ্রীষ্টান মতে তাঁর সমাধি না দেওয়া হয়, সে বিষয়ে তিনি বারবার নির্দেশ দিয়ে যান। ফরাসীরাজ লুই ফিলিপ তাঁর সম্বর্ধনার জন্য যে দুটি ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন রামমোহন তাতে উপস্থিত থেকেও কোন 'অভক্ষ্য' ভক্ষণ করেননি। ব্রাহ্ম-সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনা-সভায় যে স্থানে বেদপাঠ হ'ত সেস্থানে শূদ্রের প্রবেশাধিকার তিনি দেননি, কারণ তাহলে সমাজে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হতে পারে—এ আশঙ্কা তাঁর ছিল। অবশ্য তাঁর উপদেশ ও আচরণের মধ্যে এই অসঙ্গতি যে কিছু পরিমাণে তাঁর আন্দোলনকে দুর্বল ক'রে দিয়েছিল, সে কথাও অস্বীকার করলে চলবে না। ব্রাহ্ম উপাসনা-সভায় শূদ্রদের যে বেদপাঠ শ্রবণের অধিকার ছিল না—বিদেশী 'জন বুল' পত্রিকার দৃষ্টিতেও তা ধরা পড়েছিল—(জন বুল—১৮২৮, ২৩শে আগষ্ট)।

ধর্মসংস্কারক হিসাবে রামমোহনের প্রকৃত স্থান কি এবং তাঁর সাফল্যের পরিমাণ কতটুকু, এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করলে উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মসংস্কারের ইতিহাসে রামমোহনের প্রধান কৃতিত্ব বাংলাদেশে বৈদান্তিক হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় বেদান্তের ব্যাখ্যা প্রচার করেন। তাঁর বেদান্তের ভাষ্যগুলি অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজী ও হিন্দুস্থানী ভাষাতেও অনূদিত হয়েছিল এবং এই সব ধর্মগ্রন্থ তিনি বিনামূল্যে বিতরণ করেন। অবশ্য এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা উচিত যে বাংলাদেশে কোনদিনই বেদান্তের চর্চা একেবারে লোপ পায়নি। ১৮২৪ খ্রীঃ জানুয়ারি মাসে প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কলেজেও প্রথম হতে প্রায় কুড়ি বৎসর বেদান্ত অধ্যাপনার জন্য একটি পৃথক শ্রেণী ছিল। আরও স্মরণ রাখা উচিত যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এ দেশে বেদবেদান্ত চর্চার যে

নতুন আগ্রহ দেখা যায়, তার পশ্চাতে স্বামী বিবেকানন্দের প্রচার-সাফল্যের প্রেরণাও কম ছিল না। রামমোহন প্রচলিত হিন্দুধর্মের বহু কুসংস্কারকে আঘাত করেছিলেন এবং ধর্মের ক্ষেত্রে অন্ধ বিশ্বাসকে দূর করতে তাঁর আন্দোলন কিছুটা সাহায্য করেছিল। তবে রামমোহনের ধর্মের মূল কথা—'একেশ্বরবাদ ও মূর্তিপূজা বর্জন' বাংলাদেশের হিন্দুসমাজ আজ পর্যন্ত গ্রহণ করেনি ; বহু দেবদেবীর উপাসনা ও মূর্তিপূজা আজও এ সমাজে প্রায় পূর্বের মতই প্রচলিত।

বৃহত্তর হিন্দুসমাজের কথা বাদ দিলেও রামমোহনের ধর্মবিশ্বাস যে তাঁর অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীকে বিশেষ প্রভাবিত করেছিল, এ কথাও মনে করা যায় না। রামমোহনের পত্নীদের ধর্মবিশ্বাস কি ছিল, তা জানবার কোন উপায় আজ আর নেই। কিন্তু তাঁর পুত্র রাধাপ্রসাদ যে তাঁর জীবদ্দশা-তেই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর দুর্গোৎসবে যোগদান করতেন, তা আমরা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী থেকে জানতে পারি। রাম-মোহনের আর এক পুত্র রমাপ্রসাদ ব্রাহ্মসমাজের অছি নিযুক্ত হয়েও মাতৃশ্রাদ্ধে পৌত্তলিকতার চরম করেছিলেন,—'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় তার কৌতুকপূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে। রামমোহনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুরও যে ব্রাহ্মধর্ম ভাল বুঝতেন না, সে কথা দেবেন্দ্রনাথ তাঁর 'রামমোহন-স্মৃতিকথা'য় স্বীকার করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ অতিরিক্ত ব্রহ্মচিন্তা করলে তাঁর বৈষয়িক বুদ্ধি কমে যাবে, এ ভয় দ্বারকানাথের যথেষ্ট ছিল। রামমোহনের অপর এক বন্ধু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠাকাল হতেই তার সঙ্গে জড়িত ছিলেন, কিন্তু তিনি ধর্মবিশ্বাসে ছিলেন সংশয়বাদী এবং রামমোহন এজন্য তাঁকে 'rustic philosopher' আখ্যা দিয়েছিলেন। রামমোহনের অন্যতম শিষ্য নন্দ-কিশোর বসু বাহ্য আচার-আচরণে বৈষ্ণব ছিলেন, একথা তাঁর পুত্র রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' হতে আমরা জানতে পারি। রামমোহন যাঁদের উপর ব্রাহ্মসমাজের পরিচালনার ভার দিয়েছিলেন তাঁরাও কতদূর তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করেছিলেন, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। দেবেন্দ্র-নাথ তাঁর 'আত্মজীবনী'র একস্থানে লিখেছেন, "আবার এক সময় দেখি

সেই ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সহযোগী ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের অবতার হওয়ার বিষয় প্রতিপন্ন করিতেছেন।...আমি বেদী হইতে অবতারবাদের বর্ণনা নিবারণ করিলাম।" (দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ২৬) যে দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের মৃতপ্রায় ব্রাহ্মসমাজকে পুনর্জীবন দান করেন, তাঁর ধর্মবিশ্বাসও যে রামমোহনের ধর্মবিশ্বাস হতে কিছুটা স্বতন্ত্র ছিল, একথা সর্বজনবিদিত। দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের অদ্বৈতবাদকে গ্রহণ করতে পারেননি এবং খ্রীষ্টান ধর্মশাস্ত্রের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। (মোটের উপর একথা স্বীকার করতেই হবে যে রামমোহনের ব্রাহ্ম আন্দোলন কলকাতা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলের ইংরেজী-শিক্ষিত নতুন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের একটি ক্ষুদ্র অংশকে প্রভাবিত করেছিল এবং এই সীমাবদ্ধ পরিধির মধ্যেও এই আন্দোলনের প্রভাব ছিল নিতান্তই অগভীর। পরোক্ষভাবে এই আন্দোলন বরং হিন্দুসমাজকেই সাহায্য করেছিল ইংরেজীশিক্ষিত সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণের প্রবণতাকে রোধ ক'রে।)

রামমোহনের ব্রাহ্ম আন্দোলনের এই সীমাবদ্ধ প্রভাবের কারণ বিশ্লেষণ করলে অবশ্য প্রথমেই এর জন্য দায়ী করতে হবে হিন্দুসমাজের রক্ষণশীলতা বা স্থিতিস্থাপকতাকে। হিন্দুসমাজ কোনদিনই যুগধর্মকে সম্পূর্ণ অস্বীকার ক'রে স্থির থাকতে পারেনি, রামমোহনের বহু আদর্শকেই সে ধীরে ধীরে আত্মসাৎ করেছে। কিন্তু তাঁর ধর্ম-আন্দোলনের দুটি মূল কথা—একেশ্বরবাদ ও মূর্তিপূজা-বর্জন—সে আজ পর্যন্ত গ্রহণ করেনি। পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আন্দোলনের ফলে এ সম্ভাবনার সামান্য অবশেষটুকুও বিলুপ্ত হয়। এ থেকে অবশ্য এমন সিদ্ধান্ত করা চলে না যে হিন্দুসমাজ একেশ্বরবাদ ও নিরাকার-উপাসনার বিরোধী। হিন্দুধর্মে উপাসনায় অধিকারভেদ একটি সুপ্রতিষ্ঠিত আদর্শ। তাই মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাধকের জন্য একেশ্বরবাদ ও নিরাকার-উপাসনার বিধান দিয়ে সমাজের সাধারণ লোকের জন্য হিন্দুধর্ম রুচিভেদে বহু দেবদেবীর পূজা ও সাকার-উপাসনার উপযোগিতা স্বীকার করে। হিন্দুধর্মের দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করলে রামমোহনের মতবাদকে

একদেশদর্শী বলেই মনে হবে, কারণ সমাজের সব শ্রেণীর লোকের প্রয়োজন মিটাবার ব্যবস্থা এতে নেই। ব্রাহ্ম আন্দোলনের এই সঙ্কীর্ণতা রামমোহনের পরবর্তী যুগে আরও বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে যে দলাদলির সৃষ্টি হয়—সমাজের জনপ্রিয়তা-নাশের তাই মূল কারণ।

কিন্তু হিন্দুসমাজের রক্ষণশীলতা ছাড়াও রামমোহনের আন্দোলনের সীমাবদ্ধতার আরও অনেক কারণ ছিল। রামমোহনের জীবনে উপদেশ ও আচরণের অসঙ্গতি—এ আন্দোলনের দুর্বলতার অন্যতম প্রধান কারণ। ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ ও বিষয়াসক্ত আচরণ—দুএর মধ্যে বিরাট ব্যবধান; এরূপ ক্ষেত্রে উপদেশ কখনও কার্য্যকরী হয় না।

আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য রামমোহন অনেক সময় কুলার্ণব ও মহানির্বাণ-তন্ত্রের উক্তি উদ্ধৃত করেন। আশ্চর্যের বিষয় (রামমোহন পৌরাণিক হিন্দুধর্মকে হিন্দুসমাজের সমস্ত কুসংস্কার ও জড়তার মূল কারণ বলে নির্দেশ করেন; কিন্তু বামাচারী তান্ত্রিক সাধকরা বাংলায় যে ব্যভিচারের প্লাবন ঘটিয়েছিলেন, তার নিন্দা কোথাও করেননি। হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর প্রভাবে রামমোহন যে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পরবর্তীকালে দিল্লী শহরে হরিহরানন্দের এক শিষ্য সুখানন্দ স্বামীর সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচয় হয়। সুখানন্দ স্বামী তাঁকে বলেছিলেন, "আমি এবং রামমোহন উভয়েই হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর শিষ্য; রামমোহন রায় আমার মতন তান্ত্রিক ব্রহ্মাবধূত ছিলেন।" ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধ' দ্বিতীয় ভাগে (প্রথম সংস্করণ; পৃঃ ১৬৪) লিখেছেন,—"তিনি (রামমোহন) তান্ত্রিক শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করেন, তান্ত্রিক আচারও স্বীকার করিয়াছিলেন এবং তান্ত্রিক চরম মতবাদও অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে উহাই দেশের পক্ষে উপযোগী। কিন্তু তন্ত্রের প্রতি বৈষ্ণব ধর্মসম্প্রদায়ের প্রগাঢ় বিদ্বেষ দেখিয়া তিনি তন্ত্রশাস্ত্রের নামোল্লেখ করেন নাই।" যাই হোক, রামমোহনের ব্যক্তিগত জীবনে গভীর একাগ্র অধ্যাত্মসাধনার বিশেষ কোন ইতিহাস

পাওয়া যায় না। রামমোহনের দেশবাসীরা যে তাঁকে সহজে বুঝতে পারেননি, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। রামমোহনের দু'একটি আচরণ সত্যই প্রহেলিকাময়, এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

যে বেদান্ত শাস্ত্রের প্রচার জীবনের অন্যতম ব্রত হিসাবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা স্পষ্ট ছিল না। ১৮২৩ খ্রীঃ ১১ই ডিসেম্বর বড়লাট লর্ড আম্‌হার্স্টকে লিখিত এক পত্রে তিনি সরকারী অর্থে বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র শিক্ষা দেবার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। এই পত্রে তিনি বলেন :

"Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines, which teach them to believe that all visible things have no real existence, that as father, brother &c., have no actual entity, they consequently deserve no real affection, and therefore the sooner we escape from them and leave the world the better."

রামমোহনের মুখে এই যুক্তি সত্যই বিস্ময়কর, বিশেষতঃ যখন আমরা স্মরণ করি যে তিনি ঠিক এই যুক্তিই খণ্ডন করেছিলেন তাঁর ১৮১৫ খ্রীঃ প্রকাশিত 'বেদান্ত-গ্রন্থে'র ভূমিকায়। শেষোক্ত স্থানে তিনি লিখেছেন :

"যদি কহ, সর্বত্র ব্রহ্মজ্ঞান করিলে ভেদজ্ঞান আর ভদ্রাভদ্রের জ্ঞান কেন থাকিবেক, তাহার উত্তর এই যে লোকযাত্রা নির্বাহ নিমিত্ত পূর্ব পূর্ব ব্রহ্মজ্ঞানীর ন্যায় চক্ষুকর্ণহস্তাদির কর্ম চক্ষুকর্ণহস্তাদি দ্বারা অবশ্য করিতে হয় এবং পুত্রের সহিত পিতার কর্ম, পিতার সহিত পুত্রের ধর্ম আচরণ করিতে হইবেক। যেহেতু এ সকল নিয়মের কর্তা ব্রহ্ম হয়েন, যেমন দশজন ভ্রমবিশিষ্ট মনুষ্যের মধ্যে একজন অভ্রান্ত যদি কালক্ষেপ করিতে চাহে, সেই ভ্রমবিশিষ্ট লোকসকলের অভিপ্রায়ে দেহযাত্রার নির্বাহার্থ লৌকিক আচরণ করিবেক।"

পরপর উদ্ধৃত এই দুটি রচনা একই ব্যক্তির, এ কথা বিশ্বাস করা সত্যই কঠিন। আমহার্স্টকে লিখিত পত্রে রামমোহন অবশ্য তাঁর দেশ-

বাসীর উন্নতির জন্তই ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার হোক—এই প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, কিন্তু তার জন্ত বেদান্তের মহিমা এতদূর খর্ব করা তাঁর মতো বেদান্তবাদীর পক্ষে কতদূর স্থায়সঙ্গত হয়েছিল? সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হলেও এ ব্যাপারে তিনি যে পথ গ্রহণ করেছিলেন, তাতে তাঁর অসঙ্গতির পরিচয় পাওয়া যায়। এর পরেও ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে ক'লকাতায় বেদান্ত কলেজের প্রতিষ্ঠা তাঁর আচরণকে আরো অসঙ্গত পূর্ণ করে তুলেছে।

রামমোহনের আন্দোলনের সীমাবদ্ধতার আর একটি প্রধান কারণ ছিল এই যে তাঁর ধর্মবিশ্বাস ছিল প্রায় সম্পূর্ণভাবে যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যুক্তিবাদ মুষ্টিমেয় চিন্তাশীল ব্যক্তির মস্তিষ্কের ধর্ম, অগণিত জনসাধারণের হৃদয়ের ধর্ম তা হতে পারে না। পরবর্তীকালে এই সত্য উপলব্ধি করেই বোধ হয় কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্রাহ্ম নেতারা ব্রাহ্ম আন্দোলনকে জনপ্রিয় করার জন্ত নগর-সংকীর্তন প্রভৃতির আয়োজন করেছিলেন। রামমোহনের মধ্যে প্রকৃত ধর্মগুরুর হৃদয়ের উত্তাপ আমরা লক্ষ্য করি না, লক্ষ্য করি শুধু দার্শনিকের চিন্তাশীলতা। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে যথার্থই বলেছেন:

"There was more of the spirit of a cautious philosopher than of the consuming fire of a prophet in him."

স্যাণ্ডফোর্ড আর্নটের উক্তি সত্য হ'লে রামমোহন নিজেও শেষ জীবনে যুক্তিবাদের উপর আস্থা কিছুটা হারিয়েছিলেন। যুক্তিবাদের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা রামমোহনের আন্দোলনকে কিছুটা দুর্বলও ক'রে দিয়েছিল। শাস্ত্রজ্ঞানী রামমোহন বহু দেবদেবীর পূজা ও মূর্তি-পূজাকে নিম্নস্তরের অধিকারীর উপযুক্ত বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং তার ফলে নিরাকার-উপাসনার পক্ষে তাঁর যুক্তি সাধারণ লোকের কাছে আর তত প্রবল মনে হয়নি।

উপরের আলোচনা হতে মনে প্রশ্ন জাগতে পারে—ধর্মসংস্কারক হিসাবে রামমোহনের প্রকৃত স্থান তাহলে কোথায়? রামমোহনের জীবনীকার শ্রীমতী কলেট অবশ্য বলেছেন:

"He was above all and beneath all a religious personality. The many and far-reaching manifestations of his prolific energy were forthputtings of one purpose. The root of his life was religion." পরবর্তীকালে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও কলেটের এই উক্তির সমর্থন করেছেন। কিন্তু নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে এই মত আদৌ বিচারসহ নয়। রামমোহন মূলতঃ ছিলেন মানবিকতাবোধ-সম্পন্ন সংস্কারক ও মনীষী। বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ। অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়াম্‌স্‌ তাঁকে 'The first really earnest investigator in the science of comparative theology' বলে অভিহিত করেছেন। রামমোহনের জীবনের বহু বিচিত্র রূপের মধ্যে তাঁর এই মানবিকতা-বোধ-সম্পন্ন দার্শনিকের রূপটিই বোধ হয় সর্বপ্রধান রূপ; কিন্তু ধর্মগুরু বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি রামমোহন আদৌ তা ছিলেন না। প্রাচীন কালের কথা বাদ দিলেও মধ্যযুগের ভারতবর্ষে রামানন্দ, কবীর, নানক, চৈতন্য প্রমুখ যে সব ধর্মগুরু আবির্ভূত হয়েছিলেন, জনচিত্তের উপর তাঁদের প্রভাব ছিল অধিকতর। রামমোহনের জীবনে ধর্মসংস্কার একটি গৌণ উদ্দেশ্য ছিল বলেই মনে হয়, তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সমাজ-সংস্কার। কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন যে এদেশে সমাজের সঙ্গে ধর্মের যোগ এত নিবিড় যে সমাজ সংস্কার করতে হ'লে তার ভিত্তিস্থানীয় ধর্মকেও কিছু পরিবর্তন করতে হবে। রামমোহনের এই মনোভাবের কথা তাঁর প্রায় সমসাময়িক কিশোরীচাঁদ মিত্র ১৮৪৫ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে 'ক্যাল্‌কাটা রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন,

"He was a religious Benthamite and estimated the different creeds, existing in the world, not according to his notion of their truth or falsehood, but his notion of their utility, according to their tendency to promote the maximization of human happiness and the minimization of

human misery." অর্থাৎ, রামমোহন বিভিন্ন ধর্মের মূল্য নিরূপণ করতেন তাদের অন্তর্নিহিত সত্যাসত্য বিচার করে নয়, সমাজের সুখবৃদ্ধির পক্ষে তারা কতদূর সহায়ক হবে সেই বিচার ক'রে। রামমোহন নিজেও ১৮২৮ খ্রীঃ ১৮ই জানুয়ারিতে লিখিত এক পত্রে বলেছেন: প্রচলিত হিন্দুধর্ম, বিশেষতঃ জাতিভেদ-প্রথা এবং আচার-বাহুল্য তার দেশবাসীর রাজনৈতিক উন্নতিসাধনের পক্ষে প্রবল অন্তরায় এবং অন্ততঃ তাদের রাজনৈতিক উন্নতি এবং সামাজিক সুখের জন্যই প্রচলিত ধর্মব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন করা প্রয়োজন। "It is, I think, necessary that some change should take place in their religion at least for the sake of their political advantage and social comfort."

সমাজ-সংস্কারক হিসাবে, রাজনৈতিক চিন্তানায়ক হিসাবে, বাংলা গদ্যের অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবে ইতিহাসে রামমোহনের স্থান সুনির্ধারিত। রামমোহনের বহুমুখী প্রতিভাকে স্বীকার ক'রে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিককে এ কথা বলতেই হবে যে ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর কীর্তি অনুরূপ নয়। রামমোহনের মত যুক্তিবাদীর বিচার যুক্তির সাহায্যেই সম্পন্ন হওয়া উচিত, উচ্ছ্বাসের সাহায্যে নয়।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা রামমোহন রায় (সাহিত্যসাধক চরিত-মালা) (১৩৫৩ সন)

রামমোহন গ্রন্থাবলী, ৭ খণ্ড (সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ) (১৯৪৩-১৯৫২)

মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত) (১৩৪৬ সন)

রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত (১৯০৮); হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত (১৮৭৫)

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী (তৃতীয় সংস্করণ, ১৯২৭)

ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় ভাগ (১৮৯৫)

হুতোম (কালীপ্রসন্ন সিংহ), হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা (সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ, ১৯৫৭)

J. N. Farquhar, *Modern Religious Movements In India* (1915)

S. D. Collet, *The Life and Letters of Raja Rammohun Roy* (1913 edition)

K. Nag and D. Burman (Eds.) *The English Works of Raja Rammohun Roy*, 7 Parts.

S. C. Chakravarti (Ed.) *The Father of Modern India*, Rammohun Roy Centenary Celebration Volume (1935)

S. N. Sastri, *History of The Brahmo Samaj*, Vol. I (1911)

উনবিংশ শতকে বাংলায় হিন্দু নবজাগরণ আন্দোলন

ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় নিজেকে বিশুদ্ধ প্রাচীন আদর্শের হিন্দু বলেই দাবী করতেন, যদিও তাঁর ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সনাতন হিন্দুধর্মের কয়েকটি মূলগত পার্থক্য ছিল। কিন্তু ব্রাহ্ম আন্দোলনের মধ্যযুগে ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা অত্যন্ত উগ্র হিন্দুবিরোধী মনোভাবের পরিচয় দিতে থাকেন। এই হিন্দুবিরোধী মনোভাবের সব চেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে অক্ষয়কুমার দত্তের "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" নামে বইখানি। সমসাময়িক এবং প্রাচীন যুগের যে সব উপাসক সম্প্রদায় নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিতেন তাদের প্রায় সবগুলির কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে এই বইটিতে, বলা বাহুল্য সব সময়ে অকারণে নয়। এই হিন্দুবিরোধী প্রচারকার্য স্বভাবতই অনেক সনাতনপন্থীর মনে আঘাত দেয়। ব্রাহ্মদের সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলনগুলি—যদিও এতে অনেক অব্রাহ্মও যোগ দিয়েছিলেন—রক্ষণশীল হিন্দুদের কাছে বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। অনেকটা এই প্রগতিবাদী ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ারূপেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাংলা দেশে হিন্দু নবজাগরণ আন্দোলন দেখা দেয়। কিন্তু এই নবজাগরণ আন্দোলনকে সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া মনে করাও ভুল হবে। এই আন্দোলনের তলে তলে স্পষ্টই একটা জাতীয়তাবাদী মনোভাবের সূচনা দেখা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যস্থাপনের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ যে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব আমাদের সমাজের মধ্যে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে তারই চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এই নবজাগরণ আন্দোলন। বলা বাহুল্য, রক্ষণশীল হিন্দুসমাজও নতুন যুগের ভাবধারাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করতে পারে নি এবং ভিতরে ভিতরে নিঃশব্দে বহু পরিবর্তনও শুরু হয়ে

গিয়েছিল। রক্ষণশীল দলের মধ্যে যে সব হিন্দু ইংরেজী শিক্ষার সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁদের চেষ্টাতেই হিন্দুসমাজের এই আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটতে থাকে। কিন্তু এই শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্য হতেই সঙ্গে সঙ্গে সনাতন হিন্দু আদর্শের একদল নতুন সমর্থকের আবির্ভাব হয়, যাঁরা প্রাচীন হিন্দু আদর্শ ও ভাবধারাকে মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে সদর্পে ঘোষণা করতে থাকেন। যে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ এতকাল ব্রাহ্ম ও নব্যদলের আক্রমণের বিরুদ্ধে কোনও রকমে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় ব্যস্ত ছিল সেই হিন্দু সমাজই যেন নবীন প্রাণের স্পর্শ পেয়ে সক্রিয় হয়ে ওঠে ও এখন হতে তার আক্রমণাত্মক অভিযান সুরু হয়ে যায়। শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়া দূরে থাকুক ব্রাহ্মসমাজে নাম লেখানোর পালাও ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়।

যে নবজাগরণ আন্দোলনের কথা আমরা এখানে উল্লেখ করেছি সেটা কোন একটা বিশেষ সুসংগঠিত ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন নয়। বহু পৃথক ছোটবড় আন্দোলন নিয়েই এই নবজাগরণ আন্দোলনের ধারা পুষ্ট হয়ে ওঠে। এই নবজাগরণ আন্দোলনের একটা নিখিলভারতীয় রূপও ছিল; কেবল বাংলাদেশের গণ্ডীর মধ্যেই এ আন্দোলন সীমাবদ্ধ থাকে নি। ভারতের যে সমস্ত প্রদেশে ব্রাহ্ম আন্দোলন বিশেষ প্রবল হয়ে উঠতে পারে নি সেখানেও এই নবজাগরণ আন্দোলন দেখা দেয় এবং এথেকেই এর প্রচ্ছন্ন জাতীয়তাবাদী রূপটি স্পষ্ট ধরা পড়ে। আন্দোলনের নেতাদের মধ্যেও অনেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জাতীয় আন্দোলনের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন বা ঐ আন্দোলনকে ভাবের জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছিলেন। তবে বাংলা দেশেই আন্দোলনটি বিশেষ মর্যাদা লাভ করে এবং আমাদের বর্তমান আলোচনাও এই প্রাদেশিক গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। বাংলাদেশে এই আন্দোলনের তিনটি ধারা আমরা লক্ষ্য করি,—পণ্ডিত ও পরিব্রাজকদের প্রচারকার্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আন্দোলন এবং ধর্ম তথা সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা।

বাংলাদেশে নব্য হিন্দুবাদের প্রথম দার্শনিক সমর্থক এবং প্রচারক

ছিলেন পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি (১৮৪০-১৯২৩)। হিন্দুধর্ম ও আচার-পদ্ধতির বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা ইনি শিক্ষিত সমাজের কাছে উপস্থাপিত করেন। যদিও তাঁর যুক্তিতর্কের মধ্যে বিজ্ঞানের নামগন্ধও ছিল না, তবুও অর্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত হিন্দুদের মনে তাঁর মতবাদ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। আচার্য যদুনাথ তাঁর একটি পুস্তকে শশধর তর্কচূড়ামণির এই অদ্ভুত প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে যদিও পণ্ডিতের কোন স্বাভাবিক বাগ্মিতাশক্তি ছিল না বা তাঁর কণ্ঠস্বরের মধ্যে আকর্ষণ করবার কিছু ছিল না, এবং যদিও তাঁর বক্তব্যবিষয় ছিল সম্পূর্ণ নতুন এবং অপরিচিত, তবুও সহরের শত শত কেরাণী, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাপাখানার কর্মী, এমন কি দোকানদারের দল সন্ধ্যার সময়ে কর্মস্থল হতে বাড়ী ফেরার পথে ক্লান্ত দেহ নিয়েও অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পণ্ডিতের বক্তৃতা শুনতে যেতেন এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে নিস্তব্ধ হয়ে বিস্ময়-বিমূঢ় মনে তাঁর বক্তৃতা শুনতেন। শীঘ্রই এই আন্দোলন রাজধানী থেকে বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়ে এবং নানা-স্থানে নতুন হিন্দুসংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। কয়েকজন প্রতিভাশালী হিন্দুপ্রচারক এবং পরিব্রাজকেরও এই সময় আবির্ভাব হয়। এঁদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (১৮৪৯-১৯৩৯) তাঁর মধুর ভাবাবেগপূর্ণ ভাষণের জন্য এবং পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব তাঁর প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞান, মৌলিক চিন্তাশক্তি ও বাগ্মিতার জন্য যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন।

সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যেও নব্যহিন্দুবাদ আত্মপ্রকাশ করে তিনজন খ্যাতনামা লেখকের রচনার মধ্য দিয়ে। এঁরা হচ্ছেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ভূদেব নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজের রক্ষণশীল মনোভাব বজায় রাখেন। তাঁর 'সামাজিক প্রবন্ধ' এবং অন্যান্য রচনাগুলির মধ্যে তিনি হিন্দু পারি-বারিক জীবন এবং সামাজিক প্রথাকে আদর্শ রূপ দানের চেষ্টা করেন। তাঁর ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলিতে জাতীয়তাবাদী মনোভাবের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় এবং এটা খুবই উল্লেখযোগ্য বিষয় যে ভূদেবই প্রথম জাতীয়

ঐক্যবোধকে দৃঢ় করবার জন্ম হিন্দীকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের একজন দিকপাল ছিলেন বললেও অত্যুক্তি হয় না এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি জাতীয়তা-মন্ত্রের একজন প্রধান উদ্গাতা ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর রচনার মধ্যেও আমরা যেন নব্যহিন্দুবাদের স্বর শুনতে পাই। বোম্বাই প্রার্থনা সমাজের নেতা বিচারপতি রাণাডে বলতেন, প্রকৃত সংস্কারকের কাজ অনেক সময়েই নূতন কিছু সৃষ্টি করা নয়, অসমাপ্ত সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ করা। বঙ্কিমের মধ্যেও আমরা যেন এই কথাটির প্রতিধ্বনি শুনি। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে Statesman কাগজে পাদ্রী হেষ্টি সাহেব কয়েকটি হিন্দু শাস্ত্রীয় আচারের তীব্র সমালোচনা করে এক প্রবন্ধমালা প্রকাশ করেন। 'রামচন্দ্র' এই ছদ্মনামে বঙ্কিম হেষ্টি সাহেবের মতামত খণ্ডন করবার চেষ্টা করেন। হিন্দুধর্মের স্বপক্ষে তাঁর এই প্রথম লেখনী ধারণ। প্রায় এই সময়েই বিখ্যাত প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিক যোগেশচন্দ্র ঘোষের নিকট লিখিত হিন্দু-ধর্ম বিষয়ক পত্রাবলীর মধ্যেও বঙ্কিম হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে 'প্রচার' এবং 'নবজীবন' নামে দুইটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং বঙ্কিম এই দুটি পত্রিকাতেও তাঁর মতামত লিপিবদ্ধ করেন। কোনও মনীষীই তাঁর যুগের প্রভাব হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারেন না, বঙ্কিমের রচনার মধ্যেও আমরা ১৮শ শতাব্দীর মিল-বেন্থাম প্রচারিত Utilitarian মতবাদের স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করি। যদিও বঙ্কিম নিজে সনাতন ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন বলেই দাবী করেন তবুও একথা অস্বীকার করা যায়না যে তিনি তাঁর পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে হিন্দুধর্মকে এক নতুন রূপে দেখবার এবং দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। এই সময়ে বঙ্কিম 'নবজীবন' পত্রিকায় যে প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করেন সেইগুলিই পরে কিছু পরিবর্তিত হয়ে তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব' নামক গ্রন্থে পুস্তকাকারে সংকলিত হয়। 'প্রচার' পত্রিকায় বঙ্কিম হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীর উপরেও এক প্রবন্ধমালা প্রকাশ করেন। 'ভগবদ্গীতা'র এক নতুন ভাষ্য রচনাতেও তিনি কিছুদিন

মনোনিবেশ করেছিলেন, যদিও শেষ পর্যন্ত তিনি একাজ অসমাপ্ত রেখে যান। ১৮৮৬ সালে বঙ্কিমের বিখ্যাত গ্রন্থ 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রকাশিত হয়। বহু প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র, পুরাণ ও মহাকাব্য আলোচনা করে বঙ্কিম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এক ঐতিহাসিক চরিত্রের রূপ দান করেন। তাঁর এই গবেষণা যে সম্পূর্ণ মৌলিক এবং অভিনব সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ মানব রূপে চিত্রিত করে বঙ্কিম তাঁর উপাসনাকে মানুষের স্বাভাবিক বীরপূজাপ্রবৃত্তির প্রকাশ বলে ঘোষণা করেন। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বঙ্কিমের অভিনব মতবাদ তাঁর কয়েকটি উপন্যাসকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে ; এগুলির মধ্যে আনন্দমঠ (১৮৮২), দেবীচৌধুরাণী (১৮৮৪) ও সীতারাম (১৮৮৭) উল্লেখযোগ্য। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির পাণ্ডিত্য অশিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত হিন্দু সমাজের উপর যে ধরণের প্রভাব বিস্তার করেছিল এযুগের উচ্চশিক্ষিত হিন্দুসমাজের উপর বঙ্কিমের প্রভাব ছিল ঠিক সেই ধরণের।

কবি নবীনচন্দ্র সেনও এই হিন্দু নবজাগরণ আন্দোলনের অন্যতম উদ্গাতা ছিলেন। নবীনচন্দ্র গীতা এবং মার্কণ্ডেয়চণ্ডীর বঙ্গানুবাদ করেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যেই একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল—হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে দেশবাসীর মনে শ্রদ্ধার ভাব ফিরিয়ে আনা। মহাভারতের, বিশেষতঃ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের কাহিনীকে তিনি নতুন আলোকে ব্যাখ্যা করেন। ভারতের বিভিন্ন বিবদমান জাতিগুলিকে এক সার্বজনীন ধর্মে এবং উদার সমাজব্যবস্থার বন্ধনে আবদ্ধ করে এক ভারতীয় মহা-জাতিগঠনের চেষ্টাই তিনি দেখেছিলেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মধ্যে। তাঁর তিনটি প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ—কুরুক্ষেত্র, রৈবতক ও প্রভাসের মধ্যেও আমরা এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাই। প্রাচীন ভারতের আদর্শকে বর্তমান যুগের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে যতদূর সম্ভব ফিরিয়ে আনার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন। কৃষ্ণ, ব্যাস, অর্জুন, প্রভৃতি সংস্কৃত মহাকাব্যের নায়কদের চরিত্রে প্রাচীন ভারতের যে আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছিল তার বিশদ ব্যাখ্যা আমরা পাই তাঁর রচনাবলীতে। কুরুক্ষেত্র পুস্তকে নবীনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের যে চরিত্র অঙ্কন করেছিলেন তা অনেকাংশে

বঙ্কিম-কল্পিত কৃষ্ণচরিত্রের অনুগামী হয়েছিল। এই কারণে সমসাময়িক 'নব্যভারত' নবীনচন্দ্রকে বঙ্কিমের অনুকরণকারী বলে অভিযুক্ত করেন এবং এই ব্যাপার নিয়ে বাদবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত নবীনচন্দ্র প্রতিপন্ন করেছিলেন যে কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে তাঁর কল্পনা সম্পূর্ণ নিজস্ব, বঙ্কিমের কাছে তিনি এবিষয়ে ঋণী ন'ন। কিন্তু তিনি একথাও স্বীকার করেন যে বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত্র' আগে না প্রকাশিত হলে শিক্ষিত সমাজে তাঁর বইগুলির এত সমাদর হ'ত না।

ভূদেব, বঙ্কিম, নবীন ছাড়াও এযুগের অনেক স্বল্পখ্যাত লেখকের রচনার মধ্যেও আমরা এই নব্যহিন্দুবাদের প্রভাব লক্ষ্য করি। জাতীয় চেতনার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী হিন্দুর মনে একটা দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় এবং স্বজাতিগরিমার ভাব জাগ্রত হতে থাকে এবং মুসলমান সমাজের অপেক্ষাকৃত অনগ্রসরতার জন্য এই জাতীয় চেতনা স্বাভাবিক ভাবেই হিন্দুত্বের আবরণে নিজেকে ভূষিত করে। রমেশ দত্ত প্রমুখ দেশপ্রেমিক লেখক এবং ঐতিহাসিকগণ যে কেবল হিন্দুসংস্কৃতিপ্রাণ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার গৌরব কীর্ত্তন করে আনন্দ পেতেন তা নয়; তাঁরা মারাঠা, শিখ এবং রাজপুতজাতির অভ্যুদয়কেও স্বাধীনতা সংগ্রামের অঙ্গরূপে চিত্রিত করতেন। রাজপুত, মারাঠা এবং শিখ এই তিন জাতির শত্রুই ছিল ভারতের মুসলমান রাজশক্তি। সুতরাং অনবরত তাদের গৌরব কীর্ত্তনের ফলে জাতীয় চেতনা ক্রমশই হিন্দুরূপ ধারণ করতে থাকে এবং একটা প্রচ্ছন্ন মুসলমান-বিদ্বেষের ভাব শিক্ষিত সমাজের মধ্যে প্রসার লাভ করে। পরবর্তীকালে এই ধরণের প্রচারের ফল বিষময় হয়েছিল সন্দেহ নেই।

হিন্দু নবজাগরণ আন্দোলনের আরও একটা বড় দিক ছিল, সেটা হ'ল ধর্ম তথা সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা। ব্রাহ্ম আন্দোলনের পাশে পাশেই কয়েকটি হিন্দু ধর্মসংস্কার আন্দোলন এযুগে গড়ে ওঠে। অবশ্য সংস্কারের চেয়ে সংরক্ষণের দিকেই এদের লক্ষ্য ছিল বেশী। এই আন্দোলনগুলির মধ্যে প্রথমেই দয়ানন্দ সরস্বতী প্রবর্ত্তিত আর্যসমাজ আন্দোলনের নাম করতে হয়। কয়েকটি বিষয়ে দয়ানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে

ব্রাহ্ম নেতাদের যথেষ্ট মতৈক্য ছিল কিন্তু মূলতঃ তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ পৃথক গোত্রের লোক। দয়ানন্দই প্রথম রব তোলেন—আমাদের বৈদিক সভ্যতার যুগে ফিরে যেতে হবে। বৈদিক ধর্মই তাঁর মতে আদি ও অকৃত্রিম আর্যধর্ম এবং বেদের মধ্যেই সকল সত্য, সকল ধর্ম এবং সকল বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব পাওয়া যাবে। বেদবাহ্য সকল ধর্ম এবং সকল শাস্ত্রই হয় মিথ্যা নয় আংশিক সত্য। রামমোহনের মতো দয়ানন্দও একেশ্বরবাদী ছিলেন এবং পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের তিনটি প্রধান অঙ্গ—বহু দেবদেবীর আরাধনা, প্রতিমা পূজা এবং পশুবলি—তিনটিরই তিনি বিরোধিতা করেন। দয়ানন্দ আরও বিশ্বাস করতেন যে ভারতবাসীর দুঃখকষ্টের একটি মূল কারণ হচ্ছে দেশে ম্লেচ্ছ ইসলাম এবং খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীগণের আগমন এইভাবে আর্যসমাজের মধ্যেই আমরা প্রথম হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার নগ্নরূপ প্রত্যক্ষ করি। দয়ানন্দই প্রথম অহিন্দুদের হিন্দু করবার জন্য শুদ্ধি আন্দোলনের প্রবর্তন করেন। এই আন্দোলনের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল সারা ভারতবর্ষে এক জাতি, এক সমাজ ও এক ধর্মের প্রতিষ্ঠা। সমাজ সংস্কার ব্যাপারে দয়ানন্দ কিছুটা প্রগতিপন্থী ছিলেন। তিনি জাতিভেদ প্রথার পরিবর্তন (বিলোপ নয়) চাইতেন, বাল্যবিবাহের বিরোধী ছিলেন এবং সমুদ্রযাত্রা করলে জাতিনাশ হবে এ কথা বিশ্বাস করতেন না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করতেন যদিও তাঁর ধারণা ছিল যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মূলসূত্রই বৈদিক সাহিত্যে খুঁজলে পাওয়া যাবে। কিন্তু এই সকল প্রগতিবাদী মতামত সত্ত্বেও দয়ানন্দের ইংরেজী ভাষা এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং সমস্ত আধুনিক রীতিনীতির প্রতি প্রচ্ছন্ন বিরোধিতার ভাব তাঁর আন্দোলনকে প্রতিক্রিয়াশীল করে তুলেছিল। শুদ্ধি আন্দোলন ও হরিদ্বারের বিখ্যাত গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয় আর্যসমাজের এই প্রতিক্রিয়াশীল রূপটিকে স্পষ্ট ফুটিয়ে তুলেছে। আর্যসমাজের প্রধান কেন্দ্রগুলি ছিল অবশ্য বাংলা দেশের বাহিরে—সংযুক্ত প্রদেশ এবং পাঞ্জাবে, এবং বাংলাদেশে এ আন্দোলনের প্রভাব খুব সামান্যই পড়েছিল। এদেশে প্রধানতঃ অবাঙালী সম্প্রদায়ের মধ্যেই এ আন্দোলন

সীমাবদ্ধ ছিল এবং বোধ হয় ধর্মবিষয়ে রক্ষণশীল মনোভাবকে আরও দৃঢ় করে তোলাই হয়েছিল এর একমাত্র ফল। বাংলাদেশে আর্য সমাজের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় দয়ানন্দের মৃত্যুর বহু পরে এবং এখানে এ আন্দোলন কোনো দিনই বিশেষ প্রবল হয়ে ওঠে নি।

Theosophical Societyর আন্দোলনকে আমরা এযুগের দ্বিতীয় সনাতনপন্থী সংস্কার আন্দোলন বলে অভিহিত করতে পারি। Theosophical Society প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় আমেরিকায় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দুজন অভারতীয়—মাডাম ব্লাভাট্স্কি ও কর্ণেল অল্‌কট্। কিন্তু ভারতবর্ষে এই আন্দোলনকে প্রবল করে তোলেন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম কর্ণধার শ্রীমতী অ্যানি বেশাণ্ট। ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য এবং তার বিশেষ প্রাণসত্বাকে পুনরুজ্জীবিত করাই ছিল Theosophical Society প্রবর্তিত আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য। ভারতের প্রাচীন যুগের আধ্যাত্মিকতাকে ফিরিয়ে না আনলে তার নবজাগরণ সম্ভব হবে না এই ছিল আন্দোলনের নেতাদের দৃঢ় বিশ্বাস। অ্যানি বেশাণ্ট বলতেন যে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতা নষ্ট হয়ে গেলে তার জাতীয় বৈশিষ্ট্যই নষ্ট হয়ে যাবে। হিন্দুধর্মই যে জগতের সব চেয়ে প্রাচীন এবং সব চেয়ে নিখুঁত ধর্ম এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। এত বড় দাবী সে যুগের কোনো ভারতীয় হিন্দুনেতাও করতে সাহস করেন নি। ভারতবর্ষই যে জগতের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ দেখিয়ে দেবে এবং পাশ্চাত্য জড়বাদের বিষময় ফল নষ্ট করবে এ কথা তাঁরা সদর্পে ঘোষণা করতেন, যদিও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সারাংশ ভারতবর্ষ গ্রহণ করুক এও ছিল তাঁদের কামনা।

প্রচলিত হিন্দু ধর্ম এবং সমাজ ব্যবস্থাকে মোটের উপর সমর্থন করলেও Theosophical Society'র নেতারা সামান্য কয়েকটি বিষয়ে কিছু সংস্কারের প্রস্তাবও করেছিলেন। শ্রীমতী বেশাণ্ট বলতেন যে সমাজসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা স্বয়ং মনুই স্বীকার করে গেছেন যদিও তাঁর মতে মনুর বিধানকে নিঃসংশয়ে জগতের শ্রেষ্ঠ সামাজিক বিধান বলা যেতে পারে। ভারতের নিপীড়িত জনগণের জাগতিক এবং

আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনও Theosophical Societyর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। জাতিভেদ প্রথাকে তাঁরা নীতির দিক থেকে নিন্দা না করলেও এর যুগোপযোগী পরিবর্তন সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন। বিশেষতঃ বংশগত জাতিভেদ প্রথার তাঁরা ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন, সমুদ্রযাত্রা এবং বাল্যবিবাহ নিরোধেও তাঁদের সমর্থন ছিল। কিন্তু বিধবাবিবাহের চেষ্টাকে তাঁরা অত্যন্ত নিন্দার্হ মনে করতেন এবং অবস্থাবিশেষে পুরুষের পক্ষে বহুবিবাহও তাঁরা সমর্থন করতেন। শ্রীমতী অ্যানি বেশান্টই কাশীর হিন্দু কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, যা ধীরে ধীরে বড় হয়ে ১৯১৫ সালে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। Theosophical Societyর মতবাদকে আমরা সনাতন হিন্দু ধর্ম এবং সমাজ ব্যবস্থার এক অকুণ্ঠ এবং অবিমিশ্র সমর্থন বলে মনে করতে পারি। একদল বিদেশী, ইউরোপীয় ও মার্কিণ, পণ্ডিতের মুখে এই ধরণের কথাবার্তা স্বভাবতই রক্ষণশীল হিন্দুদের মনে একটা বিরাট জাতীয় আত্মপ্রসাদের ভাব জাগায়। দক্ষিণ ভারতে এই আন্দোলন খুবই প্রবল হয়ে ওঠে এবং এর ফলে হিন্দুসমাজে সত্যকারের সংস্কার প্রচেষ্টা চাপা পড়ে যায়। প্রাচীন ব্যবস্থার সমর্থন করতে গিয়ে Theosophical Society'র নেতারা কতকগুলি প্রাচীন কুসংস্কারকেও প্রশ্রয় দেন এবং তাঁদের তথাকথিত অলৌকিক রহস্যোদ্ধারের চেষ্টা অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে Societyর প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। তা সত্ত্বেও Theosophical Society'র আন্দোলন যে এককালে বাংলা দেশে খুবই প্রবল হয়ে উঠেছিল একথা অস্বীকার করা যায় না এবং এই সাফল্যের মূলে খুব সম্ভব ছিল শ্রীমতী বেশান্টের ব্যক্তিগত খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা।

এযুগের সব চেয়ে শক্তিশালী ধর্ম আন্দোলন ছিল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রবর্তিত আন্দোলনের ধারা। রামকৃষ্ণের জীবনী (১৮৩৬-৮৬) আমাদের সকলেরই সুপরিচিত; তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার কোনো প্রয়োজন নেই। মহাত্মা গান্ধী এক জায়গায় বলেছেন—রামকৃষ্ণের জীবন হচ্ছে ধর্মের ব্যবহারিক প্রয়োগের কাহিনী। এযুগের যুক্তিবাদ এবং নাস্তিকতার দিনে রামকৃষ্ণ ছিলেন জীবন্ত ধর্মের প্রতিমূর্তি। রামকৃষ্ণ

তাঁর সমসাময়িক কালের বাংলা দেশের অনেক কর্মবীর, চিন্তানায়ক এবং সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং তাঁরা সকলেই তাঁর চরিত্রমাধুর্য, ধর্মপ্রাণতা এবং আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে গিরিশ ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর সাধক শ্রীঅরবিন্দের মত রামকৃষ্ণ লোকচক্ষুর আড়ালে আত্ম-গোপন করে থাকতে চাইতেন না। তাঁর জীবদ্দশাতেই তিনি অগণিত ভক্তের হৃদয় জয় করেছিলেন এবং যাঁরা তাঁর সঙ্গে ধর্মবিষয়ে একমত ছিলেন না, তাঁরাও তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন না করে পারেন নি। রামকৃষ্ণের ধর্মমত বিশ্লেষণ করে আমরা দেখি যে তিনি হিন্দুধর্মের তুচ্ছতম নির্দেশও সমর্থন করতেন। কিন্তু হিন্দুধর্মের এত বড় সমর্থক হয়েও তিনি ধর্ম-ব্যাপারে সঙ্কীর্ণ মনের পরিচয় দেন নি। সব ধর্মই যে সত্য, সবার লক্ষ্যই যে এক, এ কথা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাঁর এই উদার মতবাদই শেষ পর্যন্ত হিন্দুধর্মের সংস্কার প্রচেষ্টার মূলে কুঠারাঘাত করে এবং সনাতন ধর্মে যাঁদের আস্থা চলে গিয়েছিল তাঁদের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনে। ধর্ম নিয়ে দলাদলি করা এবং বিভিন্ন উপাসকসম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষের ভাব ঢুকিয়ে দেওয়াকে তিনি মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন এবং এইখানেই ব্রাহ্ম সমাজের নেতাদের সঙ্গে তাঁর মূলগত পার্থক্য ছিল।

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে রামকৃষ্ণের বাণীর বহুল প্রচার করে-ছিলেন তাঁর প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)। ১৮৯৩ সালে শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদান করে বিবেকানন্দ সহসা আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন এবং তারপর চার বৎসর ধরে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তাঁর গুরুর বাণী প্রচার করেন। তাঁর পূর্বে রামমোহন এবং কেশব সেনও ইউরোপে ভারতবর্ষের মুখপাত্র হয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানে স্বদেশের গৌরব বর্ধন করেছিলেন কিন্তু তাঁরা বিবেকানন্দের মত সনাতনপন্থী হিন্দু ছিলেন না। তাই বিবেকানন্দের গৌরব সনাতনপন্থী হিন্দুদের মনে যে আত্মশ্লাঘার ভাব জাগিয়েছিল এবং তাদের মধ্যে যে

উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল রামমোহন বা কেশব সেনের গৌরব তা করতে পারে নি। ইউরোপ পর্যটনের সময়ে বিবেকানন্দের অনেক বিদেশী শিষ্যও জুটেছিল। তাঁদের মধ্যে ম্যাডাম লুই, মিঃ স্যাণ্ড্‌স্‌বার্গ এবং মিস্ মার্গারেট নোব্‌লের নাম উল্লেখযোগ্য। মিস্ নোব্‌ল্ কিছুদিন পরে ভারতে চলে আসেন এবং ভগিনী নিবেদিতা নাম গ্রহণ করে সমাজসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ৩৯ বৎসর বয়সে বিবেকানন্দের অকালমৃত্যু ঘটে। বিবেকানন্দের ধর্মবিশ্বাস এবং রামকৃষ্ণের ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে কোনো মূলগত পার্থক্য ছিল না। কিন্তু বিবেকানন্দ নিজে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন, এবং সে যুগের উচ্চশিক্ষিত ভারতীয়ের মত বেন্থামের Utilitarian মতবাদের প্রভাব সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। সেই জন্যই তাঁর ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে রাজনৈতিক এবং সামাজিক চেতনার অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখা যায়। বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন যে আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে হিন্দুরা জগতের যে কোনো জাতির চেয়ে বড় এবং মানবজাতির আধ্যাত্মিক গুরু হিসাবে আধুনিক জগতে ভারতবর্ষের একটা বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু জগৎকে অধ্যাত্মবিষয়ে শিক্ষা দেবার আগে ভারতবর্ষকে নিজ অবস্থার উন্নতি সাধন করে জগতের শ্রদ্ধাভাজন হতে হবে। যদিও বিবেকানন্দ কোনোদিন সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন নি, তাঁর অন্তরে চিরকালই একটা তীব্র দেশপ্রেমের ভাব ছিল এবং এক স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন। তিনি বলতেন যে বর্তমানযুগে ভারতের সবচেয়ে বড় অভাব খাদ্যের, আধ্যাত্মিকতার নয়। ভোগসর্বস্ব পাশ্চাত্যেরই প্রয়োজন আধ্যাত্মিকতার। দেশ হতে সকল সামাজিক অত্যাচার এবং অন্ধ ভক্তির মূলোচ্ছেদ না করলে ভারতের উন্নতি অসম্ভব একথা তিনি বারংবার বলতেন। ভারতের আধ্যাত্মিকতাকে তার পুরাতন গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে দেশবাসীর শারীরিক ও মানসিক জড়তা দূর করে তাদের সত্যকারের মানুষ হওয়ার শিক্ষা দিতে হবে এই ছিল তাঁর ধারণা। জাতীয় কংগ্রেসের কর্মপন্থায় কিন্তু বিবেকানন্দের কোনোদিনই

আস্থা ছিল না এবং কংগ্রেসপরিচালিত রাজনৈতিক আন্দোলনকেও তিনি ভারতবাসীর পক্ষে হেয় মনে করতেন। বরিশালের স্বনামধন্য কংগ্রেস নেতা অশ্বিনীকুমার দত্তের সঙ্গে কথোপকথনে তিনি স্পষ্টভাবে এই মত ব্যক্ত করেছিলেন। জাতীয় কল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গ করতে তিনি দেশের যুবকদের ডাক দিয়েছিলেন যদিও সে আহ্বানে বিশেষ সাড়া আসে নি। সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ প্রচলিত অর্থে প্রগতিপন্থী ছিলেন না যদিও পাশ্চাত্য সভ্যতার মঙ্গলময় দিকটা ভারতবাসী গ্রহণ করুক এ ছিল তাঁর আন্তরিক কামনা।

বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভার পড়ে বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের উপর। ১৮৯৭ সালে বিবেকানন্দ বেলুড় ও আলমোড়ায় তরুণ সন্ন্যাসীদের সমাজ-সেবার কাজে শিক্ষা দেবার জন্য দুটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। পর-বৎসর হতেই মিশনের সেবার কাজ আরম্ভ হয় এবং ১৯০০ সালে মাদ্রাজ, কাশী ও মুর্শিদাবাদে মিশনের তিনটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বিবেকানন্দের শিষ্যদের পরিচালনায় মিশনের কাজ আরও ব্যাপক হয়ে ওঠে। এযুগের বিবেকানন্দ-শিষ্যদের মধ্যে সব চেয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। নব্যহিন্দুবাদের প্রচারকার্য এঁর হাতে এক নতুন মহিমা লাভ করে এবং হিন্দু শিল্পকলা, হিন্দু গার্হস্থ্যজীবন, হিন্দু সামাজিক প্রথাপদ্ধতি এমন কি হিন্দু রূপকথাও এঁর লেখনীর স্পর্শ পেয়ে লোকচক্ষুতে নতুন সুষমামণ্ডিত রূপে প্রকাশিত হয়। মিশনের নেতারা বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদকে নব্যভারতের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দুদের ধর্ম করে তুলতে চেয়েছিলেন এবং এই অদ্বৈতবাদকে ভিত্তি করেই যে মানুষের চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব একথাও তাঁরা বিশ্বাস করতেন।

সব ধর্মের সত্যতায় বিশ্বাসী এই মিশন কোনোদিন শুদ্ধি আন্দোলনে যোগদান করে নি বা নতুন কোনো ধর্মসম্প্রদায় গড়ে তোলবার ইচ্ছা প্রকাশ করে নি। সমাজসেবাকে মিশন ধর্মজীবনের একটা প্রধান অঙ্গ বলে মেনে নিয়েছে এবং কার্যসূচীর গোড়াতেই তাকে স্থান

দিয়েছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণীর বহুল প্রচারের জন্য কতকগুলি সাময়িক পত্রও মিশনের পরিচালনায় আছে এবং ইউরোপ আমেরিকা-তেও মিশনের কয়েকটি শাখা স্থাপিত হয়েছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন ভারতের জাতীয় জীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে সন্দেহ নেই। ভিতরে ও বাহিরে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করে জাতীয় আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে আনতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে এই আন্দোলন। পরোক্ষভাবে বিবেকানন্দের বাণী আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকেও সাহায্য করেছে এবং দেশের বিপ্লবী কর্মীদের মনে অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

আন্দোলনের অন্ধকার দিক সম্বন্ধেও আমাদের অজ্ঞ থাকা উচিত নয়। একটা জাতীয় অহমিকার ভাব সৃষ্টি করে এই আন্দোলন পরোক্ষ ভাবে আমাদের সমাজের অনেক প্রয়োজনীয় সংস্কারকে বাধা দিয়েছে। মিশনের সমাজসেবা বা লোকহিতৈষণামূলক কাজগুলি সাময়িকভাবে কল্যাণকর হলেও সত্যকারের দেশগঠনের কাজ তার দ্বারা হয়নি। মিশনের জনহিতৈষণামূলক কাজের গুরুত্বও স্বাধীনতালাভের পর সমাজসেবক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে কমে যেতে বাধ্য। কিন্তু যে আধ্যাত্মিক ভাবসম্পদের ধারক ও বাহক হয়েছে এই মিশন, সত্যকারের ধার্মিক লোকদের কাছে তার মূল্য চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকবে।

গ্রন্থপঞ্জী

Romain Rolland, *The Life of Ramakrishna* (Trans. E. F. Malcolm Smith) (1931)

The Life of Vivekananda And The Universal Gospel (Trans. E. F. Malcolm-Smith) (1937)

The Life of Vivekananda by his Eastern and Western disciples 2 Volumes (1933)

H. B. Sarda (Ed.) *Dayanand Commemoration Volume* (1933)

Guide And Index To Annie Besant : Builder of New India, 2 Volumes (1942)

J. N. Farquhar, *Modern Religious Movements In India* (1915)

J. N. Sarkar, *India Through The Ages* (1928)

A. Sen, *Notes On The Bengal Renaissance* (1946)

নবীনচন্দ্র সেন, আমার জীবন, ৫ খণ্ড (১৯০৭-১৩)

বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ)—কৃষ্ণচরিত্র (১৩৫৩), ধর্মতত্ত্ব (১৩৫৭), শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১৩৫৭)

প্রমথনাথ বিশী (সম্পাদিত), ভূদেব-রচনাসম্ভার (১৩৬৪ সন)

আর্যসমাজ ও স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী

পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল হিসাবে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে যে-কয়টি ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলন ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল, আর্যসমাজ আন্দোলন তাদের মধ্যে অন্যতম। বাংলা দেশে ব্রাহ্মসমাজ ও বোম্বাই-এ প্রার্থনা সমাজ সেযুগে যে-ধরনের আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, পাঞ্জাব রাজপুতানা ও উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশে আর্যসমাজ প্রায় সেই রকম আলোড়নই এনে দিয়েছিল বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হবে না। ব্রাহ্মসমাজ ও প্রার্থনা সমাজের তুলনায় আর্যসমাজের আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্যই অনেক বেশী রক্ষণশীল ও ভারতীয়-ভাবাপন্ন ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ ও প্রার্থনা সমাজের মতো আর্যসমাজের প্রভাব কেবলমাত্র শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, জনসাধারণ (mass) বলতে আমরা বর্তমানে যা বুঝি, তাকেও কিছুটা স্পর্শ করেছিল। সেই হিসাবে প্রথম দুটি আন্দোলনের তুলনায় আর্য-সমাজ আন্দোলনের সম্ভাবনা অনেক ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী ছিল বলেই মনে হয়। আর্যসমাজের উগ্র হিন্দুয়ানি মনোভাব ও লালা লাজপত রায় প্রমুখ দেশনেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগের জন্য সরকারী মহলে কেউ কেউ একে প্রচ্ছন্ন ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন ব'লে মনে করেছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দলগতভাবে এই সমাজের কোন রাজ-নৈতিক ভূমিকা ছিল না।

আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ১৮২৪ খ্রীঃ কাথিয়াওয়াড়ের এক সম্পন্ন ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। গার্হস্থ্য আশ্রমে তাঁর নাম ছিল মূলশঙ্কর। বাল্যে ও কৈশোরে তাঁর শিক্ষাদীক্ষা সবই হয়েছিল প্রাচীন প্রথামত, এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ইংরেজী বর্ণমালার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেনি। তবে নিজে ইংরেজী শিক্ষা না পেলেও সেই শিক্ষার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলের সঙ্গে দয়ানন্দ অপরিচিত ছিলেন না,—পরবর্তী কালে তাঁর সমস্ত শক্তিই নিয়োজিত হয়েছিল সেই

শিক্ষার কুফলগুলি দূর করার চেষ্টায়। সংস্কৃত ভাষায় দয়ানন্দ অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, গুজরাটি ও হিন্দী ভাষাও তাঁর ভাল করেই শেখা ছিল। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র, বিশেষতঃ বেদ-বেদান্ত তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল বলা চলে, এবং শাস্ত্রীয় বিচারে প্রতিপক্ষের পণ্ডিতদের পরাজিত করা এইজন্য তাঁর পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছিল।

কৈশোরেই মূর্তিপূজা নিয়ে পিতার সঙ্গে মূলশঙ্করের বিরোধ বেধেছিল এবং কথিত আছে, পিতার নির্দেশ লঙ্ঘন ক'রে তিনি এক শিবরাত্রির রাত্রে তাঁর উপবাস ভঙ্গ করেন। ১৮৪৬ খ্রীঃ মাত্র ২২ বৎসর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করেন ও কঠোর তপস্যায় রত হন। এই অবস্থায় ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। এঁদের মধ্যে মথুরার স্বামী বিরজানন্দ সরস্বতী দয়ানন্দের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ভারতের সর্বত্র পৌরাণিক হিন্দুধর্মের পরিবর্তে বৈদিক হিন্দুধর্ম প্রচারের প্রেরণা দয়ানন্দ নাকি এই সন্ন্যাসীর কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। ১৮৬৩ খ্রীঃ দয়ানন্দ বৈদিক ধর্ম প্রচারের জন্য তাঁর ভারত-পরিক্রমা শুরু করেন। বিভিন্ন স্থানে বহু সনাতনপন্থী পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর শাস্ত্রীয় বিচার হয় এবং কাশীর বিচার-সভায় জয়লাভের পর তাঁর খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। পাঞ্জাব, রাজপুতানা, গুজরাট ও উত্তর প্রদেশে দয়ানন্দ বিশেষ সাফল্য লাভ করেন, দেশীয় রাজা ও জমিদারেরা কয়েকজন তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আবার কোন কোন স্থানে তাঁর প্রতিপক্ষেরা তাঁকে যুক্তিতর্কে পরাজিত করতে না পেরে হত্যা করবার চেষ্টাও করেন। বাংলাদেশে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দয়ানন্দের সাক্ষাৎকার ঘটে। ১৮৭৪ খ্রীঃ দয়ানন্দের বিখ্যাত গ্রন্থ 'সত্যার্থপ্রকাশ' রচিত হয়, এর মধ্যেই তাঁর ধর্ম ও সমাজ-সম্বন্ধীয় চিন্তাধারার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। বোম্বাই পর্যটনের সময় দয়ানন্দ ব্রাহ্ম ও প্রার্থনা সমাজের নেতাদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর বিস্তর পার্থক্য থাকায় তাঁদের পক্ষে পরস্পরের সহযোগিতা করা সম্ভবপর হয়নি। ১৮৭৫ খ্রীঃ বোম্বাই-এ প্রথম আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৭৪ হ'তে ১৮৮১ খ্রীঃ পর্যন্ত সাত বৎসর দয়ানন্দ মাদাম ব্লাভাট্স্কি

প্রতিষ্ঠিত ভারতের থিওসফিক্যাল সোসাইটির সঙ্গে একযোগে কাজ করেছিলেন, কিন্তু ১৮৮১ খ্রীঃ প্রায় সমগোত্রীয় এই দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিভেদ ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় ও দয়ানন্দ থিওসফিক্যাল সোসাইটির সঙ্গে তাঁর সংযোগ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করেন। ১৮৮২ খ্রীঃ তাঁর চেষ্টায় 'গৌরক্ষিণী সভা' স্থাপিত হয় ভারতে গো-রক্ষার উদ্দেশ্যে। পরের বৎসর অর্থাৎ ১৮৮৩ খ্রীঃ প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে দয়ানন্দ ইহলীলা সংবরণ করেন।

দয়ানন্দের মৃত্যুর পর তাঁর প্রধান অনুচরবর্গ তাঁর আরব্ধ কাজ চালিয়ে নিয়ে যান। এঁদের মধ্যে লালা হংসরাজ, পণ্ডিত গুরুদত্ত, লালা লাজপত রায় এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রধান ছিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই কিন্তু আর্যসমাজের মধ্যে দুটি বিরোধী দলের সৃষ্টি হয়; রক্ষণশীল দল 'মহাত্মা' বা 'নিরামিষাশী' (vegetarian) দল নামে ও সংস্কারকামী দল 'কলেজ' দল নামে পরিচিত হন। শেষোক্ত দল হিন্দুসমাজে ব্যাপক সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন, বৈদিক হিন্দুধর্মের নামে তাঁরা বহু পাশ্চাত্য প্রথা ও সামাজিক আদর্শ গ্রহণ করেন। লাহোরের 'দয়ানন্দ অ্যাংলো-বেদিক' (D.A.V.) কলেজ এঁদেরই কীর্তি। 'মহাত্মা' দল আচারে-ব্যবহারে নিজেদের ভারতীয়ত্ব সম্পূর্ণভাবে অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছিলেন। হরিদ্বারের বিখ্যাত 'গুরুকুল' বিদ্যালয় তাঁদের প্রতিষ্ঠান। ১৮৯২ খ্রীঃ এই দুই দলের মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধ দেখা দেয়, কিন্তু এই অন্তর্বিরোধ সত্ত্বেও আর্যসমাজের জনপ্রিয়তা বিশেষ হ্রাস পায়নি। ১৯১১ খ্রীঃ লোকগণনায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে প্রায় আড়াই লক্ষ স্ত্রী-পুরুষ নিজেদের আর্যসমাজী ব'লে পরিচয় দেন এবং পরোক্ষভাবে আরও অনেক লোক যে সমাজের প্রভাবে এসেছিলেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার তুলনায় অবশ্য আর্য-সমাজের সভ্যসংখ্যা খুব বেশী ছিল না, কিন্তু উত্তর-পশ্চিম ভারতে, বিশেষতঃ পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে বহু প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি এই সমাজের পৃষ্ঠপোষকরূপে অবতীর্ণ হন ও তার ফলে ঐ অঞ্চলের হিন্দুদের মধ্যে সাময়িকভাবে একটি বিশেষ সাড়া পড়ে যায়। একমাত্র মাদ্রাজ ভিন্ন

ভারতের আর সব প্রদেশেই আর্যসমাজের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতে আর্যসমাজ কোন দিনই বিশেষ প্রভাবশালী হয়ে উঠতে পারেনি। পূর্ব ভারতে ব্রাহ্মসমাজ ও দক্ষিণ ভারতে থিওসফিক্যাল সোসাইটি আর্যসমাজের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়।

স্বামী দয়ানন্দের আন্দোলনের প্রকৃত রূপটি বুঝতে হ'লে তাঁর ধর্ম-ও সমাজ-সংক্রান্ত চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। দয়ানন্দের রচিত 'সত্যার্থপ্রকাশ'ই এ-বিষয়ে সবচেয়ে প্রামাণিক পুস্তক। ধর্ম-বিষয়ে দয়ানন্দ নিজেকে কোন নতুন মতবাদ বা সম্প্রদায়ের জনক ব'লে দাবী করেননি। নিজেকে সব সময়ে হিন্দু বলেই তিনি পরিচয় দিতেন। তবে রামমোহনের মতো দয়ানন্দের হিন্দুধর্মও পৌরাণিক এবং প্রচলিত হিন্দুধর্ম হ'তে বহুলাংশে ভিন্ন ছিল। রামমোহন বেদান্ত বা উপনিষৎকে হিন্দুধর্মের মূল গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, দয়ানন্দ বেদকেই হিন্দুর তথা আর্যজাতির একমাত্র প্রামাণিক শাস্ত্র বলে দাবি করেন। অবশ্য বেদাঙ্গ ও বেদান্তকেও তিনি বেদের অংশ ব'লে মনে করতেন, কিন্তু বেদের (অর্থাৎ সংহিতা ও ব্রাহ্মণের) প্রামাণ্যই তাঁর কাছে সব চেয়ে বড় ছিল। 'বৈদিক ধর্মে ফিরে যাও'—এই ছিল দয়ানন্দের প্রধান বাণী। সমস্ত ধর্মের, সমস্ত সত্যের এমন কি সমস্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বেরও মূল বেদের মধ্যে নিহিত আছে ব'লে দয়ানন্দ বিশ্বাস করতেন। প্রচলিত সায়ন-ভাষ্যকে অগ্রাহ্য ক'রে তিনি নিজেই বেদের টীকা রচনা করেছিলেন, যদিও তাঁর প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের বাইরে সে টীকার বিশেষ সমাদর হয়নি। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতিটি আবিষ্কার, এমন কি মারণাস্ত্রগুলিও, বৈদিক যুগের আর্যদের কাছে সুপরিচিত ছিল ব'লে তিনি দাবি করতেন। এই দাবির সমর্থনে কয়েকটি বৈদিক সূক্তের অভিনব ব্যাখ্যা করা দয়ানন্দের মতো সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের পক্ষে অবশ্যই খুব কঠিন ছিল না, তবে দেশের উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে সেই ব্যাখ্যা কতদূর গ্রহণযোগ্য হয়েছিল, তা সন্দেহের বিষয়। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ফার্কুহার (J. N. Farquhar) মনে করেন, দয়ানন্দ তাঁর এই ব্যাখ্যা নিজেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন না,

শুধু আধুনিক সভ্যতার তুলনায় বৈদিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার জন্যই তিনি এই ধরনের যুক্তি প্রয়োগ করতেন। ফার্কুহারের এই মতের স্বপক্ষে কিন্তু বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না, দয়ানন্দের এ বিশ্বাস খুব সম্ভব আন্তরিক ছিল। বেদই সমস্ত ধর্মের ভিত্তিস্থানীয় ব'লে দয়ানন্দ সকল জাতির, সকল বর্ণের স্ত্রীপুরুষের বেদপাঠে অধিকার আছে বলে ঘোষণা করেন।

বেদবাহ্য অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্র, বিশেষতঃ স্মৃতি ও পুরাণের প্রতি দয়ানন্দের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। মনুস্মৃতি ভিন্ন অন্যান্য স্মৃতিশাস্ত্র ও অষ্টাদশ পুরাণকে তিনি অজ্ঞ স্বার্থপর লোকের রচনা বলেই মনে করতেন। রামমোহনের মতো দয়ানন্দও ব্রহ্ম বা পরমাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু বহু দেবদেবীর পূজা প্রতিমাপূজা ও পশুবলি—পৌরাণিক হিন্দুধর্মের এই তিনটি প্রধান অঙ্গের তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। বিভিন্ন পৌরাণিক দেবদেবীকে দয়ানন্দ সুদূর অতীতের জ্ঞানী ও বিচক্ষণ 'মানুষ' বলেই মনে করতেন। পুরোহিত-তন্ত্র ও মূর্তিপূজার নিন্দায় দয়ানন্দ প্রায় রামমোহনের মতোই মুখর ছিলেন। বৈদিক যুগে আর্যেরা গোমাংস-ভক্ষণে অভ্যস্ত ছিলেন ব'লে তিনি প্রথম জীবনে গোহত্যার সমর্থন করেন, কিন্তু পরে এ-বিষয়ে তাঁর মতের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয় ও মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে তিনি 'গৌরক্ষিণী সভা' স্থাপন করেন।

ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মের প্রতি দয়ানন্দের মনোভাব অত্যন্ত বিরূপ ছিল। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ভারতবর্ষের সমস্ত দুঃখদুর্দশার জন্য ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মের এ-দেশে আগমনই প্রধানতঃ দায়ী। 'গৌরক্ষিণী সভার' প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষে এই সব বহিরাগত ধর্মের প্রভাব নষ্ট করা। আর্য-সমাজের একটি বিশেষ কার্য-কলাপের মধ্যে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার রূপটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, সেটি হচ্ছে দয়ানন্দের প্রবর্তিত 'শুদ্ধি-আন্দোলন'। ভারতবর্ষে এক জাতি, এক ধর্ম ও এক সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পরিচালিত এই আন্দোলনের আসল লক্ষ্য ছিল ভারতীয় অ-হিন্দুদের হিন্দুধর্মে দীক্ষা-দান। এই আন্দোলনের ফলে

ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি না পেলেও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ যে প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

হিন্দুসমাজের পুনর্গঠন-কল্পে দয়ানন্দ কতকগুলি সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেন। প্রথমতঃ, তিনি হিন্দুদের মধ্যে দীর্ঘ-কাল-প্রচলিত জাতিভেদ-প্রথার পরিবর্তন কামনা করেন। বংশানুক্রমিক জাতিভেদ-প্রথায় তাঁর বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না। বেদপাঠ ও ব্যাখ্যায় সকল জাতির (বা বর্ণের) সমান অধিকার আছে ব'লে তিনি ঘোষণা করেন। আর্যসমাজ-পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলির কোথাও জাতিভেদের ভিত্তিতে বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হ'ত না। নিম্নবর্ণের এমন কি অস্পৃশ্য জাতির বালক-বালিকাদের মধ্যে শিক্ষা-প্রসারের জন্য আর্যসমাজ বহু চেষ্টা করে। আর্যসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনা-সভাগুলিতেও নিম্নবর্ণের লোকেদের প্রার্থনা-পরিচালনার অধিকার স্বীকৃত হয়।

দয়ানন্দ স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন। বৈদিক যুগে অপ্রচলিত বাল্যবিবাহ-প্রথার তিনি নিন্দা করেন। পুরুষের পক্ষে ২৫ ও নারীর পক্ষে ১৬ বৎসর বয়সই বিবাহের ন্যূনতম বয়স হওয়া উচিত ব'লে দয়ানন্দ মনে করতেন। সাধারণতঃ বিধবা ও বিপত্নীক উভয়ের পুনর্বিবাহের বিরোধী হলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি বিধবাবিবাহের সমর্থন করতেন। স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের ব্যাপারেও দয়ানন্দের যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যায়। অনাথা বালিকাদের শিক্ষাদানের জন্য তিনি পাঞ্জাবের জলন্ধরে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্মসমাজ পরিচালিত 'ব্রাহ্মিকা সভা'র অনুকরণে আর্যসমাজ-পরিচালিত 'স্ত্রীসভা' স্থাপিত হয়।

অনুন্নত ও অস্পৃশ্য জাতির লোকেদের সামাজিক উন্নতির জন্য আর্য-সমাজ নানাভাবে চেষ্টা করে। বিশেষতঃ যাতে হিন্দুসমাজের এই অবজ্ঞাত ও অবহেলিত অংশের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রবেশ লাভ করতে না পারে, তার জন্য দয়ানন্দের অনুবর্তীরা সচেষ্ট হন। লালা লাজপত রায় এই উদ্দেশ্যেই লাহোরে 'বেদিক স্যালভেশান আর্মি' গঠন করেন। কোন কোন ব্যাপারে দয়ানন্দের সংস্কারপ্রচেষ্টা সে-যুগের রক্ষণশীল মনোভাবকে

অত্যন্ত রূঢ়ভাবে আঘাত করে। পৌরাণিক যুগে প্রচলিত 'নিয়োগ' প্রথাকে সমর্থন ক'রে দয়ানন্দ প্রবল সামাজিক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন। সমুদ্র-যাত্রার বিরুদ্ধে সে-যুগের হিন্দুসমাজে যে দৃঢ়মূল সংস্কার ছিল, দয়ানন্দ তারও উচ্ছেদ করবার চেষ্টা করেন।

শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপারেও দয়ানন্দ ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজের একটি সক্রিয় ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও দয়ানন্দ মনে করতেন যে, তাদের মূল তত্ত্ব সবই বেদের মধ্যে নিহিত আছে। তাঁর ধর্মচিন্তা জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য দয়ানন্দ নিজেই কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁর বিদ্যালয়ের পণ্ডিতেরাই অনেক সময়ে প্রচ্ছন্নভাবে তাঁর ভাবের বিরোধিতা করতেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের মানসে পরবর্তী কালে লাহোরে 'দয়ানন্দ অ্যাংলো-বেদিক কলেজ' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এক হিসাবে এটি স্যর সৈয়দ আহ্‌মেদ-প্রতিষ্ঠিত আলিগড় অ্যাংলো-মহমেডান কলেজেরই (বর্তমানে যা আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে) হিন্দু সংস্করণ। কিন্তু আর্যসমাজের রক্ষণশীল অংশ এই কলেজের প্রদত্ত শিক্ষায় বিশেষ সন্তুষ্ট হ'তে পারেননি। তাই তাঁরা ১৯০২ খ্রীঃ হরিদ্বারে বিখ্যাত 'গুরুকুল বিদ্যালয়' স্থাপন করেন। সাত বৎসর বয়সের বালকদের এই বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে গ্রহণ করা হ'ত এবং পঁচিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাদের এখানে থেকে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন ক'রে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য, প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র (বিশেষতঃ বেদ), ইংরেজী ভাষা এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানও (মাতৃভাষার মাধ্যমে) শিক্ষা করতে হ'ত। ছাত্রেরা এখানে প্রায় বিনা-বেতনেই অধ্যয়নের সুযোগ লাভ ক'রত, শিক্ষকেরা মাত্র নিজেদের ভরণপোষণের উপযুক্ত পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন। যে আঠারো বৎসর ছাত্রেরা এখানে বিদ্যাভ্যাসের সুযোগ পেত, তার মধ্যে একবারও তাদের আত্মীয় পরিজনের কাছে ফিরে যাবার অনুমতি দেওয়া হ'ত না, শিক্ষকেরাই এই কয় বৎসর তাদের অভিভাবক ও সঙ্গী হিসাবে থাকতেন। কোনরকম জাতি বা বর্ণগত বিভেদকে আর্যসমাজ-পরিচালিত এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে

প্রশ্রয় দেওয়া হ'ত না। সে যুগের বর্ণহিন্দু সমাজের রক্ষণশীল মনোভাবের কথা স্মরণ করলে আর্যসমাজের এই উদারতা ও দৃঢ়তার প্রশংসা না ক'রে পারা যায় না। পরবর্তী কালে এই প্রতিষ্ঠানের অনুকরণে পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আরও কয়েকটি 'গুরুকুল' প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত না থাকলেও পরোক্ষভাবে দয়ানন্দ তাঁর দেশবাসীর মধ্যে জাতীয়তা-বোধ জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। ভারতবর্ষ ভারতবাসীর জন্য বা আর্যভূমি আর্যজাতির জন্য এই ধরনের মনোভাবকে দয়ানন্দ ও তাঁর অনুবর্তীরা ক্রমশই দৃঢ় ক'রে তুলছিলেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরবের কথা বারবার দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েও তাঁরা এই দেশপ্রেমের ভাবকেই সুগভীর করছিলেন। দয়ানন্দ স্পষ্টই বলতেন যে, মদ্যপায়ী, গোমাংসভোজী বিধর্মীদের ভারতে আগমনই এ-দেশের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ। 'ভগবদ্গীতা'র অভিনব ব্যাখ্যা ক'রে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে. দুর্বৃত্ত অত্যাচারী লোকেদের হত্যা করাও ধর্মের দৃষ্টিতে পাপ কাজ ব'লে বিবেচিত হয় না। পরবর্তী কালে দয়ানন্দের এই প্রকার উক্তি বহু ভারতীয় সন্ত্রাসবাদীকে হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হ'তে প্রেরণা দিয়েছিল। দয়ানন্দের অনুবর্তীদের মধ্যে কারও কারও পাঞ্জাবের বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল। এঁদের মধ্যে লালা লাজপত রায়, অজিত সিং, শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা, ও ভাই পরমানন্দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে দয়ানন্দের আর্যসমাজ-আন্দোলন বিশেষ সাফল্য লাভ করে। পাঞ্জাবে ১৮৬৩ খ্রীঃ ব্রাহ্মসমাজের একটি শাখা স্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু আর্যসমাজের প্রবল প্রতিযোগিতার জন্য ব্রাহ্ম আন্দোলন পাঞ্জাবে শীঘ্রই স্তিমিত হয়ে পড়ে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে বৈদেশিক চিন্তাধারা ও সভ্যতার প্রভাবকে সীমাবদ্ধ রাখার কাজে আর্যসমাজ আংশিক সাফল্য লাভ করেছিল, সন্দেহ নেই। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের গণ্ডীর বাইরেও জনমানসে দয়ানন্দের প্রভাব কিছুটা রেখাপাত করেছিল। জনচিত্তকে আকর্ষণ করার ব্যাপারে দয়ানন্দের এই সাফল্য

সে-যুগের সমাজ-সংস্কারকদের অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। প্রচলিত পৌরাণিক হিন্দুধর্মের কুসংস্কারগুলিও এই আন্দোলনের ফলে কিছু কিছু দূর হয়। সব শেষে এ-কথাও স্বীকার করতে হবে যে, পরোক্ষভাবে দয়ানন্দের আন্দোলন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে—বিশেষতঃ বিপ্লবী আন্দোলনকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছিল।

J. N. Farquhar, *Modern Religious Movements In India* (1915)

Harbilas Sarda (Ed.) *Dayanand Commemoration Volume* (1933)

Valentine Chirol, *Indian Unrest* (1910)

Dayananda Saraswati, *An English Translation of the Satyarth Prakash of Dayananda Saraswati* (Translated by Durga Prasad) (1908)

ভারতের নবজাগরণে স্বামী বিবেকানন্দ

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের নবজাগরণের ইতিহাসে তিনটি কালানু-ক্রমিক স্তর বা পর্যায়ের উল্লেখ করেছেন আচার্য যদুনাথ 'India Through The Ages' নামক গ্রন্থে। প্রথম পর্যায়ে ইংরেজী সাহিত্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার ফলে ভারতবাসীর মধ্যযুগীয় তন্দ্রার ভাব ধীরে ধীরে অপসৃত হ'তে থাকে। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য, বিশেষতঃ গদ্য-সাহিত্যের জন্ম হয় এই যুগে। দ্বিতীয় পর্যায়ে সমাজ ও ধর্ম-সংস্কারের প্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে দেখা দেয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে। এর ফলে মধ্যযুগীয় সামাজিক মূল্যবোধ এবং জীবনাদর্শ এক প্রচণ্ড আঘাত পায়, যদিও সে আঘাত সমাজের সকল স্তরে অনুভূত হয়নি। তৃতীয় বা শেষ পর্যায়ে আসে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ এবং তার অনিবার্য পরিণতিরূপে স্বাধীনতা-সংগ্রামের সূচনা। নবজাগরণ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নায়ক স্বামী বিবেকানন্দ আবির্ভূত হন দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগের সন্ধিক্ষণে। প্রথম দুই যুগের পূর্ণ পরিণতি ও তৃতীয় যুগের সম্ভাবনা তাঁর জীবনের মধ্যে আমরা স্পষ্টই লক্ষ্য করি।

(১৮৬৩ খ্রীঃ জানুয়ারি মাসে নরেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম হলেও স্বামী বিবেকানন্দ-রূপে তিনি ভারতের আপামর জনসাধারণের কাছে পরিচিত হন আরও ত্রিশ বৎসর পরে, শিকাগো ধর্ম-মহাসভায় অসামান্য সাফল্য-লাভের ফলে। ভারতবর্ষে তাঁর প্রকৃত কর্মজীবনের সূচনা হয় ১৮৯৭ খ্রীঃ পাশ্চাত্য দেশ হ'তে প্রত্যাবর্তনের পর, এবং ১৯০২ খ্রীঃ ৪ঠা জুলাই এই মহাপুরুষ তাঁর নশ্বর দেহ পরিত্যাগ ক'রে যান।) সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দের কীর্তি বা অবদান সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার সময় আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, স্বামীজীর ভারতীয় কর্মজীবনের ব্যাপ্তি মাত্র পাঁচ বৎসর। এত অল্প সময়ের মধ্যে স্বামীজী তাঁর দেশবাসীর চিত্তে যে ব্যাপক ও গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন

রামমোহন ব্যতীত উনবিংশ শতাব্দীর আর কোন চিন্তা-নায়ক বা কর্মবীর তা করতে পেরেছেন কি না সন্দেহ। শঙ্করাচার্যের পর আর কোন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ভারতীয় গণমানসকে এতদূর প্রভাবিত করতে পারেননি, এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। (অতি স্বল্পকালস্থায়ী জীবনে স্বামীজী তাঁর সমস্ত পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দান করতে পারেননি—এ-কথা অনস্বীকার্য, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন তাঁর জাতিগঠন-পরিকল্পনার আংশিক রূপায়ণ মাত্র। কিন্তু স্বামীজীর দেহত্যাগের পর তাঁর চিন্তা ও আদর্শ বিগত অর্ধ শতাব্দী ধরে যে-ভাবে তাঁর দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করেছে, তা সত্যই বিস্ময়কর।)

(বৈদান্তিক সন্ন্যাসী হলেও স্বামীজী সংসার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন না। তিনি নিজে পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিশেষভাবে শিক্ষিত হয়েছিলেন) এবং সেযুগের বহু উচ্চশিক্ষিত ভারতীয়ের মতো পাশ্চাত্য দার্শনিক বেন্থামের Utilitarian মতবাদের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হ'তে পারেন নি (তাছাড়া 'শিব-জ্ঞানে জীব সেবা'র আদর্শও তিনি তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে পেয়েছিলেন। এই সব কারণে বিবেকানন্দের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখা যায়। স্বামীজীর ধর্মবিশ্বাস ও তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে কোন মূলগত পার্থক্য ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে ভারতীয়েরা জগতের যে কোন জাতির চেয়ে বড় এবং মানব-জাতির আধ্যাত্মিক গুরু-হিসাবে আধুনিক জগতে ভারতবর্ষের একটি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু জগৎকে অধ্যাত্মবিষয়ে শিক্ষা দেবার আগে ভারতকে নিজ অবস্থার উন্নতি সাধন ক'রে জগতের শ্রদ্ধাভাজন হ'তে হবে। স্বামীজী এ-কথাও উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারতবাসীর জীবনে ধর্ম স্বাভাবিক ভাবে এলেও তার মধ্যে বহু মারাত্মক ত্রুটি রয়েছে এবং সমাজের অধিকাংশ লোকই সাত্ত্বিকতার আবরণে ঘোর তামসিকতায় লিপ্ত। একমাত্র রজোগুণের বিকাশের দ্বারাই এই ঘোর তামসিকতা দূর করা সম্ভব এবং সেই

উদ্দেশ্যেই স্বামীজী ভারতীয় যুবকদের দেশব্যাপী কর্মযজ্ঞের উদ্বোধনে আহ্বান করেন।

স্বামীজীকে কোন কোন ঐতিহাসিক 'হিন্দু' নবজাগরণ আন্দোলনের নেতা ব'লে অভিহিত করেছেন। কিন্তু তাঁর জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, তাঁর মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভাবের লেশমাত্র ছিল না। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর 'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে' বইটির এক স্থলে বলেছেন, শ্রীনগরে স্বামীজী তাঁর মুসলমান মাঝির শিশুকন্যাকে উমা-রূপে পূজা করেছিলেন। রাজা রামমোহনকে যে-তিনটি কারণের জন্য তিনি বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করতেন, তার একটি হচ্ছে তাঁর হিন্দু ও মুসলমানের প্রতি সমদর্শিতা। চরিত্র-হিসাবে বুদ্ধকে তিনি জগতের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় ব'লে বর্ণনা করেছেন এবং তার পরেই খ্রীষ্টকে স্থান দিয়েছেন, যদিও খ্রীষ্ট সত্যই কোন ঐতিহাসিক চরিত্র কিনা সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল। অপরদিকে হিন্দুধর্মের সমস্ত মূল শিক্ষাকে গ্রহণ করলেও স্বামীজী দেশ হ'তে অন্ধভক্তির মূলোচ্ছেদ ও পুরোহিত-সম্প্রদায়ের অত্যাচারের অবসান কামনা করতেন। শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে স্বামীজী একবার বলেছিলেন, এদেশে এখন যারা ধর্ম ধর্ম করে, তাদের অনেকেই full of morbidity—cracked brains অথবা fanatic (মজ্জাগত দুর্বলতা-সম্পন্ন, বিকৃতমস্তিষ্ক অথবা বিচারশূন্য ধর্মোন্মাদ)। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত একটি পত্রে তিনি আক্ষেপ করেছেন: "ধর্ম কি আর ভারতে আছে দাদা! জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, যোগমার্গ—সব পলায়ন। এখন আছেন কেবল ছুঁৎমার্গ—আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না। আমি পবিত্র, দুনিয়া অপবিত্র। সহজ ব্রহ্মজ্ঞান!" বাংলা দেশের দরিদ্র কৃষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাধিক্য, তাঁর মতে জমিদার ও পুরোহিতবর্গের অত্যাচারের ফল। বেদকে স্বামীজী অবশ্যই হিন্দু-ধর্মের সবচেয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ ব'লে মনে করতেন, কিন্তু শিকাগো ধর্ম-মহাসভার এক অধিবেশনে তিনি ঘোষণা করেন, 'বেদ' শব্দ দ্বারা কোন পুস্তক-বিশেষ বুঝায় না। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে যে আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ আবিষ্কার করে গেছেন, 'বেদ' সেই সকলের সঞ্চিত

ভাণ্ডার-স্বরূপ। একমাত্র বেদান্তের উদার মতবাদ-ই ছিল, স্বামীজীর বিশ্বাসে সার্বজনীন ধর্মের ভিত্তিভূমি, কিন্তু সেই মতবাদ গ্রহণ করতে হ'লে জগতের প্রাচীন সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মগুলির কোনটি পরিত্যাগ করতে হবে—এ-কথা তিনি কখনও বলেননি। বিংশ শতাব্দীর বহু শিক্ষিত ভারতবাসীর কাছে বিবেকানন্দের এই ধর্মবিশ্বাস ছাড়া অন্য কোন ধর্ম-বিশ্বাসই গ্রহণযোগ্য নয়।)

(রাজনৈতিক আন্দোলনে বিবেকানন্দ যদিও কোন দিন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নি, তবু তাঁর অন্তরে চিরকালই একটি তীব্র দেশপ্রেমের ভাব বর্তমান ছিল, এবং এক স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বপ্ন তিনি দেখে-ছিলেন। ঈশ্বর, স্বদেশ ও স্বধর্ম তাঁর কাছে প্রায় সমান আদরণীয় ছিল, এবং দেশবাসীর মধ্যেও আবার তিনি দরিদ্র নিপীড়িত জনসাধারণের প্রতি বেশী অনুরক্ত ছিলেন। তাঁর একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন, "আমার ভগবানকে, আমার ধর্মকে, আমার দেশকে—সর্বোপরি দরিদ্র ভিক্ষুককে আমি ভালবাসি।" তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বর্তমান ভারতে' তিনি তাঁর দেশবাসীকে যে 'স্বদেশমন্ত্র' উপহার দিয়েছেন, তা সত্যই অনবদ্য : "তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী ; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিনরাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; মা, আমার দুর্বলতা, আমার কাপুরুষতা দূর কর।" ভারতবাসীর মধ্যে এই মনুষ্যত্বের উদ্বোধন করাই বিবেকানন্দের জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। বারংবার তিনি বলতেন, 'দুর্বলতাই পাপ, দুর্বলতাই মৃত্যু'। স্বদেশী আন্দোলনের সময় হ'তে অসহযোগ আন্দোলনের কাল পর্যন্ত বাংলা দেশের বিপ্লবী তরুণেরা বিবেকানন্দের এই বাণীকেই তাঁদের মূল-মন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ যথার্থই বলেছিলেন, দক্ষিণেশ্বরের মাটিতে 'ডিনামাইট' তৈরী হয়। বিবেকানন্দের আমলে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ইংরেজ-শাসনের প্রশস্তিতে পঞ্চমুখ ছিলেন। মধ্যে মধ্যে সেই শাসনব্যবস্থার সমালোচনা যে তাঁরা করতেন না, এমন

নয়, কিন্তু মোটের উপর ভারতে ইংরেজ আধিপত্য-স্থাপনকে তাঁরা দেশের পক্ষে কল্যাণকর বলেই গ্রহণ করেছিলেন। স্বামীজী কিন্তু ইংরেজ-শাসনের ধ্বংসমূলক দিকটিই বড় ক'রে দেখেছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীঃ আমেরিকায় প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় তিনি বলেন: "ইংরেজী সভ্যতার উপাদান হইল তিনটি 'ব'—বাইবেল, বেয়নেট ও ব্র্যাণ্ডি। ইহারই নাম সভ্যতা। এই সভ্যতাকে এতদূর পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হইয়াছে যে, একজন হিন্দুর গড়ে মাসিক আয় ৫০ 'সেণ্টে' গিয়া দাঁড়াইয়াছে।" আর এক জায়গায় তিনি বলেছেন: "ভারতের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাবেন, হিন্দুরা রেখে গেছে অপূর্ব মন্দির, মুসলমানরা সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ। আর ইংরেজরা?—স্তূপীকৃত ব্র্যাণ্ডির ভাঙা বোতল—আর কিছু নয়।···ইতিহাস ইংরেজের কৃত কার্যের প্রতিশোধ নেবেই।" জাতীয় কংগ্রেসের কর্মপন্থায় এইজন্য বিবেকানন্দের আস্থা ছিল না এবং কংগ্রেস পরিচালিত আবেদন-নিবেদন-সর্বস্ব রাজনৈতিক আন্দোলনকেও তিনি ভারতবাসীর পক্ষে হেয় মনে করতেন। বরিশালের স্বনামধন্য কংগ্রেসী নেতা অশ্বিনীকুমার দত্তের সঙ্গে কথোপকথনে তিনি স্পষ্টভাবে এই মত ব্যক্ত করেছিলেন। চরমপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব না করলেও বিবেকানন্দ তার একজন পথপ্রদর্শক ছিলেন সন্দেহ নেই।

যে স্বাধীনতাকে স্বামীজী 'উন্নতির প্রথম শর্ত' ব'লে বর্ণনা করতেন, তাকে সমাজের সকল স্তরে তিনি প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন। ভারতবর্ষে উচ্চবর্ণের লোকেরা তথাকথিত নিম্নজাতির লোকেদের উপর যুগ-যুগান্তর ধরে যে অত্যাচার ক'রে এসেছে, তার সম্যক্ প্রায়শ্চিত্ত না করলে এ দেশের উন্নতি অসম্ভব ব'লে তিনি মনে করতেন) প্রিয় শিষ্য আলাসিঙ্গাকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন (১৮৯৪): "যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক দারিদ্র্য ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখছে না, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী ব'লে মনে করি।" আর একটি চিঠিতে তাঁর গুরুভ্রাতাদের তিনি বলেছেন, "যদি ভাল চাও তো ঘণ্টাফণ্টাগুলো গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান্ নর-নারায়ণের—

মানবদেহধারী হরেক মানুষের পূজো করগে,—বিরাট্ আর স্বরাট্। বিরাট্ রূপ এই জগৎ, তার পূজা মানে তার সেবা—এর নাম কর্ম।"[১]

ভারতবর্ষে শূদ্রজাতির অভ্যুত্থানের সূচনা তিনি নিজের জীবদ্দশাতেই দেখে গিয়েছিলেন এবং তাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী তাঁকে বলেন, "এখন হাজার চেষ্টা করলেও ভদ্রজাতেরা আর ছোটজাতদের দাবাতে পারবে না। এখন ইতর জাতদের ন্যায্য অধিকার পেতে সাহায্য করলেই ভদ্রজাতদের কল্যাণ।" কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিক স্বামীজীকে সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী ব'লে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু স্বামীজীর এই সমাজতন্ত্রবাদের মূল উৎস মার্কসের দ্বান্দ্বিক জড়বাদ নয়, এর মূল উৎস ভারতবর্ষের চিরন্তন মানবিকতাবোধ এবং গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা। ক্ষুধার্ত ব্যক্তির কাছে ধর্মের কোন আবেদন নেই, একথা স্বামীজী ভালভাবেই জানতেন, এবং তাই তিনি বারংবার বলেছেন যে, বর্তমান যুগে ভারতীয় জনসাধারণের সব চেয়ে বড় অভাব খাদ্যের, আধ্যাত্মিকতার নয়। "অন্ন! অন্ন! যে ভগবান্ এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখিবেন—ইহা আমি বিশ্বাস করি না। ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরীবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে। আরও খাদ্য, আরও সুযোগ প্রয়োজন।" তাঁর সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ভ্রাতৃবৃন্দকেও বিবেকানন্দ তাই জনসেবার ব্রতে দীক্ষিত করেছিলেন। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—এই ছিল তাঁদের জীবনের আদর্শ।

নবজাগরণ আন্দোলনের আর একটি প্রধান দিক ছিল সমাজ-সংস্কার-প্রচেষ্টা। প্রচলিত অর্থে স্বামীজী অবশ্যই সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না। বিদেশে বক্তৃতা দেবার সময় স্বামীজী সর্বত্র ভারতবর্ষের সামাজিক রীতিনীতি, আচার-ব্যবহারের প্রবল সমর্থন করতেন, তাঁর মতো দেশপ্রেমিকের পক্ষে সেইটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু একথা মনে করলে আমাদের ভুল হবে যে, স্বামীজী তাঁর দেশীয় সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন না। আমাদের দেশে দেশাচার, লোকাচা

ও স্ত্রী-আচার যে শাস্ত্রের বিধানকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে, একথা তিনি বারংবার বলতেন। আবার সমাজ-সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধানগুলিও যে পরিবর্তনশীল এবং বিভিন্ন যুগের প্রয়োজনে বারংবার তাদের পরিবর্তন যে কাম্য, একথা ঘোষণা করতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নি। ঐতিহাসিক প্রগতিবাদে তিনি বিশ্বাস করতেন, ভাবীকালের ভারতবর্ষ প্রাচীন ভারতবর্ষের চেয়ে অনেক বড় হবে, একথা তিনি তাঁর গুরুভ্রাতা স্বামী ব্রহ্মানন্দকে একটি পত্রে স্পষ্টই লিখেছেন।

প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার যে ত্রুটিগুলির দিকে স্বামীজী বারংবার তাঁর দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, সেগুলি হচ্ছে—বংশানুক্রমিক জাতিভেদ-প্রথা, অস্পৃশ্যতা, অতিরিক্ত মাত্রায় খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধি বিচার এবং স্ত্রীজাতির প্রতি অবহেলা। বাল্যবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহকে তিনি একবার বলেছিলেন, "ব্রাহ্মণের ছেলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, তার মানে নেই; হবার খুব সম্ভাবনা, কিন্তু না হতেও পারে।" আমেরিকায় যাঁদের তিনি মন্ত্রশিষ্য করেছিলেন, তাঁদের সকলকেই তিনি ব্রাহ্মণ জ্ঞান করতেন। ব্রাহ্মণরা বহুকাল ধরে দেশের তথাকথিত নীচ জাতিদের ঘৃণা করার ফলেই যে বর্তমান কালে জগতের ঘৃণা-ভাজন হয়ে পড়েছে, একথাও তিনি বলেছেন। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে (১৮৯৪) তিনি লেখেন, "ভারতের পতন ও অবনতির এক প্রধান কারণ—জাতির চারিদিকে এইরূপ আচারের বেড়া দেওয়া।...ইহার ভিত্তি অপরের প্রতি ঘৃণা। প্রাচীন বা আধুনিক তার্কিকগণ মিথ্যা যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া যতই ইহা ঢাকিবার চেষ্টা করুন না কেন, অপরকে ঘৃণা করিতে থাকিলে কেহই নিজে অবনত না হইয়া থাকিতে পারে না।" আর একজন ভক্তকে তিনি বলেন, "ভারতবর্ষে intermarriage-টা (অন্তর্বিবাহ) হওয়া দরকার, তা না হওয়ায় জাতটার শারীরিক দুর্বলতা এসেছে।"

(অস্পৃশ্যতার নিন্দায় বিবেকানন্দ চিরদিন মুখর ছিলেন। 'ছুঁৎমার্গ' হিন্দু ধর্ম নয়, শাস্ত্রবহির্ভূত প্রাচীন আচার মাত্র' এ কথা তিনি নানা স্থানে বলেছেন) মাদ্রাজে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "যদি আমি

নীচ চণ্ডাল হইতাম, তাহা হইলে আমার আরও অধিক আনন্দ হইত; কারণ আমি যাঁহার শিষ্য, তিনি একজন অতি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইলেও এক অস্পৃশ্য মেথরের গৃহ পরিষ্কার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।" অতিরিক্ত মাত্রায় খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধি-বিচারকেও বিবেকানন্দ অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতেন। মনমাদুরা অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলেন, "আমরা এখন বৈদান্তিকও নই, পৌরাণিকও নই, তান্ত্রিকও নই; আমরা এখন 'ছুঁৎমার্গী', আমাদের ধর্ম এখন রান্নাঘরে। ভাতের হাঁড়ি আমাদের ঈশ্বর···। যদি আমাদের দেশে আর এক শতাব্দী ধরিয়া এই ভাব চলে, তবে আমাদের প্রত্যেককেই পাগলা গারদে যাইতে হইবে।"

ভারতবর্ষের নারীজাতির দুর্দশায় সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বিচলিত হয়েছিলেন। বিদেশীরা, বিশেষতঃ খ্রীষ্টান পাদরীরা, ভারতীয় নারীদের দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে কিছুটা অতিরঞ্জন করলেও তাঁদের অভিযোগ যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয়, একথা স্বামীজী জানতেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন, "ভারতে দুই মহাপাপ—মেয়েদের পায়ে দলা আর 'জাতি' 'জাতি' ক'রে গরীবগুলোকে পিষে ফেলা।" নারী-জাতির অবস্থার উন্নতির জন্য বাল্যবিবাহ-নিরোধ ও স্ত্রীশিক্ষার প্রচলনকে তিনি একান্ত প্রয়োজনীয় ব'লে মনে করতেন। শিক্ষার প্রসার হ'লে ভারতীয় স্ত্রীলোকেরা নিজেরাই তাদের হিতাহিত বুঝতে পারবে এবং তার ফলে সামাজিক পরিবর্তন আপনা হ'তে আসবে, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। তবে পাশ্চাত্য স্ত্রীলোকদের তিনি কখনই ভারতীয় নারীজাতির আদর্শস্থানীয়া ব'লে মনে করতেন না। রাণাডে-প্রমুখ সমসাময়িক ভারতীয় সমাজ-সংস্কারকদের সঙ্গে বিবেকানন্দের দুটি বিষয়ে মৌলিক পার্থক্য ছিল। প্রথমতঃ, তিনি পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে ভারতবর্ষের সমাজকে গড়তে চাইতেন না, পাশ্চাত্য সমাজ যে নানা বিষয়ে অসুখী, একথা তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় জানা ছিল। দ্বিতীয়তঃ, সমসাময়িক সমাজ-সংস্কারকেরা যে শুধুমাত্র শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের প্রয়োজন সম্বন্ধে চিন্তা করেছেন, সমগ্র জাতির জন্য নয়,

একথাও তিনি বুঝেছিলেন। জনৈক ভক্তকে কথাপ্রসঙ্গে তিনি একবার বলেন, "তোমাদের মুখে যা সংস্কারের কথা শুনতে পাই, তার মধ্যে অনেকগুলোই অধিকাংশ গরীব সাধারণদের স্পর্শই করবে না। তোমরা যা চাও, তাদের তা আছে। এজন্যে তারা ওগুলোকে সংস্কার বলেই মনে করবে না।"

জাতীয় জাগরণের মূল কথা যে শিক্ষা, স্বামীজী তা জানতেন, এবং শিক্ষাবিস্তারই সেজন্য তাঁর জনসেবাব্রতের প্রধান অঙ্গ ছিল। পাশ্চাত্য জাতিগুলির কাছে আমাদের ব্যবহারিক শিক্ষালাভের যে যথেষ্ট প্রয়োজন আছে—একথা তিনি বারবার বলেছেন। তবে শিক্ষার উপকরণ যা-ই হোক না কেন, ধর্মভাব-বিরহিত হ'লে সে শিক্ষা যে কল্যাণপ্রদ হবে না, সে বিষয়ে স্বামীজী তাঁর দেশবাসীকে সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ ভারতের নবজাগরণের এমন কোন দিকই নেই, যে বিষয়ে স্বামীজী চিন্তা করেননি অথবা যে বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত উপদেশ জাতিকে ভবিষ্যতে পথ চলবার প্রেরণা দেবে না। স্বামীজীর উপদেশের মূল কথাই 'এগিয়ে চলো'। এগিয়ে চলার পথে ভুল-ভ্রান্তি ঘটা বিচিত্র নয়, বরং সেটাই স্বাভাবিক; কিন্তু গতিরোধ হওয়ার অর্থ পতন ও মৃত্যু।

Romain Rolland, *The Life of Vivekananda And the Universal Gospel* (1947).

The Life of Vivekananda, 2 volumes, published by the Advaita Ashrama, Mayavati, Almora (1933)

'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা', ১০ খণ্ড (উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা) (১৩৬৯ সন)

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও শঙ্কর (সম্পাদিত)—'বিশ্ববিবেক' (১৯৬৩)

J. N. Sarkar, *India Through The Ages* (1928)

J.N. Farquhar, *Modern Religious Movements In India* (1915)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের স্থান

বাংলা গদ্যসাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের (১৭৬২-১৮১৯) নাম স্মরণীয়। শুধু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত-দের মধ্যে নয়, সমসাময়িক কালের বাংলা দেশে তাঁর মতো বিপুল পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার অধিকারী ছিল সুদুর্লভ। উইলিয়ম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪) ও রাজা রামমোহনের (১৭৭৪-১৮৩৩) যুগে জন্মগ্রহণ করায় উত্তরকালে মৃত্যুঞ্জয়ের যশ ও খ্যাতি অবশ্যই অনেকটা ম্লান হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সমকালীন ব্যক্তিরা তাঁকে কতটা সম্মান করতেন তা সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক জন ক্লার্ক মার্শ্‌ম্যানের প্রশস্তি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। মার্শ্‌ম্যান তাঁর বিখ্যাত বই The Life And Times of Carey, Marshman and Ward-এর প্রথম খণ্ডে (পৃঃ ১৮০) মৃত্যুঞ্জয়কে "The Boethius of the country", "a colossus in literature" ইত্যাদি বিশেষণে অভিহিত করে লিখছেন, "He bore a strong resemblance to our great lexicographer [Dr. Johnson] not only by his stupendous acquirements and the soundness of his critical judgement, but also in his rough features and unwieldy figure. His knowledge of the Sanskrit classics was unrivalled and his Bengalee composition has never been surpassed for ease, simplicity and vigour."

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র ভূমিকাতেও মার্শম্যান মৃত্যুঞ্জয়কে "one of the most profound scholars of the age" বলে বর্ণনা করেছেন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হিসাবে মৃত্যুঞ্জয়ের খ্যাতি যে সেযুগে বহুবিস্তৃত ছিল তা তাঁর প্রতিপক্ষীয় রামমোহনের উক্তি থেকেও জানা যায়। নব্য ন্যায় ও স্মৃতির প্রভাবে বাংলা দেশে যখন উপনিষৎ ও বেদান্ত দর্শনের চর্চা লুপ্তপ্রায় তখন যে

কয়জন মুষ্টিমেয় পণ্ডিত ঐ দুই শাস্ত্রের অনুশীলনের ধারা বজায় রেখে-ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় তাঁদের অন্যতম (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'রামমোহন গ্রন্থাবলী', ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৭)।

হিন্দু শাস্ত্রে মৃত্যুঞ্জয়ের এই গভীর জ্ঞানের জন্যই ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি হিন্দু বিধবা-দের সহমরণ সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান নির্ণয়ের জন্য তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। হিন্দু বিধবাদের স্বামীর সঙ্গে সহমরণ অপরিহার্য নয়, ঐচ্ছিক মাত্র, এবং বেদান্তের দৃষ্টিতে সহমরণের চেয়ে ব্রহ্মচর্য পালনই তাঁদের পক্ষে শ্রেয়স্কর,—বহু শাস্ত্র মন্থন করে মৃত্যুঞ্জয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন (Parliamentary Papers ; Commons : 1821, Vol. XVIII, pp. 119. 125)। লক্ষণীয় এই যে রামমোহনের সহমরণ বিষয়ে প্রথম পুস্তিকা 'সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' (১৮১৮) তখনো আত্মপ্রকাশ করে নি। অবশ্য হিন্দু সমাজে সতীদাহ-বিরোধী আন্দোলন সৃষ্টি করে রামমোহন সে যুগে যে অসাধারণ মনোবল দেখিয়েছিলেন, শাস্ত্রজ্ঞ মৃত্যুঞ্জয়ের মধ্যে সে মনোবলের পরিচয় কোনো-দিনই মেলে না। সে যুগের নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান, যথা হিন্দু কলেজ, কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি প্রভৃতির সঙ্গেও মৃত্যুঞ্জয়ের অল্প-বিস্তর যোগাযোগ ছিল (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী', পৃঃ ৷৵০)। বিস্ময়কর প্রতিভা সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে মৃত্যুঞ্জয়ের অবদান কতটা মূল্যবান সে বিষয়ে কিন্তু এখনো যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ রয়েছে।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কেরীর অধীনে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিত রূপে নিযুক্ত হন। ১৮০২ থেকে ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলা ভাষায় লেখা তাঁর তিনটি বই প্রকাশিত হয়—'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), 'হিতোপদেশ' (১৮০৮) ও 'রাজাবলি' (১৮০৮)। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের ধর্মমত খণ্ডন করার জন্য তিনি 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' বা An Apology For the Present System of Hindoo Worship রচনা করেন। ফোর্ট উইলিয়ম

কলেজের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ততদিনে ছিন্ন হয়েছে, মৃত্যুঞ্জয় তখন কলকাতা সুপ্রীম কোর্টের পণ্ডিত। খুব সম্ভব ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের আগেই (ঐ বৎসর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ছিন্ন হয়) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের জন্ত 'প্রবোধচন্দ্রিকা' নামে আরো একখানি বই তিনি লিখেছিলেন, কিন্তু সে বই প্রকাশিত হয় ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে, তাঁর মৃত্যুর ১৪ বৎসর পরে। এই পাঁচটি বইএর মধ্যেই মৃত্যুঞ্জয়ের স্বনামে প্রকাশিত সাহিত্যকর্মের তালিকা সীমাবদ্ধ। এ ছাড়া পুত্র রামজয় তর্কালঙ্কারের 'সাংখ্যভাষা সংগ্রহ' (১৮১৮) নামে একটি অনুবাদ রচনার কাজে ও উইলিয়ম কেরীর 'কথোপকথন' (১৮০১) পুস্তিকা সঙ্কলনের ব্যাপারেও বোধ হয় মৃত্যুঞ্জয় কিছুটা সাহায্য করেছিলেন ('মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী', পৃঃ ॥৶০-৸০ ও সজনীকান্ত দাস, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', পৃঃ ১০৯)। কিন্তু তাঁর সাহিত্যকীর্তির বিচারে শেষোক্ত দুটি পুস্তিকাকে অবশ্যই গণ্য করা চলে না। স্বনামে প্রকাশিত পাঁচটি বইএর মধ্যে 'রাজাবলি', 'বেদান্ত-চন্দ্রিকা' ও 'প্রবোধচন্দ্রিকা' এই তিনটিই মৃত্যুঞ্জয়ের মৌলিক রচনা। বাকি দুটি, অর্থাৎ 'বত্রিশ সিংহাসন' ও 'হিতোপদেশ' সংস্কৃত বইএর অনুবাদ মাত্র।

বাংলা গদ্যসাহিত্যের আদি যুগের লেখকদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় যে বিশেষ স্মরণীয় সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বাংলা হরফে ছাপা, বাঙালীর লেখা প্রথম গদ্যপুস্তক, রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) মৃত্যুঞ্জয়ের প্রথম রচনা 'বত্রিশ সিংহাসন'-এর মাত্র এক বৎসর আগে প্রকাশিত হয়। রামমোহনের আগে বাংলা গদ্যসাহিত্যের লেখকদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ই সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি বই লেখেন। তাঁর লেখা 'রাজাবলি' বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ভারতবর্ষের প্রথম ধারাবাহিক (কলিযুগের সূচনা থেকে ইংরেজ রাজত্বের পত্তন পর্যন্ত) ইতিহাস, যদিও আধুনিক সংজ্ঞা অনুসারে একে ইতিহাস বলা চলে কিনা সন্দেহ। উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্য (দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত) এবং বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন প্রভৃতি স্থানীয় রাজারাও এই 'ইতিহাস'-এর কল্যাণে 'দিল্লীশ্বর'-এর

মর্যাদা লাভ করেছেন ('মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী', পৃঃ ১২৩, ১৩৭-৩৮)। একমাত্র 'বেদান্তচন্দ্রিকা' বাদ দিলে মৃত্যুঞ্জয়ের অধিকাংশ রচনাই কিন্তু পাঠ্য পুস্তকের পর্যায়ভুক্ত। 'বত্রিশ সিংহাসন' রচনা করে লেখক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ছ'শো টাকা পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন। 'প্রবোধচন্দ্রিকা' রচনা করেও তিনি যে অনুরূপ পারিশ্রমিক আশা করেছিলেন তা উইলিয়ম কেরীর লেখা একটি চিঠি থেকে জানা যায় ('মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী', পৃঃ ৵৹, ৸৹-৸৶৹)। 'বেদান্তচন্দ্রিকা' বেদান্ত দর্শনে মৃত্যুঞ্জয়ের গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক হলেও তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার নিদর্শন বহন করে না। পথিকৃৎ-এর প্রাপ্য সম্মান দেওয়ার পর সাহিত্যস্রষ্টা হিসাবে মৃত্যুঞ্জয়ের স্থান তাহলে কোথায়?

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের কাছে উপহাসের বস্তু বলেই বিবেচিত হত। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' বইএ লেখেন, মৃত্যুঞ্জয়ের 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র ভাষা "সংস্কৃতাশ্রয়ী, কিন্তু নিতান্ত বিশৃঙ্খল ও নীরস। কোন কোন স্থান দীর্ঘ সমাস সমন্বিত এবং নিতান্ত অপ্রচলিত শব্দ দ্বারা গ্রথিত, আবার কোনো কোনো স্থান একান্ত অপভ্রংশ পদ দ্বারা বিরচিত। কোন কোন স্থলে বাক্যের দীর্ঘতা ও বিশৃঙ্খলতার জন্য অর্থবোধই হইয়া উঠে না।" অবশ্য লেখকের মতে মৃত্যুঞ্জয়ের যুগে এই রকম ভাষা আদৌ অস্বাভাবিক ছিল না ('বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব', ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ২০৬-২০৭)। সে যুগের অপর একজন সাহিত্য-সমালোচক, রাজনারায়ণ বসু, তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতায়' (১৮৭৮) 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র', 'প্রবোধচন্দ্রিকা' ইত্যাদি প্রাক্-রামমোহন যুগের বাংলা গদ্যরচনা সম্বন্ধে মন্তব্য করেন (পৃঃ ২২): "উল্লিখিত গ্রন্থসকল এমন অপকৃষ্ট বাংলা ভাষায় লিখিত যে, রামমোহন রায়কে বাংলা গদ্যের সৃষ্টিকর্তা বলিলে অন্যায় হয় না।" দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' রামরাম বসুকে সাহিত্যশিল্পী হিসাবে মৃত্যুঞ্জয়ের উপরে স্থান দিয়েছেন। তাঁর মতে 'রাজা প্রতাপাদিত্য

চরিত্র'-এর মধ্যে রাম রাম বসু অনেক মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করেছেন সত্য কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় প্রমুখ পণ্ডিতের রচনায় সংস্কৃত শব্দের ও সমাসের যে বিকট সমন্বয় দেখা যায় তার তুলনায় রাম রাম বসুর মুসলমানী শব্দের ঘটা অতি অল্প। "সংস্কৃতের পণ্ডিতদের মত তিনি [রামরাম বসু] তাঁহার উপহাসাস্পদ পাণ্ডিত্যের ভুঁড়ি বাহির করিয়া সাহিত্যের আসরে আসেন নাই।" ('বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', নবম সংস্করণ, সন ১৩৫৬, পৃঃ ৩৭৬) ডক্টর সুশীলকুমার দে তাঁর History of Bengali Literature in the Nineteenth Century (Calcutta 1919) বইটিতে মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা সম্বন্ধে এই ধারণাকেই আরো দৃঢ় করেছেন। তাঁর মতে মৃত্যুঞ্জয়ের শ্রেষ্ঠ রচনা 'প্রবোধচন্দ্রিকা'ও "wholly devoid of all artistic instincts of proportion or arrangement" (p. 219)। এর মধ্যে যে বিভিন্ন ভাষারীতি স্থান পেয়েছে ডক্টর দের মতে সেগুলি বইটির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে নি ("sudden and ludicrous descent from the most pedantic and laboured language to the extreme vulgarity of the popular dialect.")।

আধুনিক কালে কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের সাহিত্যকীর্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিপরীত একটি মতবাদ কোনো কোনো সাহিত্য-সমালোচকের লেখনী-মুখে দেখা দিয়েছে। খুব সম্ভব বাংলা সাহিত্যের 'বীরবল'-ই প্রথম এই মতবাদ প্রচার করেন বাংলা ১৩২১ সালে উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিরূপে। 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা'র গদ্য প্রমথ চৌধুরীর মতে মৃত্যুঞ্জয়ের নিজস্ব রচনা নয়। "দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শ' প্রভৃতি গ্রন্থের সংস্কৃত পদ্যকে ছন্দমুক্ত এবং বিভক্তিচ্যুত করিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় এই কিম্ভুতকিমাকার গদ্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।...নিজে কখনই এরূপ রচনাকে গদ্যের আদর্শ মনে করেন নাই। সংস্কৃত পদ্যের ছন্দপাত করিলে তাহা যে বাংলা গদ্যে পরিণত হয়, এরূপ ধারণা যে তাঁহার মনে ছিল এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। কেননা, তিনি একদিকে যেমন সাধু ভাষায় আদি-লেখক—অপর দিকে তিনি তেমনি চলতি ভাষারও আদর্শ লেখক।" মৃত্যুঞ্জয়ের

চলিত ভাষা, প্রমথ চৌধুরীর মতে, "সজীব, সতেজ, সরল, স্বচ্ছন্দ ও সরস। ইহার গতি মুক্ত;—ইহার শরীরে লেশমাত্রও জড়তা নাই" ('সবুজ পত্র', ফাল্গুন ১৩২১, পৃঃ ৭৮০-৭৮২)। প্রমথ চৌধুরীর এই মতবাদ পরবর্তী যুগে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'য় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার-এর জীবনীতে (কলিকাতা, ১৩৫২ সন, ও তাঁর সম্পাদিত 'মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী'র (কলিকাতা, ১৩৪৬ সন) ভূমিকায় খুব স্পষ্ট ভাষায় এই মতবাদ ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে বাংলা গদ্যের নিতান্ত শৈশবকালেই মৃত্যুঞ্জয় বিভিন্ন গদ্যরীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন এবং বিভিন্ন বই বিভিন্ন রীতিতে রচনা করে দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন। অবশ্য একথা ঠিক যে সংস্কৃত ভাষায় মহাপণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় স্বভাবতই যতদূর সম্ভব সংস্কৃত রীতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন, কিন্তু খাঁটি বাংলা রীতিকেও তিনি উপেক্ষা করেন নি। সাধু ও চলিত এই দুই ভিন্ন রীতির পার্থক্য বাংলা দেশে সর্বপ্রথম তিনিই উপলব্ধি করেছিলেন, "তিনিই বাংলা গদ্যের সর্বপ্রথম কন্‌শাস আর্টিস্ট" (সাহিত্যসাধক চরিত-মালা: 'মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার', পৃঃ ৮, ৩৬)। 'মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী'র ভূমিকায় ব্রজেন্দ্রনাথ আক্ষেপ করেছেন যে সাহিত্যিক হিসাবে মৃত্যুঞ্জয়ের খ্যাতিলোপের প্রধান কারণ তাঁর ধর্মমত এবং পরবর্তী যুগে "প্রগতিপন্থী সমাজের সক্ষম প্রচার।" (পৃঃ ।/০, ১/০) মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী রামমোহনই যে লেখকের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য তা বোধ হয় বলার অপেক্ষা রাখে না। ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর রামমোহন-জীবনীতেও (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা—১৬: 'রামমোহন রায়', পৃঃ ৭১) "বাংলা গদ্য সম্পর্কে রামমোহনের কীর্তি সামান্য নয়" একথাটুকু স্বীকার করার আগেই ঘোষণা করেছেন, বাংলা গদ্যের "স্রষ্টা যদি কাহাকেও বলিতে হয়, তাঁহার [মৃত্যুঞ্জয়ের] দাবী সর্বাগ্রে।" সজনীকান্তের মতে 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র ভাষাতে মৌখিক রীতি, সাধু বা সাহিত্যিক রীতি এবং সংস্কৃত রীতি, এই তিন রীতির নিদর্শন থাকলেও প্রকৃতপক্ষে মৌখিক রীতির প্রতিই মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবণতা ছিল। "বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পীরূপে মৃত্যুঞ্জয়কে

পূজা নিবেদন করিতেই হইবে।" মৃত্যুঞ্জয়ের সাধু ভাষাই পরে উত্তরোত্তর পুষ্টিলাভ করে শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরী রীতিতে স্থায়ী হয় (সজনীকান্ত দাস, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'—প্রথম খণ্ড ; কলিকাতা, ১৩৫৩ সন ; পৃঃ ১৫৭-১৬৫)। ব্রজেন্দ্রনাথ-সজনীকান্ত-এর পরবর্তী সাহিত্য-সমালোচকদের অধিকাংশই এই দুই গবেষকের রায়কে চূড়ান্ত বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর 'উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাংলা সাহিত্যে" (কলিকাতা, ১৩৬৩ সন) বলছেন, "মৃত্যুঞ্জয় বাস্তবিক নিপুণ ভাষাশিল্পী ছিলেন। তাঁহার সংস্কৃতান্বিত বাংলা গদ্য সমাস-সন্ধি-জড়িত ও দীর্ঘ-পদবিন্যাসবহুল হইলেও তাহার অন্বয় ও অর্থবোধ আদৌ দুর্বোধ্য নহে।" তারপর সজনীকান্তের প্রতিধ্বনি করে তিনি মন্তব্য করেছেন, "মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষার মধ্যেই বিদ্যাসাগরের ভাবী সম্ভাবনার বীজ উপ্ত হইয়াছিল এ কথা অবশ্য স্বীকার্য" (পৃঃ ১০৯-১১০)। মৃত্যুঞ্জয় বাংলা গদ্যের বিভিন্ন রীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন বা মৌখিক রীতির প্রতিই তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি ছিল এ কথা অসিতকুমার কোথাও স্পষ্টভাবে বলেন নি, কিন্তু কেরী সাহেবের 'কথোপকথনে' (১৮০১) "চলিত ভাষার যে বলিষ্ঠ ও অমার্জিত রূপ দেখা যায় মৃত্যুঞ্জয় তাহাকে শিল্পীচেতনার সাহায্যে আস্বাদ্যমান অনুভূতিতে পরিণত করেন" (পৃঃ ১১২), এ-কথা তিনি অসঙ্কোচে ঘোষণা করেছেন।

মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্যরচনা সম্বন্ধে আধুনিক সমালোচকদের মতবাদ প্রধানত তাঁর 'প্রবোধচন্দ্রিকা'কে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। 'বত্রিশ সিংহাসনে'র ভাষা অপেক্ষাকৃত সরল হলেও এর মধ্যে কোথাও মৌখিক ভাষার প্রতি লেখকের প্রবণতা দেখা যায় না। সে যুগের কথকতার ভঙ্গীতে বইটি লেখা হয়েছে।…"শ্রীবিক্রমাদিত্য সিংহাসন পাইয়া বড় ঘটাতে অভিষিক্ত হইয়া সিংহাসনে বসিলেন। যখন সিংহাসনে বসেন তখন ইন্দ্রের ন্যায় শৌর্য্য বীর্য্য ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য সাহস উদ্যোগ বুদ্ধি পাণ্ডিত্য শ্রীবিক্রমাদিত্যের হয়।…রাজসভাতে প্রত্যহ শত ২ বেদজ্ঞ বেদান্তী মীমাংসক তার্কিক সাংখ্যবেত্তা পাতঞ্জলবেত্তা বৈশেষিক শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত জ্যোতিষ

স্মৃতি সাহিত্য নাটক নাটিকা অলঙ্কার নীতিশাস্ত্র দণ্ডশাস্ত্র আয়ুর্বেদ প্রভৃতি নানা শাস্ত্রবেত্তা শ্রীকালিদাস বররুচি ভবভূতি ক্ষপণক অমরসিংহ শঙ্কু বেতালভট্ট ঘটকর্পর বরাহমিহির ধন্বন্তরি প্রভৃতি বসেন" ('মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী', পৃঃ ৭)।

'হিতোপদেশে'র ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী, কোথাও কোথাও সংস্কৃতের আক্ষরিক অনুবাদ; আধুনিক বাংলা গদ্যের সঙ্গে এর যোগসূত্র অতি ক্ষীণ।..."আপৎকাল উপস্থিত হইলে বৃদ্ধলোকের বাক্য গ্রাহ্য হয় আর অন্যত্রও বিচারক্রমে গ্রাহ্য হয় কিন্তু ভোজন বিষয়ে গ্রাহ্য নয়, যেহেতুক পৃথিবীমণ্ডলে সকল অন্ন ও জলাদি আশঙ্কা কর্তৃক ব্যাপ্ত তাহাতে কোথা প্রবৃত্তি কর্তব্য। কি প্রকারে বা জীবন ধারণ কর্তব্য। সেই প্রকার পণ্ডিতদিগের কর্তৃক কথিত হইয়াছে ঈর্ষাবিশিষ্ট ও ঘৃণাযুক্ত ও অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ ও সর্বদা সশঙ্ক আর পরভাগ্যোপজীবী এই ছয় জন দুঃখভাগী হয়" (ঐ, পৃঃ ৫৫)। অথবা—"দমনক বলিতেছে তথাপি স্বামীর চেষ্টা-নিরূপণ সেবকের অবশ্য কর্তব্য করটক বলিতেছে সমস্ত কার্যেতে নিযুক্ত যে প্রধান মন্ত্রী সেই করুক যেহেতু ভৃত্যদের পরাধিকার চর্চা কোন প্রকারে কর্তব্য নহে দেখ যে জন প্রভু হিতেচ্ছাতে পরাধিকার চর্চা করে সে বিষণ্ণ হয় যেমন চীৎকারেতে গর্দভ তাড়িত হইয়াছিল। দমনক প্রশ্ন করিতেছে ইহা কি প্রকার করটক কহিতেছে" (ঐ, পৃঃ ৭২)। অথচ 'হিতোপদেশ' 'বত্রিশ সিংহাসনে'র প্রায় ছয় বৎসর পরে লেখা। অন্তত এই ছয় বৎসরের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় যে বাংলা গদ্যের বিভিন্ন রীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা কিছু করেন নি সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। সজনীকান্তের মতে সমসাময়িক লেখক গোলোকনাথ শর্মার 'হিতোপদেশ'-ও মৃত্যুঞ্জয়ের রচনার তুলনায় অনেক সুখপাঠ্য ('বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'—প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৫৩)।

'রাজাবলি'র সর্বত্র এক ভাষারীতি অনুসরণ করা হয় নি। প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস সংস্কৃতাশ্রয়ী ভাষায় লেখা, কিন্তু মধ্যযুগের ইতিহাস রচনা করতে বসে লেখককে বহু মুসলমানী শব্দের সাহায্য নিতে হয়েছে।..."তদনন্তর নবাব জাফরালী খাঁ নন্দকুমারকে রাজগী খেতাব

দিয়া রাজা কুঞ্জবিহারিকে তগীর করিয়া তাঁহাকে রায় রায়াঁ কার্য্যে মোকরর করিলেন কিন্তু মহারাজা দুর্লভরামের অনুরোধে সাহেব লোকেরদের ইচ্ছামতে কুল্লের নায়েব সুবেদারী কার্য্যে কেহ মোকরর হইল না।" ('মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী', পৃঃ ১৮৮)। রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র ভাষার সঙ্গে এর তুলনা চলে। কিন্তু মধ্যযুগের ইতিহাসের সর্বত্রও আবার এ ভাষা ব্যবহৃত হয় নি। আকবরের সম্বন্ধে মৃত্যুঞ্জয় লিখেছেন, "আর ইহার শৌর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্য ঔদার্য্য গুণজ্ঞতা গুণগ্রাহকতা দোষত্যাগিতা শিষ্টসমাদরকারিতা দুষ্টবিনাশকারিতা বিদ্যামোদিতা দীনদয়ালুতা দুঃখিজনবন্ধুতা ধনিজনরক্ষকতা বক্তৃতা রসিকতা দাতৃতা ধার্ম্মিকতা প্রজামনোরঞ্জকতা সাহসিকতা সদোৎসাহিতা নিত্যোদ্যমকারিতা মাতাপিতৃভক্ততা পরমেশ্বরানুরাগিতা প্রভৃতি উত্তম গুণের কথা আমি কত লিখিব…শ্রীবিক্রমাদিত্যের পর এই হিন্দুস্থানে এখন পর্য্যন্ত গুণেতে আকবর শাহের সম সম্রাট আর কেহ হয় নাহি" (ঐ, পৃঃ ১৬৪)। কোথাও আবার একই বাক্যের মধ্যে সংস্কৃত ও ফার্সী শব্দের বিচিত্র সমাবেশ দেখা যায়।—"সুলতান জলালুদ্দীন মহম্মদ আকবর বাদশাহ হইলে বয়রম খাঁ খানখানার পরামর্শে লাহোরের নিকট কলানওরে তক্তে বসিয়া ৯৬৩ নয় শত তেষট্টি হিজরি সনে জলুস করিলেন ও সকল দিগে আজ্ঞাপত্র পাঠাইলেন খোতবা ও সিক্কা আপন নামে জারি করিলেন হিন্দুস্থান ও দক্ষিণে গুজরাত প্রভৃতি অনেক দেশ অনেক বন্দর আয়ত্ত করিলেন ও অনেক প্রধান লোক স্বত ইহার অনুগত হইল। আর আকবরের এমনি ভাগ্যের প্রাবল্য হইল যে ইহার নামেতেই জয় হইতে লাগিল" (ঐ, পৃঃ ১৬৩)। ভাষার ক্ষেত্রে এই সম্পূর্ণ নৈরাজ্য কি মৃত্যুঞ্জয়ের পরীক্ষা নিরীক্ষার ফল? সাহিত্যিক উৎকর্ষ বইটির প্রায় কিছুই নেই বলা চলে। ইতিহাস-গোত্রীয় রচনা হলেও এর মধ্যে বহু কাহিনী বা জনশ্রুতি স্থান পেয়েছে—বিশেষত প্রাচীন যুগের ইতিহাস প্রসঙ্গে।

'বেদান্তচন্দ্রিকা'র ভাষা এতই উৎকট সংস্কৃতাশ্রয়ী যে, যে-রামমোহনের রচনা আধুনিক কালের বাংলা পাঠকদের কাছে প্রায় দুর্বোধ্য, তিনিও

এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না জানিয়ে পারেন নি ('রামমোহন গ্রন্থাবলী,' ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৫)—"অতএব বেদান্ত পরম প্রতিপাদ্য যে ত্রিগুণাতীত তুরীয় জীবব্রহ্মৈক্য শুদ্ধচৈতন্য তিনি স্বরূপতঃ জ্ঞেয়মাত্র স্বশক্তিকৃত ঔপাধিক জগৎকারণাদি তত্ত্বপর্য্যন্ত রূপোপাসনাতে পরম্পরাতেই উপাসিত হন সাক্ষাৎ উপাসিত হন না..." (মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী', পৃঃ ২০৬)। সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত বইটি এই ভাষাতেই লেখা। 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'ই মৃত্যুঞ্জয়ের দুরূহ পাণ্ডিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

লেখকের শেষ প্রকাশিত বই 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'-ও মূলত সাধুভাষা বা সংস্কৃতানুগ ভাষায় লেখা, যদিও এর কোনো কোনো অংশে মৌখিক রীতির প্রয়োগ দেখা যায় (বিশেষত তৃতীয় 'স্তবকে')। বাংলা গদ্য রচনা সম্বন্ধে মৃত্যুঞ্জয়ের আদর্শ কি ছিল আমরা সেটা তাঁর নিজের উক্তি থেকেই কিছুটা অনুমান করতে পারি। 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র মুখবন্ধে তিনি লিখেছেন, "এতদ্রূপে প্রবর্ত্তমান সকল ভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষা উত্তমা...। অন্যান্য দেশীয় ভাষা হইতে গৌড়দেশীয় ভাষা উত্তমা সর্ব্বোত্তমা সংস্কৃত ভাষা বাহুল্যহেতুক" ('মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী' পৃঃ ২২৩)। মৃত্যুঞ্জয়ের নিজের রচনাশৈলী যে প্রায় সর্বত্র সংস্কৃতানুগ হয়েছে তাতে সুতরাং বিস্ময়ের কিছুই নেই। 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র সমাপ্তিতে মৃত্যুঞ্জয় রামমোহনকে লৌকিক ভাষায় বেদান্ত ব্যাখ্যা করার জন্য তীব্র আক্রমণ করেছেন।·· "আর যেমন মণি পথেঘাটে পড়িয়া থাকে না কিন্তু তৎপরীক্ষকেরা উত্তম সংপুটেতে অতি যত্নে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়া রাখেন তেমনি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত নিতান্ত লৌকিক ভাষাতে থাকে না কিন্তু সুপক্ব বদরীফলবৎ বাক্যেতে বদ্ধ হইলেই থাকে।" তারপর অশ্লীল উপমা প্রয়োগ করে তিনি নিজের বক্তব্য আরো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন,—"আরো যেমন রূপালঙ্কারবতী সাধ্বী স্ত্রীর হৃদয়ার্থবোদ্ধা .সুচতুর পুরুষেরা দিগম্বরী অসতী নারীর সন্দর্শনে পরাঙ্মুখ হন তেমনি সালঙ্কারা শাস্ত্রার্থবতী সাধুভাষার হৃদয়ার্থবোদ্ধা সৎপুরুষেরা নগ্না উচ্ছৃঙ্খলা লৌকিক ভাষা শ্রবণ মাত্রেতেই পরাঙ্মুখ হন" (ঐ, পৃঃ ২১৩)। তাঁর নিজের রচনাশৈলী সম্বন্ধে আধুনিক সাহিত্য-সমালোচকদের রায় শুনলে সংস্কৃতাভি-

মানী মৃত্যুঞ্জয় খুব খুশি হতেন কি না সন্দেহ। 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র দ্বিতীয় 'স্তবক', প্রথম 'কুসুমে' (ঐ, পৃঃ ২৪৩-২৪৬) মৃত্যুঞ্জয় বাংলা বাক্য রচনার নানা রীতি ও তাদের দোষগুণ নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন, কিন্তু কোথাও চলিত বা মৌখিক ভাষায় বাক্য রচনার রীতি শিক্ষা দেন নি। তার কারণ, তাঁর যুগে সেটা সত্যই অভাবনীয় ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন যে, "কোকিলকুল-কলালাপবাচাল যে মলয়াচলানিল সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃকণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে", এই বাক্যটি মৃত্যুঞ্জয় "মধ্যমপ্রাণাক্ষরবহুলা বাণী"র, উদাহরণ স্বরূপই ব্যবহার করেছেন; কিন্তু আমাদের এ কথাও মনে রাখতে হবে যে মৃত্যুঞ্জয় নিজে এই ধরনের বাক্য রচনার নিন্দা করেন নি, বরং তিনি বলেছেন, "এতদ্রূপ বৈষম্য দোষরহিত যে বাক্য সে সাম্য-গুণবৎ বাক্য হয়" (ঐ, পৃঃ ২৪৪)। ব্রজেন্দ্রনাথ মৃত্যুঞ্জয়ের এই মন্তব্যটুকু আর উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করেন নি (ঐ, ভূমিকা পৃঃ ১/০)।

'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র কোনো কোনো অংশে অবশ্যই মৃত্যুঞ্জয় মৌখিক বা চলিত ভাষার প্রয়োগ করেছেন, কিন্তু তার কারণ অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' রচনার উদ্দেশ্য জানতে হয়। বইটির মুখবন্ধে মৃত্যুঞ্জয় নিজেই জানিয়েছেন যে "সকল লৌকিক ভাষার মধ্যে উত্তম গৌড়ীয় ভাষাতে অভিনব যুবক সাহেবজাতের শিক্ষার্থে কোন পণ্ডিত 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' নামে গ্রন্থ রচিতেছেন" (ঐ, পৃঃ ২২৩)। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক হিসাবেই বইটি লেখা হয়েছিল, যদিও দুঃখের বিষয় মৃত্যুঞ্জয় তাঁর জীবদ্দশায় এটি প্রকাশ করে যেতে পারেন নি। উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশক পর্যন্ত 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' পাঠ্যপুস্তক হিসাবে বাংলা দেশে বহুল প্রচারিত ছিল, এমন কি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও সে যুগে বইটির বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ করে বাংলা গদ্যের আদি যুগের লেখককে সম্মানিত করেছিলেন (ব্রজেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার', পৃঃ ৭)। এই ছাত্রপাঠ্য বইটি লেখার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল লিখিত ও কথ্য বাংলার বিভিন্ন রূপের

সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের নবাগত বিদেশী ছাত্রদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। মার্শম্যান সাহেব বইটির ভূমিকায় লিখেছেন:
"The writer anxious to exhibit a variety of style, has in some cases indulged in the use of language current only among the lower orders ; the vulgarity of which, however, he has abundantly redeemed by his vein of original humour." ('মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী', পৃঃ ২১৭)। ভাষাশিল্পী মৃত্যুঞ্জয় নিজেই বাংলা গদ্যের বিভিন্ন রীতি নিয়ে পরীক্ষা করতে বসেছিলেন এ কথা মার্শম্যান বলেন নি। লক্ষণীয় বিষয় এই যে 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'য় চলিত ভাষার ব্যবহার করা হয়েছে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে,—স্ত্রীলোক, নিম্ন শ্রেণীর লোক ও মনুষ্যেতর প্রাণীর কথোপকথনে,—এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ ভাষা গ্রাম্যতা অথবা অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট ('মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী', পৃঃ ২৫৯-৬৩, ২৮৯-৯০ ইত্যাদি)। অন্যত্র মৃত্যুঞ্জয় শুধু সংস্কৃতানুগ সাধুভাষারই প্রয়োগ করেছেন, যদিও সে ভাষা 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র ভাষার মতো দুর্বোধ্য নয়।

উইলিয়ম কেরীর 'কথোপকথন'-ও (১৮০১) ঠিক ঐ আদর্শে লেখা হয়েছিল। মৃত্যুঞ্জয়কে বাংলা সাহিত্যের "প্রথম কন্‌শাস আর্টিস্ট" বললে কেরীকে ঐ সম্মান তাঁর আগেই দিতে হয়। অবশ্য 'কথোপ-কথনে'র তুলনায় 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র ভাষা অপেক্ষাকৃত বেশি জড়তা-মুক্ত। আসলে কেরী এবং মৃত্যুঞ্জয় উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষার বিভিন্ন রূপের সঙ্গে তাঁদের পাঠকবর্গের (মুখ্যতঃ, বিদেশী ছাত্রদের) পরিচয় করিয়ে দেওয়া, তাঁরা নিজেরা ঐ সব বিভিন্ন ভাষারীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন এ কথা মনে করা কষ্টকল্পনা মাত্র।

মৃত্যুঞ্জয় যদি সত্যই সচেতনভাবে বাংলা গদ্যের বিভিন্ন রীতি নিয়ে পরীক্ষা করতে আগ্রহী হতেন তাহলে তাঁর লেখনী থেকে আদ্যোপান্ত মৌখিক ভাষায় লেখা অন্তত একটি পুস্তিকাও আমরা পেতাম। তার পরিবর্তে আমরা পেয়েছি একই বই-এর, এবং কোথাও কোথাও একই অনুচ্ছেদের, ভিতর সাধু ও চলিত ভাষার এক বিচিত্র বিসদৃশ সংমিশ্রণ,

যাকে মৃত্যুঞ্জয়ের শিল্পী প্রতিভার পরিচয় বলে মনে করা সত্যই কঠিন। মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা সর্বত্রই দুর্বোধ্য বা অপাঠ্য এ অভিযোগ নিশ্চয়ই ভিত্তিহীন। 'বত্রিশ সিংহাসন', 'হিতোপদেশ' ও 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র কোনো কোনো অংশে সাহিত্যের আস্বাদও পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি সচেতনভাবে বাংলা গদ্যের বিভিন্ন রীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন, অথবা মৌখিক ভাষার প্রতিই তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি ছিল, এ কথা ব্রজেন্দ্রনাথ-সজনীকান্তের রায় সত্ত্বেও গ্রহণযোগ্য নয়। মৃত্যুঞ্জয়ের যুগেও সাধারণ লোকের চিঠিপত্রাদি অবশ্যই মৌখিক বা চলিত ভাষায় লেখা হত কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের মতো শাস্ত্রজ্ঞ, সংস্কৃতাভিমানী পণ্ডিত সেই ভাষাকে বিশেষ সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখবেন, এটা অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়।

আরো একটি কথা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন। নিছক সন-তারিখের বিচারে মৃত্যুঞ্জয় অবশ্যই রামমোহনের পূর্বসূরী, কিন্তু রামমোহনের রচনায় প্রকাশভঙ্গীর যে-দৃঢ়তা ও স্পষ্টতা আমরা লক্ষ্য করি, মৃত্যুঞ্জয়ের রচনায় কোথাও তা পাওয়া যায় না। তা ছাড়া রামমোহনের সাহিত্যকীর্তি মৃত্যুঞ্জয়ের তুলনায় অনেক বিরাট ও অনেক গভীর মননশীলতার পরিচায়ক। "বাংলা গদ্যের প্রথম স্বাধীন ও শক্তিশালী লেখক" যে রামমোহন রায় (সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', পৃঃ ৯৯৭) সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ খুবই কম, যদিও আধুনিক বাংলা গদ্য থেকে রামমোহনের গদ্যের ব্যবধান দুস্তর।

গ্রন্থপঞ্জী

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) 'মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী' (১৩৪৬)

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার' (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—প্রথম খণ্ড) । (১৩৫২ সন)

J.C. Marshman, *The Life And Times Of Carey, Marshman And Ward,* **Vol. I. (1859)**

রামগতি ন্যায়রত্ন, 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৮৭)

S. K. De, *History of Bengali Literature In The Nineteenth Century (1800-1825)* **(1919)**

সজনীকান্ত দাস, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (১৩৫৩ সন)

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য' (১৯৫৭)

সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'—দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৫০)

'সবুজ পত্র', ফাল্গুন, ১৩২১ বঙ্গাব্দ ।

বাল গঙ্গাধর টিলক ও উনিশ শতকের রাজনীতিতে সন্ত্রাসবাদের সূচনা

(ভারতের জাতীয় আন্দোলন সুরু হয়েছিল কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে। কংগ্রেসের প্রথম যুগের নেতারা এসেছিলেন শিক্ষিত উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। খুবই স্বাভাবিক যে, সমসাময়িক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁরা মোটামুটি সন্তুষ্টই ছিলেন। তাঁদের কাম্য ছিল প্রধানতঃ, প্রতিনিধিত্ব-মূলক সরকার। কিন্তু কংগ্রেসের দাবীর প্রতি সরকারের বিমাতৃ-সুলভ মনোভাব ঐ প্রতিষ্ঠানকে ক্রমশই সরকার-বিরোধিতায় সক্রিয় করে তুলল। বক্তারা হলেন অগ্নিবর্ষী। সমালোচনার পরিধি বাড়ল, সমালোচনা হল গভীরতর। প্রথমদিকে ইংরেজ শাসনের সুফল সম্বন্ধে যে সরব সচেতনতা দেখা যেত, তাও হল বন্ধ। বরঞ্চ একটা অশ্রদ্ধার ভাবই ক্রমশঃ প্রকাশ পেল। একথা মানতেই হবে যে, শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতার ভিত্তিতে একটা রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত করা, কোন দূরদর্শীরই কাম্য নয়। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ দশকে এবং বিশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যেই—জাতীয় সংগ্রামে সন্ত্রাসবাদের সূচনা দেখা দিল। কংগ্রেসের প্রথম যুগের নেতাদের চেয়ে এই সন্ত্রাস-বাদীদের বক্তব্য ছিল আরও সুস্পষ্ট এবং তাঁদের মনোভাবে ছিল ব্রিটিশ সরকারের প্রতি এক প্রকার মৌল বিদ্বেষ। এই সন্ত্রাসবাদী দলের উদ্যোক্তা ছিলেন মারাঠী নেতা বাল গঙ্গাধর টিলক।)

এই সন্ত্রাসবাদের বিকাশের কারণ বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব, প্রথমতঃ, শহরে পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর, অর্থাৎ দরিদ্র ছাত্র, অর্ধভুক্ত বুদ্ধিজীবি আর ক্রমবর্ধমান বেকারদের, ধূমায়িত অসন্তোষ। এঁদের সামনে অগ্রগতির কোন পথই প্রশস্ত ছিল না। এঁদের জীবনযাত্রা হয়ে উঠেছিল ক্রমশই দুর্বিবহ। স্বভাবতই উচ্চ-মধ্যবিত্তশ্রেণীর নেতাদের ধীর-স্থির-প্রগতি তত্ত্বে আস্থা রাখা এঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দাবীর প্রতি সরকারী মনোভাব ক্রমশই বিরূপ হয়ে

ওঠার ফলে, কংগ্রেসের মিতাচারী নায়কদের (যাঁরা 'মডারেট' বলে পরিচিত ছিলেন) মধ্যেও সরকার-বিরোধী মনোভাব দানা বেঁধে ওঠে। তাছাড়া, তাঁরা যখন বুঝলেন যে, ভবিষ্যৎ ক্ষমতা-অর্পণের আয়োজন অযথাই বিলম্বিত হচ্ছে, তখন, আর সেই কৃতজ্ঞতা-বোধ আশ্রিত, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিন্দুমাত্র বিশ্বাসও রইল না। তৃতীয়তঃ, সত্যকারের কার্যকরী কিছু করার প্রয়োজনীয়তা সকলেই উপলব্ধি করছিলেন। জাতীয় নেতারা বেশ বুঝতে পারছিলেন যে, শুধুমাত্র মৌখিক বুলির সাহায্যে অভীষ্ট সংস্কার-সাধন সম্ভব নয়। চতুর্থতঃ, নেতাদের আপোষ-মীমাংসার নীতির প্রতি সাধারণের অসহিষ্ণুতা দিনে দিনে বেড়েই চলেছিল। আর সেই কারণেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে আপোষহীন ও চূড়ান্ত সংগ্রামের ব্যাকুলতা দেখা দিল। তাছাড়া, পশ্চিমী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে ভারতীয় সমাজের তথাকথিত 'বিজাতীয়করণের' ফলে, বিক্ষুব্ধ রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের ব্রিটিশ-বিরোধিতা প্রকট হয়ে উঠেছিল।

পরিশেষে, যেখানে সন্ত্রাসবাদের সূচনা হল, সেই মহারাষ্ট্রে, ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অসহিষ্ণু বিদ্বেষ ছিল বহুদিনের ঐতিহ্যগত। আসলে মারাঠীরাই শেষ ভারতীয় শক্তি, যারা এদেশে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ সংগ্রাম চালিয়েছিল। এমন কি ১৮৬২ সালে এবং ১৮৭৯ সালে পর্যন্ত, মহারাষ্ট্রে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে বাধ্য হলেও এই সব বিদ্রোহের স্মৃতি মারাঠীদের এক বিরাট অংশকে সকল সময়েই প্রভাবিত করেছে। মহারাষ্ট্রের চিতপাবন ব্রাহ্মণ শ্রেণী, যাঁদের মধ্য থেকে এই সন্ত্রাসবাদের নায়ক টিলক এসেছিলেন, পেশোয়াদের আমল থেকেই তাঁরা দেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে চলেছিলেন। মারাঠীদের দেশে এঁরাই রাজনীতিতে ও মননশীলতায় ছিলেন অভিজাত—আইন, শিক্ষা এবং সরকারী কাজের পুরোধা। এঁদেরই মধ্যে কেউ কেউ পেশোয়াদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখতেন।

জাতীয় আন্দোলনে চরমপন্থীদের ভূমিকা যাঁরা নিয়েছিলেন, প্রকৃত-

পক্ষে ভারতে তাঁরা এক নতুন রাজনৈতিক ভাবধারার প্রতিনিধিত্ব করেছেন যা মূলতঃ নিশ্চিত এবং চূড়ান্তরূপে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে চেয়েছিল। রাজনৈতিক দিক থেকে এটা ছিল প্রগতিধর্মী। এঁদের নীতি ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ-হীন সংগ্রাম এবং তার জন্য এঁরা সারা দেশ জুড়ে আন্দোলনের ব্যবস্থাও করেছিলেন। কংগ্রেসী আন্দোলনের মধ্যে এঁদের ছিল বিরোধীপক্ষের ভূমিকা। কিন্তু এই আন্দোলন গণ-আন্দোলনের রূপ নিতে পারে নি। কিছু সীমিতসংখ্যক লোকের ব্যক্তিগত এষণাই ছিল এর মূল অনুপ্রেরণা। প্রকৃতপক্ষে এটা নিহিত ছিল স্বল্পসংখ্যক বিক্ষুব্ধ নিম্ন-মধ্যবিত্ত-শ্রেণীতে, জনগণের সাথে যার সংযোগ ছিল না। সেই কারণেই এঁদের অভীষ্টসিদ্ধি ছিল অসম্ভবপ্রায়। এর ফলে, এই আন্দোলন ব্যক্তিগত কয়েকজনের অরাজক কার্যধারায় পর্যবসিত হল। এই চরমপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনে আমরা কিছুটা অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের অস্তিত্বও অনুধাবন করতে পারি। রাজনৈতিক দিক থেকে যথেষ্ট উন্নত হয়েও এই আন্দোলন, সামাজিক ও ধর্মীয় রক্ষণশীলতার দ্বারস্থ হয়েছিল, এবং সেই প্রাচীন রক্ষণশীল হিন্দু সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থাকেই জাতীয় আন্দোলনের মূল উপজীব্য করতে চাইল। এরই ফলে, এই আন্দোলনের রূপ বেশ কিছুটা সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠল। আধুনিক কালের একজন চিন্তাবিদের মতে, আন্দোলনটির এই বিশেষ রূপ-পরিগ্রহণের যথার্থ কারণ এই যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে যে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রবর্তন ঘটতে থাকে, সেকালের শিক্ষিত মধ্যবিত্তসমাজ, তার কোন বিকল্প খাড়া করতে পারেন নি। চরমপন্থীরা আসলে পাশ্চাত্য-সভ্যতা বিরোধী ততটা ছিলেন না, যতটা ছিলেন ব্রিটিশ শাসনের আনুষঙ্গিকের বিরোধী। এঁরা ভুল করলেন সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের দোষগুলোকেই পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিশাপ ভেবে। উনিশ শতকের অধিকাংশ সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলনই, অংশতঃ বা সামগ্রিকভাবে নিহিত ছিল—পুরাতন প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও ধর্মব্যবস্থার মোহাচ্ছন্নতায়। এমন কি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের

সিপাহী বিদ্রোহও ছিল কিছুটা, নতুন নীতির বিরুদ্ধে প্রাচীনের জেহাদ। অবশ্য উপরোক্ত দু'প্রকার ব্যাখ্যাই আপাতঃ অর্থে সত্য; আমাদের বর্তমান জ্ঞানের পরিধিতে কোন নির্দিষ্ট ও চূড়ান্ত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়।

(জাতীয় আন্দোলনের চরমপন্থীরা সাধারণতঃ বাল গঙ্গাধরের ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করেই সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন চিৎপাবন ব্রাহ্মণ। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হলেও, তাঁর ওপর পশ্চিমী শিক্ষার প্রভাব ছিল সামান্যই। তাছাড়া তিনি ছিলেন একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং অচিরেই প্রখ্যাত হলেন শিক্ষাব্রতী ও সাংবাদিক হিসেবে। টিলকের দৃঢ়সংকল্প চরিত্র, মনীষা ও পাণ্ডিত্য, ইংরেজী ও মারাঠী ভাষায় অসীম দখল এবং বাগ্মিতার জন্য, মহারাষ্ট্রে তাঁর গুণমুগ্ধ অনুগামীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে লাগল।

পশ্চিমী সভ্যতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েও টিলক কিন্তু অভীষ্ট সাধনের জন্য পশ্চিমী বিপ্লবপন্থাকেই বেছে নিলেন। তাঁর প্রথম কাজ ছিল দুটি সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা—"কেশরী" ও "মারাঠা"। দু'টিরই বৈশিষ্ট ছিল উগ্র ব্রিটিশ বিরোধিতা, আর তাদের ভাষা ছিল আপোষহীনতার চরমে। অচিরেই, রাণাডের নেতৃত্বাধীন বোম্বাই সমাজের প্রগতিশীল অংশের সাথে বিরোধ দেখা দিল। টিলক চাইলেন এঁদের থেকে 'পুণ্য সার্বজনিক সভা' এবং 'দাক্ষিণাত্য শিক্ষা সমিতি' নামের সংস্থা দু'টিকে ছিনিয়ে নিতে। এ ব্যাপারে তিনি শুধু যে ব্যর্থ হলেন তাই নয়, দু'টি প্রতিষ্ঠান থেকেই তাঁকে বিতাড়িত করা হল।

(ইতিমধ্যে, ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে 'সহবাস সম্মতি আইনে'র বিলটি (Age of Consent Bill) পাশ হওয়ায়, টিলকের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পেল। 'কেশরী'তে প্রকাশিত কতকগুলো প্রবন্ধে তিনি সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদগার করলেন। তাঁর বক্তব্য হল, সরকার হিন্দুদের প্রাচীন ধর্মীয় রীতিতে হস্তক্ষেপ করেছেন, এবং হিন্দুরা প্রাণের বিনিময়েও তাদের ধর্মীয় স্বার্থ রক্ষা করবে। যে সমস্ত হিন্দুরা এই বিলটির স্বপক্ষে ছিল তাদেরও তিনি দেশদ্রোহী ও স্বধর্মত্যাগী আখ্যা দিলেন। ফলে টিলকের

সঙ্গে বোম্বাইয়ের প্রগতিপন্থী নেতাদের, যেমন ভাণ্ডারকার, চন্দ্রাভরকর ও গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রভৃতির, বিবাদ দেখা দিল। এ সত্ত্বেও টিলক, নাটু ভাইদের সহযোগিতায় এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে স্কুল-কলেজে জোর প্রচারকার্য চালাতে সমর্থ হলেন এবং ইংরেজ শক্তিকে রুখবার জন্য বলপ্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিলেন। মহারাষ্ট্রে বিভিন্ন ব্যায়ামচর্চার আখড়া গড়ে উঠল এবং এগুলোই পরে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবের কেন্দ্র হয়ে উঠল। ১৮৯৩ সালেই বোম্বাইতে একটা অবাঞ্ছিত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা দেখা দিল।

অতঃপর টিলক 'গো-রক্ষা সমিতি' নামে একটি প্রতিক্রিয়াশীল সমিতি গঠন করলেন—যার মূল উদ্দেশ্য ছিল, মুসলমানদের বিরুদ্ধাচরণ করা। এই সমিতি থেকে প্রকাশিত পুস্তকাদিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তীব্র উস্কানি দেওয়া হত। টিলক বোম্বাইতে 'গণপতি উৎসবের'ও প্রবর্তন করেন। প্রত্যেক বছর দশদিন ধরে এই উৎসব পালন করা হত। উৎসবের সময় শোভাযাত্রা বের করা হত এবং নানাবিধ আমোদ প্রমোদের আয়োজন থাকত, যেগুলি স্বভাবতঃই মুসলমানদের পক্ষে আপত্তিকর। মুসলমানরা এই জাতীয় আমোদ-প্রমোদের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতেন এবং রাউলাট কমিটির রিপোর্টে এই উৎসব পরিচালকদের বিরুদ্ধে নানারকম অভিযোগ আনা হয়েছিল। "ম্লেচ্ছ"দের বিরুদ্ধে ঘৃণার মনোভাব জাগিয়ে তোলার জন্য ধর্মীয় সঙ্গীতানুষ্ঠান এবং ধর্মীয় শ্লোক আবৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। ভারতে বিদেশী শাসনের প্রতি নিন্দার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের আচার ব্যবহারের নিন্দা করা হত। সুতরাং 'গণপতি উৎসব' ছিল অংশতঃ সাম্প্রদায়িক এবং অংশতঃ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী। এমনকি 'পুণা সার্বজনিক সভার' মত মিতাচারী সংস্থাও এই উৎসবের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে উদ্যত হয়েছিল।

শিবাজীই প্রথম মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে মারাঠাদের একত্র করেছিলেন; টিলক তাই শিবাজীর স্মৃতি-স্তম্ভ সংস্কার সম্পর্কীয় একটা আন্দোলন গড়ে তোলার মুখ্য ভূমিকা নিলেন এবং শিবাজীর স্মৃতির উদ্দেশে এক উৎসবের প্রবর্তন করলেন। এই 'শিবাজী উৎসবে'র

মাধ্যমে টিলক একটা বলিষ্ঠ জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করতে চাইলেন এবং দেশবাসীকে শিবাজীর আদর্শ অনুসরণের জন্য আবেদন জানালেন। ১৮৯৫ সালের প্রথম উৎসবের সময়ে একটি সংস্কৃত শ্লোকের সাহায্যে হিংসাত্মক কার্যকলাপের প্রতি খোলাখুলি আস্থা ঘোষণা করা হল) এবং এক ব্রাহ্মণ শিবাজীর আফজল-হত্যার বিশ্বাসঘাতকতাকে এই বলে সমর্থন করলেন যে, মহৎ লোকেরা নৈতিকতার সাধারণ আদর্শের উর্ধে। এ কথাও বলা হয়েছিল যে নিঃস্বার্থ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপরাধও সমর্থনীয়। টিলক দেশবাসীকে পেনাল কোডের বাধ্যবাধকতার বাইরে এসে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উচ্চমার্গে প্রবেশ করার উপদেশ দিলেন)

(এরপরে টিলক তদানীন্তন বোম্বাইয়ের বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হলেন। সংসদের মধ্যেও তাঁর বক্তৃতার ভাষা, তাঁর গণভাষণ ও সম্পাদকীয়ের ভাষার মতই উগ্র ছিল। পরিষদে চরমপন্থীদের মনোভাব ও অনুভূতি তাঁর মধ্য দিয়ে বাণীরূপ পেল। দাক্ষিণাত্যে ১৮৯৬ সালে মর্মান্তিক দুর্ভিক্ষের সময় টিলক খাজনা-বন্ধ আন্দোলন সংগঠন করেন) তিনি দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলগুলির রায়তদের কাছে নিজস্ব প্রতিনিধি পাঠিয়ে এই মর্মে মিথ্যা ঘোষণা করতে বললেন যে, সরকার ঐ বৎসরের জন্য রাজস্ব-সংগ্রাহকদের কর আদায় করতে নিষেধ করেছেন। তাঁর কৌশল ভালোভাবেই কাজ করল। (এরপরে বোম্বাইতে চাপেকার ভাইদের একজন, রাণী ভিক্টোরিয়ার মূর্তিটির ক্ষতি সাধন করলেন। এই ধরনের বৃটিশ-বিরোধী মনোভাবের প্রকাশ ছাড়াও এই আন্দোলন শীঘ্রই একটা কদর্য রূপ নিল—যেমন, ভারতীয় মডারেট-দের রাস্তায় নিগ্রহের চেষ্টা এবং গুণ্ডামী ইত্যাদির দ্বারা অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করা। চাপেকার ভাইয়েরা 'হিন্দুধর্মের প্রতিবন্ধক দূরী-করণ সমিতি' নামে (যদিও নামটা কিছুটা প্রতিক্রিয়াশীল) একটা বিদ্রোহী সংস্থা গঠন করলেন)

বোম্বাইতে প্লেগ রোগ দেখা দিলে সরকার প্রতিবিধানের সুব্যবস্থার জন্যে W.C. Rand-এর হাতে ক্ষমতা দিলেন। র‍্যাণ্ডের ব্যবস্থা সমাজের গোঁড়া লোকেদের মনঃপূত হ'ল না। উদাহরণ স্বরূপ, র‍্যাণ্ড বৃটিশ সৈন্যদের

দ্বারা ভারতীয় গৃহের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা পরিদর্শনের জন্যে গৃহতল্লাসীর ব্যবস্থা করলেন। সত্য-মিথ্যা যেভাবেই হোক, এই সৈন্যদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আতিশয্যের অভিযোগ আনা হল,—ফলে সরকার উগ্র সমালোচনার সম্মুখীন হলেন। ১৮৯৭ সালে র‍্যাণ্ডের ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করে 'কেশরীতে' পর পর কতকগুলো প্রবন্ধ ছাপা হ'ল এবং ঐবছরেই ২২শে জুন, চাপেকার ভাইদের হাতে র‍্যাণ্ড এবং আয়ার্স্টের মৃত্যু হ'ল। আধুনিক ভারতের ইতিহাসে এটাই প্রথম রাজনৈতিক হত্যা এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায় যে, এর প্রেরণা হিসেবে কার্যকরী ছিল টিলকের চিন্তা ও প্রচার। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেন এবং বিচারে টিলকেরও ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হল। বিচারকদের মতে, 'কেশরীতে' প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি ছিল প্ররোচনা ও রাজদ্রোহমূলক। এক বছর পরে টিলক মুক্তি পেলেন। কিন্তু ১৮৯৯ সালে আরো দুটো রাজনৈতিক হত্যার (সরকারী গুপ্তচর হত্যা) পরিকল্পনা ও রূপায়ণ হল। এর মূলে ছিলেন চাপেকার ভাইদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সমিতির কয়েকজন সভ্য। (টিলকের কারাদণ্ড অথবা সরকারের দমননীতি মহারাষ্ট্রে টিলকের প্রভাব বিন্দুমাত্র কমাতে পারল না। 'কেশরী' আরো উগ্র ভাষায় প্রকাশিত হতে থাকল এবং টিলক যথার্থই জাতীয় নেতা হয়ে উঠলেন। ১৮৯৭ সালের কংগ্রেসে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় টিলকের প্রতি তাঁর সর্বান্তঃকরণ সমর্থন জানালেন এবং বললেন, টিলকের বন্দী অবস্থা সমগ্র দেশকে শোকাচ্ছন্ন করেছে। বাংলাদেশেও বঙ্গভাষী পত্রিকাগুলিতে 'কেশরী'র অনুকরণে খোলাখুলি বিপ্লবাত্মক ভাবনা ও প্রেরণা প্রকাশিত হতে লাগল)

(টিলকের এই চরমপন্থা বিপ্লবী রাজনীতির উদ্ভবে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করল এবং ভারতের অন্যান্য অংশের কাছে আদর্শ হয়ে রইল। ভারতবর্ষে পরবর্তীযুগের বিপ্লবী আন্দোলন টিলকের ধারণা এবং সংগঠন প্রণালীকে, প্রায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করেছিল) টিলক-পরিচালিত আন্দোলনে রাজনৈতিক উগ্রতা ও সামাজিক প্রতিক্রিয়ার এক বিপত্তিকর সম্মিলন হয়েছিল। এই অদ্ভুত সংমিশ্রণের

প্রভাব মারাঠী জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসেই ছড়িয়ে রয়েছে। এর ফলে, রাজনৈতিক সচেতনতার প্রসার বিলম্বিত হল আর ভারতীয় শিক্ষিত সমাজে উদারনৈতিক রাজনীতির বিস্তার বিনষ্ট হল। আরও দুর্ভাগ্য-জনক এই যে, এদেশে প্রগতিশীল শক্তিগুলির মধ্যেও নীতিগত বিরোধ দেখা দিল। রাজনীতিতে মিতাচারী যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে চরমপন্থীদের চেয়ে উন্নত ছিলেন। আবার জওহরলালের পিতা পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু রাজনীতিতে এই মডারেটদের শ্রেণীভুক্ত না হলেও টিলকের প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রতি তাঁর কোন সহানুভূতি ছিল না—সুতরাং তিনি টিলকের সাথে হাত মেলান নি। তাছাড়া এই আন্দোলন কিছুটা সাম্প্রদায়িক রূপ নেওয়ার ফলে মুসলমানদের বাদ দিতে বাধ্য হয়েছিল। এই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফলসমূহ ছিল দুর্বল এবং কতকগুলি ব্যক্তিগত পর্যায়ের সন্ত্রাস-বাদী কর্মধারায় সীমাবদ্ধ। (কিন্তু এই ব্যক্তিগত পর্যায়ের সন্ত্রাসবাদ ভারতে ও অন্যান্য দেশে ব্রিটিশ রাজের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে-ছিল। ভারতের জরুরী অবস্থা সম্পর্কে তারা যথেষ্ট সচেতন হয়েছিল।)

গ্রন্থপঞ্জী

Bal Gangadhar Tilak : *His Writings And Speeches (1919)*

Valentine Chirol, ***Indian Unrest*** **(1910)**

Verney Lovett, ***A History Of The Indian Nationalist Movement*** **(1921)**

The Sedition Committee Report, 1918.

The Tilak Trial **(1897)**

উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের প্রকৃত সীমারেখা

উনিশ শতকের বাংলায় যে নতুন জীবনের স্পন্দন দেখা দিয়েছিল বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিচিত্র ভাবে তা আত্মপ্রকাশ করে, এ কথা বলাই বাহুল্য। 'নবজাগরণ' বলতে যদি পুনর্জন্ম, নতুন মূল্যবোধের উদ্ভব ও সৃজনীশক্তির নব নব প্রকাশকে বোঝায়, তবে নিঃসংশয়ে উনিশ শতকে বাংলার পুনরুত্থানকে নবজাগরণের আখ্যা দেওয়া চলে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তনের ফলে যে জিজ্ঞাসা ও সমালোচনার, বিচার ও বিতর্কের মনোভাব আমাদের সমাজে জাগ্রত হয় তা কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যবস্থাকেই অন্ধভাবে গ্রহণ করে নি, বরং বিগত কয়েক শতাব্দীর গতিহীন জীবন ও উৎকট রক্ষণশীলতাকে বর্জন করে বাঙালী প্রতিভার উন্মেষের এমন এক সুচারু পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল যার তুলনা এর আগে মাত্র দুবার বাংলার ইতিহাসে পাওয়া যায়। এমন এক সৃজনী-সম্ভাবনায় দৃপ্ত অধ্যায় ছিল পাল রাজাদের শাসনকাল, আর একটি ছিল হোসেন শাহ এবং বাংলার স্বাধীন সুলতানদের আমল। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য এই দুটি যুগের আলোড়নের তুলনায় উনিশ শতকের নবজাগরণ ব্যাপকতা এবং সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে ছিল আরো সুদূরপ্রসারী।

উনিশ শতকের নবজাগরণের বিষয় বলতে গিয়ে আচার্য যদুনাথ মন্তব্য করেছেন,—"এটি ছিল প্রকৃতই এক নবজাগরণ, যা ব্যাপকতায়, গভীরতায় এবং বৈপ্লবিকতায় কন্স্টানটিনোপ্‌লের পতনের পরবর্তী ইউরোপীয় নবজাগরণকেও অতিক্রম করেছে। বৈদিক যুগে পাখীর দেশ আখ্যা দিয়ে, মহাকাব্যের যুগে পাণ্ডব-বর্জিত স্থান বলে বর্ণনা করে এবং মুঘল আমলে 'রুটি-পূর্ণ নরক' বলে অভিহিত করে বাংলাকে অবজ্ঞার সঙ্গে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে সেই বাংলা এখন ভারতের অন্যান্য অংশের কাছে পথ-প্রদর্শক

ও আলোক-দাতার ভূমিকা গ্রহণ করল'। যদি পেরিক্লিসের এথেন্সকে হেলেনীয় জাতির শিক্ষায়তন, 'গ্রীসের নয়ন এবং শিল্প ও বাগ্মিতার জননী' বলে মনে করা চলে, তাহলে বিদেশ হতে আহৃত নতুন জ্ঞানালোককে অতুলনীয় কৃতিত্বে স্বাঙ্গীকরণের দ্বারা বাংলা দেশও বৃটিশ শাসনাধীন ভারতের অবশিষ্ট অংশের কাছে সেই একই রূপে আবির্ভূত হয়েছিল। এই নতুন বাংলায় উদ্ভূত আধুনিক কালের প্রতিটি শুভ ও মহৎ প্রচেষ্টা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ধীরে ধীরে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। বাংলা দেশ থেকে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষক এবং ইউরোপ-অনুপ্রাণিত ভাবধারা সর্বত্র প্রসারিত হয়ে বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর ভারত এবং দাক্ষিণাত্যের আধুনিকীকরণের পথ প্রশস্ত করেছিল। নতুন সাহিত্য রচনা, ভাষার সংস্কার, সমাজের পুনর্গঠন, রাজনৈতিক আন্দোলন, ধর্মসংস্কার, এমন কি জীবনযাত্রা ও আচার-ব্যবহারের পরিবর্তন বাংলার প্রাদেশিক গণ্ডী পেরিয়ে ঘূর্ণি হতে বার হয়ে আসা ছোট ঢেউ-এর মত ভারতের সুদূরতম প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।" (History of Bengal, Vol, II, Dacca University, 1948, p. 498)

আচার্য যদুনাথের এই মন্তব্যের মধ্যে অবশ্যই কিছু সত্য নিহিত আছে। সন্দেহাতীত ভাবে এ কথা বলা যায় যে উনিশ শতকে এবং বিশ শতকের প্রথম কয়েকটি দশকে বাংলা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের কাছে আলোকবর্তিকাবাহীর ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু ইউরোপের নবজাগরণের তুলনায় বাংলার এই নবজাগরণ আরো ব্যাপক, গভীর এবং বৈপ্লবিক ছিল কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। বাংলার নবজাগরণের এই সীমিত রূপ সহজেই চোখে পড়ে যদিও কোনো কোনো আধুনিক ঐতিহাসিকের অনুসরণে একে নবজাগরণ বলে একেবারে স্বীকার না করা বর্তমান লেখকের মতে অতিরঞ্জনের দোষে দুষ্ট হবে। এই জাগরণের প্রকৃত স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে হলে তাই আমাদের যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

উনিশ শতকের বাংলায় ক্রমশঃ গড়ে ওঠা পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা এই নবজাগরণ আন্দোলনের প্রাণশক্তি যুগিয়েছিল। এই শিক্ষার প্রসারের

ফলেই চিরাচরিত সমাজ ব্যবস্থা এবং সনাতন ঐতিহ্য সম্বন্ধে বাঙালীর মনে সংশয় ও জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হয় এবং নতুন মূল্যবোধ জেগে ওঠে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শুধু হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যা এযুগে একটি বিশিষ্ট শ্রেণীচরিত্র নিয়ে গড়ে উঠছিল তার মধ্যেই এই পাশ্চাত্যশিক্ষার সুফল প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ থাকে। মুসলমান সম্প্রদায়ের বৃহৎ অংশ এই নতুন শিক্ষাব্যবস্থা থেকে দূরে সরে থাকে এবং মেকলের অনুপ্রবেশ তত্ত্বের (Filtration Theory) ব্যর্থতা এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপারে সরকারের অনিচ্ছার ফলে দেশের বৃহত্তর জনসমাজ অজ্ঞতার তিমিরেই থেকে যায়। শুধু তাই নয়, এর ফলে জনসাধারণ এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি নতুন ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছিল যার জন্য জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মনে বিশেষ সহানুভূতির উদ্রেক করতে পারে নি।

দ্বিতীয়তঃ, উনিশ শতকের ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনগুলির গণ্ডীও ছিল অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, কারণ তাদের আবেদন দেশের মানুষের হৃদয়ের চেয়ে বুদ্ধির কাছেই ছিল বেশি প্রবল। ব্রাহ্ম আন্দোলন তার নিজস্ব প্রকৃতির জন্যই জনমানসে অতি সামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিল। একটি মৌলিক বিভ্রান্তি নিয়ে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। হিন্দুধর্ম আসলে কোনো সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মতবাদ নয়, বরং বহু সম্প্রদায়ের মতবাদ এর বৃহৎ ছত্রচ্ছায়ায় আশ্রয় পেয়েছিল। অভ্রভেদী দার্শনিকতা এবং উৎকট পৌত্তলিকতা, এই দুই সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী হিন্দুসমাজে সহাবস্থান করত। ধর্মাচরণের ব্যাপারে অধিকারভেদ বা অন্তর্নিহিত প্রবণতা ও শক্তিকে স্বীকার হিন্দুসমাজ চিরকাল করে এসেছে। আধ্যাত্মিক বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত ব্যক্তিদের জন্য বিভিন্ন সাধনমার্গকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে এ ধর্মের কোনোদিনই কুণ্ঠা ছিল না। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজ যখন সমাজের সকলের জন্য একটি বিশেষ ধর্মীয় আদর্শ ও নীরস সাধন পদ্ধতি নিয়ে উপস্থিত হ'ল তখন তার আবেদন প্রধানতঃ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ অংশের কাছেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল, এবং বৃহত্তর জনসমাজ তার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারল না। বহু

দেবদেবীর পূজার্চনা এবং মূর্তিপূজায় আস্থা দূর করার প্রাথমিক ও মৌলিক যে ব্রত নিয়ে ব্রাহ্মসমাজ অগ্রসর হয়েছিল সে ব্রত আজও উদ্‌যাপিত হয় নি,—এ সত্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। মহাত্মা গান্ধী একবার এই মর্মে একটি রূঢ় মন্তব্য করেছিলেন যে চৈতন্য বা কবীরের তুলনায় রামমোহনকে বামন (pigmy) বলা চলে। প্রথমোক্ত ধর্মগুরুগণ সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে উচ্চ-নীচ নির্বিচারে যে ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন এবং সবদিকেই এমন এক আত্মশুদ্ধির পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন যা ব্রাহ্ম নেতাদের স্বপ্নেরও অতীত ছিল। (Young India, 13 April, 1921)

ব্রাহ্মধর্মের বিরোধী নব্য হিন্দু প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও জনসংযোগের এই একই অভাব আমরা লক্ষ্য করি। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মনোজগতে হিন্দু আদর্শের পুনর্বাসনের এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ বলে গৃহীত হলেও তার বুদ্ধিদীপ্ত পরিবেশন শৈলীর জন্য তা জনসাধারণের মনে বিশেষ রেখাপাত করে নি। শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব এবং শিক্ষা সন্দেহাতীত ভাবে সাধারণ লোককে নব্য হিন্দু মতবাদের দিকে আকৃষ্ট করে, কিন্তু বিবেকানন্দের ভাবপূর্ণ পরিশীলিত বাণী অশিক্ষিত জনসাধারণের মর্ম স্পর্শ করতে পারে নি। রামকৃষ্ণ মিশনের সমাজসেবামূলক কার্যকলাপের দ্বারা সাধারণ লোক বিভিন্ন সময়ে উপকৃত হলেও মিশনের আধ্যাত্মিক প্রভাব তাদের জীবনে বিশেষ পড়েছে বলে মনে হয় না।

এ যুগের সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টাও অনেকক্ষেত্রে সাধারণ লোককে প্রভাবিত করতে পারে নি। উনিশ শতকের সব সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে একমাত্র সতীদাহ-নিরোধ আন্দোলনই সাধারণ মানুষের জীবনে হয়ত কিছুটা পরিবর্তন এনেছিল, অন্ততঃ বাংলাদেশের কোনো কোনো অংশে। বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করলেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে হিন্দুসমাজের নিম্ন বর্ণগুলির মধ্যে একটি বৃহৎ অংশে বিধবা-বিবাহ এই আন্দোলনের পূর্বেও প্রচলিত ছিল, এবং বিদ্যাসাগরের

আন্দোলনের আপাতদৃষ্ট সাফল্য সত্ত্বেও উচ্চবর্ণের মধ্যে বিধবা-বিবাহ আজও জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। কুলীনদের বহুবিবাহ-নিরোধ আন্দোলনও হিন্দুসমাজের বৃহত্তর অংশের কাছে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ছিল না, কারণ কৌলীন্যপ্রথা সমাজের উচ্চ বর্ণাশ্রয়ীদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। মানব-প্রেমিক ও খ্রীষ্টধর্মপ্রচারকদের সযত্ন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও স্ত্রী-শিক্ষা উনিশ শতকে হিন্দু সমাজের উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও বিশেষ অগ্রগতির স্বাক্ষর রাখতে পারে নি, নিম্নশ্রেণীর কথা ত ওঠেই না। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্টের সুযোগ হিন্দু সমাজের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ, ব্রাহ্ম সম্প্রদায়-ই, গ্রহণ করতে পেরেছিল। শিক্ষিত লোকেদের মধ্যে জাতি-ভেদ প্রথার জটিলতা কিছুটা শিথিল হলেও দেশের বৃহত্তর জনসমাজের মধ্যে ঐ প্রথার প্রকোপ এ যুগে যথেষ্টই দেখা যেত। মোটের উপর এ কথা বলা চলে যে উনিশ শতকের সমাজ-সংস্কার আন্দোলন শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত ছিল। বাংলার নব-জাগরণের সীমাবদ্ধতা এর মধ্যে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত।

রাজনীতির ক্ষেত্রেও উনিশ শতকের বেশির ভাগ জুড়ে বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তাদের রাজনৈতিক এবং আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শান্তিপূর্ণ এবং সাংবিধানিক উপায়ে আন্দোলন চালিয়ে-ছিলেন সত্য, কিন্তু সাঁওতাল-বিদ্রোহ এবং ওয়াহাবী আন্দোলনের মতো ইংরেজ-বিরোধী এবং প্রত্যক্ষ সহিংস আন্দোলনে তাঁদের সহানুভূতি ও সমর্থন ছিল না। বাংলার নবজাগরণের হোতাগণ (উনিশ শতকের শেষ দুই দশক বাদ দিলে) বৃটিশ শাসনকে বিধাতার এক মহৎ আশীর্বাদ বলেই মনে করতেন। কেবলমাত্র বর্তমান শতকের প্রথম দিকেই বাংলার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক আন্দোলন এবং বিক্ষোভ কিছুটা গণ-আন্দোলনের রূপ ধারণ করে।

উপসংহারে তাই এ কথা ঘোষণা করলে কোনো অপরাধ হবে না যে উনিশ শতকের বাংলা সম্পদে, প্রাচুর্যে এবং প্রাখর্যে দীপ্ত এক নবীন জীবনের সন্ধান পেলেও তার স্বাদ গ্রহণ দেশের জনসাধারণের এক অতি সীমিত অংশের পক্ষেই সম্ভবপর ছিল এবং ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালী

(মূলতঃ হিন্দু) মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রধানতঃ এই নবজাগরণের উন্মেষ ঘটেছিল। বিদেশী শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বাংলার রাজনীতি এবং বৈদেশিক আর্থিক শোষণ উনিশ শতকে বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সম্প্রসারণকে নিদারুণ ব্যাহত করেছিল এবং এই ঘটনার মধ্যেই বাংলার নবজাগৃতির সীমিত চরিত্রের মূল কারণ সুস্পষ্টভাবে নিহিত।